গিরিশচন্দ্র

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

প্র কা শ ক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট
লিমিটেড্—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৬৩ সাল
মূল্য পাঁচ টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট
লিমিটেডের মুদ্রণ-বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা
স্ট্রীট, কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ পত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সুদক্ষ ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলার

দিব্যধাম-বাসী

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

পবিত্র স্মৃতির অর্ঘ্য স্বরূপ

গভীর শ্রদ্ধায়

গিরিশচন্দ্র

উৎসর্গিত হইল

হে দেশপ্রেমিক মহাপ্রাণ

আমার "গিরিশ" বক্তৃতাবলী এবং "নাট্যসাহিত্যে গিরিশ-চন্দ্র" পাঠ করিয়া আপনি গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপনার সেই অমায়িক সৌহৃদ্যপূর্ণ ব্যবহার কখনও ভুলিব না। কথাপ্রসঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "দ্বিতীয় সংস্করণে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা আমি লিখিয়া দিব।" অকালে আপনার আকস্মিক দেহত্যাগে আমার সেই সৌভাগ্য লাভ হইল না! কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কি অন্যান্য ক্ষেত্রে, কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়, কি লোকসভায়, কি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে, কি সমগ্র জাতির সেবায় যে নিষ্কাম মহোজ্জ্বল আদর্শ আপনি রাখিয়া গিয়াছেন—দেশের ইতিহাসে তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরস্মরণীয় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। আশা করি দিব্য-লোক হইতে আপনার আনন্দোৎফুল্ল শুভ দৃষ্টিপাতে কৃতার্থ ও ধন্য হইব। ইতি—

বিনীত

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

ভূমিকা

"গিরিশচন্দ্র" প্রকাশিত হইল। গিরিশ-লেকচারার রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিক যে কয়েকটি প্রবন্ধ আমি পাঠ করিয়াছিলাম তাহাই এই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। তজ্জন্য আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে এবং গিরিশ-স্মৃতি-সমিতিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গিরিশচন্দ্র শুধু বাংলা সাহিত্যে নহে, জগতের নাট্যসাহিত্যে যে অপূর্ব রত্ন দান করিয়া গিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার বিষয়টি ছিল, গিরিশচন্দ্র ও নাট্যকলায় তাঁহার চিত্তবিকাশ (Girishchandra : His Mind and Art); নামটি অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে বলিয়া সংক্ষিপ্তভাবে শুধু "গিরিশচন্দ্র" নামেই মুদ্রিত হইল।

আমি যে সকল পুস্তক-নিবন্ধাদি পাঠ করিয়া গিরিশ অভিভাষণ দিয়াছিলাম বিস্তারিতভাবে ঐগুলির উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন; তবে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে গ্রন্থশেষে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম। গিরিশচন্দ্রকে যতটা বুঝিয়াছি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি; কতটা কৃতকার্য হইয়াছি তাহা সুধীবৃন্দের ও পাঠকগণের বিচার্য।

বহুদিন গিরিশচন্দ্রের পবিত্রসঙ্গ লাভ করিয়া কত আলাপ-আলোচনা করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছি। সেই সব আলোচনার

ভূমিকা

কিছু মর্ম ১৩৩২ সালের ও পরবর্ত্তী কালের 'বঙ্গবাণী'তে "গিরিশ-স্মৃতি" নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি রসচক্রসাহিত্যসংসদ্ দ্বারা এইগুলি "গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য" নামে মুদ্রিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেই "গিরিশ-স্মৃতিই" গিরিশ লেকচারার-নিয়োগ কমিটির নিকট আমাকে পরিচিত করিয়াছে। আমার মত নগণ্য ব্যক্তি যে এই সুযোগে গিরিশচন্দ্রের নিকট আমার অপরিশোধ্য ঋণ প্রকাশ করিতে পারিবে এই আশায়ই আমি উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম।

গিরিশচন্দ্র আমাদের বাঙ্গালী জাতির গর্ব। নাট্যসাহিত্যে তাঁহার নাম আমরা নিঃসন্দেহে নিঃসঙ্কোচে জগতের সম্মুখে উচ্চারণ করিতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন জগতের সকল জাতি তাঁহার গ্রন্থাবলী ভক্তি ও সমাদরের সহিত পাঠ করিবে।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রথম বক্তা না হইলেও আমার গিরিশ লেক্‌চারের বক্তৃতাবলীই সর্বাগ্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক—'গিরিশচন্দ্র' নামে প্রকাশিত হয়। বহুদিন পূর্বে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণের ভূমিকাও সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।

১৩৪৮ সালে "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় আশ্বিন মাসে "বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম অনেকের অনুরোধে উহা "পরিশিস্ট" রূপে দ্বিতীয় সংস্করণে সংযুক্ত করিলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা-বিভাগে সর্বপ্রথম প্রধান আসনে যিনি আসীন ছিলেন, রামতনু লাহিড়ী প্রথম অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া যিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন, প্রাচীন বাংলার গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতি ও পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথিসমূহ সংগ্রহপূর্বক বাংলার অতীত ইতিহাসে নবালোক সম্পাত করিয়া—সাহিত্যে এক নূতন পথ যিনি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচক, বৈষ্ণব সাহিত্যের নানা তথ্যপূর্ণ গবেষণায়ও সিদ্ধহস্ত, প্রাচীন বাংলা ভাষার সর্বজনমান্য ঐতিহাসিক সেই দেশবিশ্রুত স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন (ডি, লিট) স্বয়ং এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সুলেখক নাট্য সাহিত্যে প্রগাঢ়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

পণ্ডিত গিরিশচন্দ্রের পরমাত্মীয় ভ্রাতা ও বহু বর্ষের সঙ্গী ভূতপূর্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ লেকচারার স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আমার "গিরিশচন্দ্র" পাঠ করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অভিমত পাঠাইয়াছিলেন তাহা পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য মুদ্রিত হইল।

ইংরাজী সান্ধ্য দৈনিক পত্র "The Free-Lance"-এর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাশ মহাশয়ের উদ্যোগে ও অনুগ্রহে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বাস্তবিক এই বৃদ্ধ বয়সে আমার পক্ষে ইহা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ইহার জন্য তাঁহাকে এবং General Printers & Publishers Private Limited কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

To

The Registrar, Calcutta University.

Dear Sir,

I thank you for presenting me with a complimentary copy of 'Girishchandra' by Mr. Kumudbandhu Sen.

I have read the book carefully and am glad to say that the book is very well-written. The style, lucid and clear, occasionally rises to a classic grandeur and is one of the chief attractions of the book. The subject-matter too, has been treated with a warm-hearted sympathy and appreciation. I believe that a Scholar, who has a sincere admiration for subject of a memoir like this, is the right man to present him before the public, for he alone is capable to help the readers in realising the author's intrinsic merits by showing him in his most attractive form.

A vain-glorious critic, on the other hand, writes from an over-consciousness of his superiority in all matters and thus becomes unfit to do justice to his subject.

Mr. Sen has not only studied Girishchandra's works thoroughly but often seen the author on the stages of public theatres, bringing out with a singular effect, the hidden beauties of his dramas by playing the parts of their main heroes himself for he was not only a play-wright but himself an eminent player. Mr. Sen has besides mixed with Ghosh in his private life listening with wrapt attention to his views on diverse religious and literary subjects from his own lips. With all these opportunities also and results of a close study, Mr. Sen, a gifted writer as he is, was at his best in this memoir which now possesses an abiding interest for the Bengali readers.

The general culture of Mr. Sen and the standpoint of Comparative criticism adopted in his review of the drama-

tic literature of India for judging Girishchandra's position in the Bengali stage form one of the most attractive features of this memoir. I congratulate the University on their right selection of Mr. Sen for Girishchandra Ghosh Lecturer for 1933.

Behala, The 9th August, 1936.

Yours truly,
Sd. Dineshchandra Sen.

Memo. No: Pub. 246/47.

Copy forwarded to Mr. Kumudbandhu Sen for information.

SENATE HOUSE: The 18th August, 1936.

Assistant Registrar.

26, Ramkanta Bose Street,
Baghbazar, Calcutta.
The 6th August, 1936.

To

The Registrar, Calcutta University.

Dear Sir,

I hasten to acknowledge, with thanks, your presentation copy of "Girishchandra", by Babu Kumudbandhu Sen.

The work is a study and an appreciation of the great Poet—Dramatist-Actor of Bengal. I happen to be a cousin of Girishchandra, and was his inseparable companion for many years. Thus I had ample opportunities to study the Poet—and his mind and art thoroughly. But, in spite of my long and intimate acquaintance with the Poet and his works, I have no hesitation in admitting that Kumud Babu's work has thrown much new light on this favourite subject of my study. It has indeed opened an ever-widening vista of knowledge before my eyes. I offer my heartiest congratulations to both the learned author and the august authorities of the Calcutta University who have laid all genuine students of modern Bengali Literature under a deep debt of gratitude by the publication of such a valuable and scholarly work.

Thanking you,

I remain,
Yours faithfully,
Sd. Debendranath Bose.

Memo. No: Pub. 247/47.

Copy forwarded to Mr. Kumudbandhu Sen for information.

SENATE HOUSE :
The 18th August, 1936.

Assistant Registrar.

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংলায় সংস্কৃতির ধারা

গিরিশচন্দ্র যখন বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন বাংলার জাতীয় জীবন ঘোর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছিল।

নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব

কি ধর্মে, কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি সাহিত্যে, সকল দিকে পুরাতনের জীর্ণায়তনগুলি ভাঙ্গিয়া নব নব হর্ম্ম্যরাজির ভিত্তি-স্থাপনা হইতেছিল, সর্বপ্রকারে প্রাচীনতার জীর্ণ-কঙ্কাল ফেলিয়া দিয়া নূতন মানুষ গড়িবার চেষ্টা চলিতেছিল। এই যুগ—রূপান্তরের যুগ, বিদ্রোহের যুগ, নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব-কলহের যুগ।

বাংলার জাতীয় জীবনে ঊনবিংশ শতাব্দী সত্যই এক গৌরবময় ইতিহাস। ইহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে বাঙ্গালীর বিজয়-পথে নব নব অভিযান।

মানবজাতির বিশাল-তর ক্ষেত্রে রামমোহন

এই নব যুগের নবীন প্রভাতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংঘাত-সময়ে যে বাঙ্গালী রামমোহন প্রতিভার দীপ্ত-তিলক ললাটে পরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহার দীপ্তি শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না,—তিনি আধুনিক যুগে বিশ্বজনীন

মিলন-পতাকা স্কন্ধে লইয়া মানবজাতির বিশালতর ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক অভিনব নবারুণরেখা সম্পাত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণীতে ছিল অদ্বৈতবাদের ব্রহ্মজ্ঞান, সাধনায় ছিল তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনা. কণ্ঠে ছিল বৈরাগ্যের গান, বাহুতে ছিল প্রচণ্ড কর্মের তেজ, নয়নে ছিল সূক্ষ্মদৃষ্টির অগ্নিকণা এবং কার্যে ছিল সংস্কারকের রুদ্র-বহ্নি। পলাশী-যুদ্ধের পর বিজয়ী ব্রিটিশ জাতি শুধু তাঁহাদের অগণ্য পণ্যতরী, সর্বগ্রাসী বাণিজ্য-শক্তি এবং অজেয় সামরিক বল লইয়া এখানে উপস্থিত হন নাই—তাঁহাদের পশ্চাতে ছিল উদীয়মান বিজিগীষু বিরাট্ সভ্যতার আকাঙ্ক্ষা এবং নানা বৈচিত্র্যময় অফুরন্ত জ্ঞান-সম্পদের বিজয়-বৈজয়ন্তী। এই অপরিচিত নূতন সভ্যতা ও চিত্তোৎকর্ষের সহিত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ও চিন্তাধারার প্রথম সংঘাত ঘটে বাংলাদেশে। এই সংঘাতে বাংলার বৈশিষ্ট্য—অপূর্ব অবিনাশী প্রাণশক্তি ফুটিয়া উঠে। তাহার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার দিগন্তবিস্তৃত রশ্মিসমূহ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। গিরিশচন্দ্র সেই প্রতিভাচক্রের এক প্রখর অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিময়ী প্রভা।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংঘাত

গিরিশচন্দ্র যে যুগের সৃষ্টি তাহা ভালো করিয়া আলোচনা না করিলে গিরিশচন্দ্রকে ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে না। যে কোনও দেশে, যে কোনও প্রতিভাশালী কবি, দার্শনিক, সংস্কারক এবং ধর্মাচার্য মহামনীষীর উদ্ভব হউক না কেন, তাহা সৃষ্টি-রাজ্যের আকস্মিক ঘটনা নয়—তাহার

প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব আকস্মিক ঘটনা নয়

মূলে আছে দেশের ও জাতির শাশ্বত চিন্তাধারা, প্রাচীন ও নবীনের সংগ্রাম, জীবনের অবাধ গতি, স্বাধীনতার বিকাশচেষ্টা এবং সমষ্টির অন্তর্গূঢ় অলৌকিক অদ্ভুত সাধনা। নিরভ্র সুনীল গগনে মেঘ-বিদ্যুতের লীলা প্রকৃতির আচম্বিত দৈব ঘটনা নয়, রৌদ্র মাটি জল বায়ু আকাশ যেমন ধীরে ধীরে সেই অবস্থার আয়োজন ও সংযোজন করে, সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ করে, বিসঙ্কুল ও বিশৃঙ্খল করে, ঠিক তেমনভাবে অতীত-বর্ত্তমানের মিলন-দ্বন্দ্বে নব নব জ্ঞানের মাপকাঠিতে পারিপার্শ্বিক ঘটনার সূত্রগুলি মানবের অন্তরে বিপ্লবের জাল বুনিয়া থাকে। এইরূপ বিপ্লবের প্রবল তাড়নে অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহের সংঘর্ষে নানা ক্ষেত্রে নানা আকারে বিরাট্ প্রতিভা ও অসামান্য ধীশক্তির অদ্ভুত বিকাশ হয়। প্রতীচ্যের সংস্পর্শে আসিয়া বাংলাদেশে ও বাঙ্গালীর উপর প্রতীচ্যের সংস্কৃতি ও ভাবরাশি ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার সম্যক্ আলোচনা না করিলে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে বুঝা যাইবে না, তাঁহার মনন-ধারা ও তাঁহার নাট্যকলার নৈপুণ্যের পরিমাণ করা যাইবে না এবং তাঁহার নানা বৈচিত্র্যময়ী প্রতিভার গতি লক্ষ্য করা যাইবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে আমরা খ্রীষ্টশক্তির অভ্যুদয়, তাহার প্রচার ও প্রভাব দেখিতে পাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় যুগের আরম্ভ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বহুপূর্বে। বিগত ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতে যখন ইংরাজ বণিকেরা দিল্লীর বাদশাহের অনুমতি লইয়া বাংলাদেশে আসেন, তখন এদেশে ইউরোপীয় সভ্যতার বা ইংরাজী শিক্ষার

খ্রীষ্টশক্তির অভ্যুদয়, তাহার প্রচার ও প্রভাব

বিস্তার করিবার কল্পনা তাঁহাদের ছিল না। খ্রীষ্টধর্মের পতাকা লইয়া সমগ্র বাংলাদেশকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতেও তাঁহারা আসেন নাই।—তাঁহারা আসিয়াছিলেন বাণিজ্যের পণ্যসম্ভার লইয়া বাংলাদেশের স্বর্ণভাণ্ডারের ভার লাঘব করিতে এবং প্রতিযোগিতায় এখান হইতে পর্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী, ওলন্দাজ ও জার্মান প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিদিগকে অপসারিত বা প্রতিরোধ করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিতে। দৈবও ইংরাজ জাতির অনুকূলে ছিল।

পর্তুগীজের আগমন ও ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম

ইউরোপীয় জাতির আগমনের সঙ্গে এদেশে খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব। পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে জলপথে সর্বপ্রথমে আসিয়াছিল ফিরিঙ্গী পর্তুগীজ—ধর্ম-প্রচারে জন্য নহে—রাজ্য ও বাণিজ্য-বিস্তারের অভিলাষে। খ্রীষ্টধর্মের সর্ব-বরেণ্য আচার্য খ্রীষ্টজগতের অসীম শক্তিশালী জগদ্‌গুরু পোপ পঞ্চম নিকোলাস পর্তুগালাধিপতি পঞ্চম এল্‌ফন্‌সোকে প্রাচ্য-দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে আদেশ করেন। এই আদেশ ও অনুমতিবলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে খ্রীষ্টীয় ১৪৯৮ অব্দে আগষ্টমাসে বিশ্ববিশ্রুত পর্তুগীজ ভাস্কোডিগামা ভারতোপকূলে কালিকট নগরে সর্বপ্রথমে পদার্পণ করেন। পরে বাণিজ্য-ব্যপদেশে পর্তুগীজ বণিকেরা অর্থলালসায় ভারতে আসিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহারা গোয়া প্রভৃতি দেশে দুর্গ-নির্মাণ করিয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন।

সপ্তগ্রাম বন্দরে পর্তুগীজের ব্যবসায়

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগেই হউক বা পরেই হউক, পর্তুগীজ বণিকেরা জাহাজে করিয়া বাংলার সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম বন্দরে ব্যবসায় করিতে

আসিতেন। বড় বড় জাহাজ ভাগীরথীর অগভীর জলে চালাইতে সুবিধা হইত না, তাই মুচিখোলায় নোঙ্গর ফেলিয়া ছোট ছোট ডিঙ্গা নৌকা বোঝাই করিয়া সপ্তগ্রাম বন্দরে পাঠাইতেন। এই সময়ে শিবপুরের নিকটবর্তী বেতড়াগ্রামে হাট বসিত। সেখানে কলিকাতা গোবিন্দ-পুরবাসী শেঠ-বসাকেরা পর্তুগীজ বণিক্‌দের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইল। সপ্তগ্রামের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শেঠেরা সুতানুটী গ্রামে হাট বসাইল। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শের শা বঙ্গ আক্রমণ করিলে গৌড়াধিপতি মামুদ গোয়ার পর্তুগীজ রাজশক্তির সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। নয়খানি রণতরী লইয়া বাংলাদেশে পর্তুগীজ সেনাদের প্রথম আবির্ভাব। গোয়ার শাসনকর্তা সাম্প্রিয়, শেঠেদের সহিত কারবার-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলিয়া হুগলীতে উপনিবেশ স্থাপন ও একটি কুঠি নির্মাণ করিয়া গেলেন। খ্রীষ্টান জাতির উপনিবেশে গির্জা ও পাদরী চাই—তাই পর্তুগীজ ট্যাভারেজ সাহেব মোগল বাদশাহের দরবার করিয়া হুগলীতে সহর-নির্মাণ, গির্জা-প্রতিষ্ঠা ও খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের অনুমতি লইয়া আসিলেন। এই ভাবে বৈষ্ণব যুগের প্রারম্ভেই খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের সূত্রপাত হয়।

গোবিন্দপুরে শেঠ-বসাকেরা

কিন্তু তখন বাংলায় ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব। একদিকে পাঠান রাজত্বের অবসান এবং মোগল রাজত্বের আধিপত্য স্থাপন, অপরদিকে পর্তুগীজ বণিক্‌দের অর্থলোলুপতা, উৎপীড়ন ও মগ দস্যুর নৃশংস অত্যাচার। আরাকান রাজ্যের প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য বাংলার গ্রাম-নগর লুণ্ঠন করিয়া পর্তুগীজেরা অর্থলোভে বাংলার হাজার হাজার নরনারীকে অঙ্গচ্ছিদ্র-পূর্বক

বাংলায় পর্তুগীজ ও মগের অত্যাচার

রজ্জুবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করিয়া, পশুর মত দুইটি অন্নজল ছড়াইয়া দিয়া, জাহাজে জাহাজে মগরাজ্যে চালান দিয়াছে। পর্তুগীজেরা রোমীয় উদারপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত। ষোড়শ শতাব্দী রোমীয় উদারপন্থী ধর্মের পতনকাল, কারণ তৎকালে খ্রীষ্টীয় প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের সংস্থাপক মার্টিন লুথারের আবির্ভাব হইয়াছে। বাংলাদেশে তখন শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমবন্যা তরতর বেগে পূর্ণ জোয়ারে বহিতেছে। আবার আগম-বাগীশ কৃষ্ণানন্দের প্রভাবে সে সময়ে তান্ত্রিকেরাও বলবান্। কিন্তু

পর্তুগীজ আমলে শ্রীচৈতন্য ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

বাংলাতে হিন্দুধর্মের বিরোধী তখন দুইটি বৈদেশিক শক্তিমান্ ধর্মসম্প্রদায় বিদ্যমান। একটি রাজবলে বলীয়ান ইসলামধর্ম—অপরটি প্রচণ্ড বীর্যশালী—বিজাতীয় বণিক্-পরিচালিত খ্রীষ্টধর্ম। এই দুই শক্তি দেবদেবীপূজক হিন্দুধর্মকে বিনাশ করিতে উদ্যত। এই দুর্দিনে খ্রীষ্টান ও ইস্‌লাম ধর্মের আক্রমণ হইতে বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিয়াছে বাংলার সাহিত্য—বৈষ্ণব পদাবলী, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত আর মঙ্গলগীতি।

বাংলায় ইস্‌লাম ও খ্রীষ্টধর্ম

বাংলার সাহিত্য তথা বাংলার ধর্ম সে যুগে বাংলার বৈশিষ্ট্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। পরাধীনতার শৃঙ্খলে, অরাজকতার রৌদ্র তাণ্ডবে, পর্তুগীজ ও মগদস্যুর অলৌকিক বীভৎস অত্যাচারে বাঙ্গালী জাতি কোথায় থাকিত, বাঙ্গালীর ধর্ম কর্ম প্রাণ কোথায় থাকিত—যদি না বাংলার ধর্মসাহিত্য তাহা রক্ষা করিত? যখন সমগ্রজাতির সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক দুর্বলতা চরম সীমায় উঠিয়াছিল, তখন করুণসুরে করুণরসে বাংলার পদ্যসাহিত্য

বাংলার ধর্মসাহিত্য

জাতিকে পক্ষপুট বিস্তার করিয়া সমস্ত আঘাত-সংঘাত হইতে রক্ষা করিয়া জাতীয় প্রাণস্বরূপ জাতীয় ভাবরসকে বক্ষে ধরিয়াছিল। ধ্বংসের পথ হইতে করাল বহ্নির কবল হইতে সমগ্র জাতিকে কে বাঁচাইয়াছে? জাতির রুদ্ধ ক্রন্দন—মর্মবেদনা প্রকাশ পাইয়াছিল নানা রসে নানা ভাবে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যিনি অসহায়ের সহায়, নিরাশার আশা—জীবন-মরণের একমাত্র লক্ষ্য। বিশ্বের মর্মবেদনার পরিপূর্ণ বিগ্রহ অপার্থিব প্রেমমূর্তি শ্রীচৈতন্য অপার করুণায় করুণরসের উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন। সেই ভাব-বিহ্বল করুণ-রসপূরিত করুণসুর—জগতে মানুষের মর্মতন্ত্রীতে যাহা আঘাত দেয়—যাহা অন্তর মানুষকে জাগাইয়া দেয়—বাংলার প্রাণ-ধর্মকে রক্ষা করিয়াছে। বল, বীর্য, অত্যাচার, উৎপীড়ন, প্রলোভন বা আদর জাতিকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত করুণরসাশ্রিত প্রেমধর্ম বাংলার প্রাণশক্তিকে রক্ষা করিয়াছে

পর্তুগীজপ্রভাব নিষ্প্রভ হইলেও আজও আছে তাহার গৌরব চিহ্ন—ব্যাণ্ডেল গির্জা, মঠ প্রভৃতি স্থাপত্য-কীর্তি। পর্তুগীজেরা এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ফিরিঙ্গী জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশজাত নানাবিধ ফল, ফুল, সব্জী ও তরকারি দিয়া ইহারা আমাদের বাংলা উদ্যানের শোভা ও শস্য বাড়াইয়াছে। ফিরিঙ্গী খোঁপায় অন্তঃপুরবাসিনীদের প্রসাধনে ইহাদের প্রভাব দৃষ্ট হয়। বাংলার চলিত ভাষা প্রায় শতাবধি শব্দ-সম্পদে ভূষিত হইয়াছে। বর্তমানকালে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন—"কৃপার শাস্ত্রের

বাঙ্গলায় পর্তুগীজ সংস্কৃতির প্রভাব

অর্থভেদ" ও "জ্যোতিষ গণনা" রহিয়াছে। কত হিন্দুকে খ্রীষ্টান করিয়া ইহারা ধর্মান্তর ও নামান্তর ঘটাইয়াছে।

পর্তুগীজদের পরে ইংরাজ আসিয়াছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীতে—প্রায় শত বৎসর পরে। তার দশ বৎসর পরে আসেন ফরাসী, তারপর ওলন্দাজ, দিনেমার ও জার্মান। ইংরাজ তাঁহার প্রধান কুঠি রাখিলেন সুতানুটী ও গোবিন্দপুরে, ওলন্দাজ প্রথম বরাহনগরে পরে চুঁচুড়ায়, ফরাসী চন্দননগরে, জার্মান অস্টেণ্ড কোম্পানী চন্দননগরের অপর পারে পাঁচ মাইল দূরে বাঁকিপুরে বা বাঁকিবাজারে এবং দিনেমারেরা শ্রীরামপুরে। আলীবর্দী খাঁ জার্মানদের কূটচক্র দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন—ত্রিশ বৎসর পরে ইহাদের বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সহযোগে বেলজিয়ামের রাজা মূলতঃ অস্টেণ্ড কোম্পানীকে গঠন করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ইংরাজের আগমন

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জাতি কুঠি-নির্মাণ, দুর্গ-নির্মাণ এবং সুবিধা ও সুযোগ বুঝিয়া ভারতের রাষ্ট্র-বিপ্লবে যোগদান ও আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। নিজেদের প্রয়োজন-মত গির্জা-প্রতিষ্ঠা করিত ও পাদরী রাখিত। ধর্মপ্রচারের বিশেষ কোন চেষ্টাও ছিল না। পলাশী-যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভ খ্রীষ্টীয় প্রতিবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত জার্মান পাদরী কার্নাণ্ডারকে মালাবার হইতে আহ্বান করেন। মালাবার হইতে আসিয়া তিনি দিনাজপুরে দেশীয় খ্রীষ্টান বালকদের জন্য একটা ক্ষুদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে প্রাচ্যভাষা জানিতেন না।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজের আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে সঙ্ঘবদ্ধভাবে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার, শিক্ষা-বিস্তার, বাংলা গদ্যসাহিত্যের নূতন গঠন এবং নূতন রাষ্ট্রীয় রীতির উদ্ভব হয়। বিলাত হইতে উইলিয়াম কেরী খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে কৃতসংকল্প হইয়া জন টমাস সাহেবের পরামর্শে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কলিকাতায় পদার্পণ করেন। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিবৃন্দ পাদরীদিগকে সুনজরে দেখিতেন না; এমন কি, বড়লাট সাহেব কোম্পানীর পরিচালকবর্গের নিকট ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন, "Our Clergymen in Bengal, with some exceptions, are not of respectable characters." কেরী সাহেব বিনা বাধায় কলিকাতা নগরে অবতরণ করিলেও প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিবার কোন সুযোগ দেখিলেন না। এলার্টন সাহেব তখন মালদহে নীলকুঠি খুলিয়াছেন এবং মালদহে একটি সামান্য বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন। কেরী সাহেব তথায় গিয়া মালদহের ত্রিশ মাইল দূরে মদনাবতী গ্রামে নীলকুঠির কারখানায় চাকুরি গ্রহণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইখানে তিনি রামরাম বসুর নিকট বাংলা ও সংস্কৃত শিখিলেন এবং বাংলা ভাষায় বাইবেল গ্রন্থ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের আয়োজন করিতে না পারিলে ইহা মুদ্রিত হইবে কিরূপে? কেরী সাহেব কলিকাতায় একটি কাষ্ঠনির্মিত মুদ্রাযন্ত্র বিক্রয়েরও বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইলেন। অবিলম্বে তিনি কলিকাতায় গিয়া নগদ চারি শত টাকায় উহা কিনিয়া মদনাবতীতে লইয়া আসিলেন। এদিকে উক্ত বিদ্যায় শিক্ষিত লোকাভাবে তাহা অচল হইয়া পড়িয়া

শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার-কেন্দ্র

রহিল। তিনি বিলাতে তাঁহার বন্ধুবর্গকে জানাইলেন। তৎকালে অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরী সাহেব যে নীলকুঠির কারখানায় কাজ করিতেছিলেন, তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। কেরী সাহেব নিজেই একটি ক্ষুদ্র নীলকুঠি স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলেন। ঠিক এই সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল—তাঁহার সাহায্যার্থে একদল পাদরী বাংলাদেশে আগমন করিতেছেন। কিছু দিন পরে একটি মার্কিণ জাহাজে সস্ত্রীক জোসুয়া মার্শমান, সুদক্ষ মুদ্রাযন্ত্রবিদ্যাভিজ্ঞ সংবাদপত্র-সম্পাদক ওয়ার্ড সাহেব এবং ডেনিয়েল ব্রান্‌সডেন ও উইলিয়াম গ্রাণ্ট আসিলেন, কিন্তু তাঁহারা কলিকাতায় অবতরণ না করিয়া শ্রীরামপুরে গেলেন; কারণ তাঁহারা শুনিয়াছিলেন কোম্পানী সরকার কলিকাতায় পাদরীদের ধর্ম প্রচার করিতে দিতে নারাজ এবং পাদরী হিসাবে তথায় বাস করাও বিশেষ আয়াসসাধ্য। কিন্তু দিনেমারদের রাজধানী শ্রীরামপুরে সে সব প্রতিবন্ধকতা কিছুই ছিল না। ইংরাজ সরকারের বিতাড়িত অনেক পাদরী তথায় আশ্রয় পাইয়া বাস করিতেছিলেন। বিশেষ শ্রীরামপুর তখন ঘনসন্নিবিষ্ট বসতি, কলিকাতার সন্নিকট এবং সমৃদ্ধিশালী। ইহার আশে-পাশে ইউরোপীয় জাতিসমূহের কুঠী ও বসতি। তখন চন্দননগরে ফরাসীদের, শ্রীরামপুরে দিনেমারদের, হুগলীতে ইংরাজদের, চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের এবং ব্যাণ্ডেলে পর্তুগীজদের কুঠি। প্রায় তিন মাস পরে কেরী সাহেব মদনাবতী ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে তাঁহার নবাগত সহযোগীদের সহিত মিলিত হইলেন।

কেরী সাহেব দ্বিগুণ উৎসাহে খ্রীষ্টধর্ম ও শিক্ষা-প্রচারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তখন এদিকে সুনিপুণ রাজনীতিজ্ঞ

বড়লাট লর্ড ওয়েলেস্‌লী কোম্পানী সরকারের ইংরাজ রাজ-কর্মচারীরা রাজকার্যে অকর্মণ্য বলিয়া বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিলেন। শুধু অকর্মণ্য বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না—সিভিলিয়ান কর্মচারী কিরূপ সুদক্ষ হওয়া আবশ্যক তাহাও স্পষ্টভাবে লিখিয়া দিলেন। তাঁহার মনোভাব নিম্নোক্ত মন্তব্যে প্রকাশ পাইবে :—

ইংরাজ রাজকর্মচারী-দের মধ্যে সরকারের শিক্ষা-প্রচারের চেষ্টা

"The Civil Servants of the English East India Company can no longer be considered as the agents of a commercial concern; they are in fact the ministers and officers of a powerful sovereign; they must now be viewed in that capacity with a reference, not to their nominal, but to their real occupation. Their studies, the discipline of their education, their habits of life, their manners and morals should therefore be so ordered and regulated as to establish...a sufficient correspondence between their qualifications and their duties."

এই মন্তব্যের শেষে তিনি ঘোষণা করিলেন,—"কোম্পানীর জুনিয়র সিভিল সার্ভেন্টদের প্রকৃষ্টতর শিক্ষা দিবার জন্য বাংলার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইল।" ইহার প্রায় মাসখানেক পূর্বে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলা ভাষার প্রচার ও আধুনিক গদ্যের গঠন-ধারা প্রবর্তিত হইল—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় প্রচার কেন্দ্র হইতে।

এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইলে প্রথমে হিন্দী এবং আরবী-ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়—তাহার অধ্যক্ষ হইলেন জন্ গিলক্রাইস্ট। কেরী সাহেবের বাংলা বাইবেল মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলে লর্ড ওয়েলেস্‌লী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে তাঁহাকে অধ্যক্ষ মনোনীত করিলেন। কেরী সাহেব তাঁহার মুন্সী রামরাম বসু, তাঁহার পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং তাঁহার অন্যান্য পণ্ডিত ও শিক্ষকদিগকে তাঁহার সহকারিরূপে নিযুক্ত করিলেন। সরকার বাহাদুর দেখিলেন, যদিও মুসলমানদের রাজত্বকালে আরবী-ফারসী ও হিন্দুস্থানী বাংলার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে এবং কাছারি আদালত প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ছিল তথাপি বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী, আবালবৃদ্ধ নরনারী, বাংলা ভাষাতেই কথাবার্তা বলে, আমোদ-আহ্লাদ বা রস-কৌতুক করে, সঙ্গীত রচনা ও শ্রবণ করে, বাংলাতেই গান গায় এবং কেহ কেহ বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি পাঠ ও অনুশীলন করে। সুতরাং বাংলার জন-সাধারণের সহিত মিশিতে গেলে বাংলা ভাষা শিক্ষা করা অপরিহার্য। এদিকে কেরী সাহেব দেখিলেন, সহজ সরল চলিত বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বগুলি প্রচার না করিলে বাঙ্গালী খ্রীষ্টধর্মের উচ্চ আদর্শ বুঝিতে পারিবে না, এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সহিত পরিচিত না হইলে বাঙ্গালীর খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিবে না। তাই ইংরাজী জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদর্শে বাংলা সাহিত্যের গঠন ও প্রচার করিতে তিনি প্রয়াসী হইলেন। তাহা

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন ও বাংলাকে ইংরাজী সাহিত্যের অনুরূপ গঠন-চেষ্টা

ছাড়া কলেজের ছাত্র বলিতে ছিল ইংরাজ সিভিলিয়ানের দল; তাহাদের বোধ-সৌকর্যার্থ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আদর্শানুযায়ী বাংলা গ্রন্থ রচিত হওয়ারও প্রয়োজন ছিল। তিনি রামজয় তর্কালঙ্কার, রাধানাথ তর্কবাচস্পতি, রামরাম বসু, গোলোকচন্দ্র শর্মা ও চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রভৃতিকে বাংলায় উক্ত ধরনের গ্রন্থরচনায় নিয়োজিত ও উৎসাহিত করিলেন। কেরী নিজেও এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে দ্বাদশ জন অধ্যাপক কেরী সাহেবের সহকারী ও সহযোগী ভাবে কাজ করিতেছিলেন প্রকৃত পক্ষে কেরী সাহেবের নির্দেশমত ও তাঁহার প্রেরণায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তাঁহারাই গঠনকর্তা।

এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রাজা রামমোহন যাতায়াত করিয়া অধ্যাপকদের কাহারও কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিবন্ধন সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। ইঁহাদের মধ্যে রামরাম বসুর নাম সর্বতোভাবে উল্লেখযোগ্য। মহামতি কেরী বলিয়াছেন যে, রামরাম বসু ষোড়শবর্ষে উপনীত হইবার পূর্বেই আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার মত বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত তিনি আর দেখেন নাই। রামমোহন রামরাম বসুর নিকট আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত প্রভৃতি আলোচনা করিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে রামমোহনের পরামর্শে রামরাম বসু "প্রতাপাদিত্য-চরিত" লেখেন এবং তৎকালে "জ্ঞানোদয়" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেন। পদ্যচ্ছন্দে তিনি খ্রীষ্টচরিত্র কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু "লিপিমালার"র প্রারম্ভে লিখিয়াছিলেন যে, "সৃষ্টি-

রামরাম বসু ও রামমোহন

স্থিতিপ্রলয়কর্তা জ্ঞানদা সিদ্ধিদাতা পরব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করা যাইতেছে।” কাহারও কাহারও ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, রামমোহনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রামরাম বসু পরব্রহ্মের বন্দনা করিয়াছেন। রামমোহনের প্রথম গ্রন্থ “তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুবাহিদ্দিন” ফারসীতে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং উহা রামরাম বসুর প্রত্যক্ষ শিক্ষা ও প্রভাবের ফল। রামমোহনের পূর্বে তিনিই খ্রীষ্টান না হইয়া বাংলাতে খ্রীষ্টীয় ভজনসঙ্গীত রচনায় ও প্রচার কার্যে পাদরীদের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সানন্দে বরণ করিলেও তিনি পরব্রহ্মের উপাসনাই প্রচার করিতেন। রাম-মোহন এই বিষয়ে তাঁহার শিষ্য। ধর্মমতে তাঁহার উদার দৃষ্টি ছিল বলিয়াই তিনি রামমোহনের পূর্বে খ্রীষ্টসাহিত্য বাংলায় রচনা করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রামমোহনের কোনও বাংলা রচনা প্রকাশিত হয় নাই। খুব সম্ভব এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সিভিলিয়ান ও অধ্যাপকদের সংস্রবে আসায় রামমোহনের বিদ্যালাভ, মিত্রসংগ্রহ এবং ভবিষ্যতে অর্থোপার্জনের সূচনা হইয়াছিল।

যাহা হউক, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পনের বৎসর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষায় নানা বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত ও লিপিমালা, কেরী সাহেবের কথোপকথন, বাংলা ব্যাকরণ ও ইতিহাসমালা, গোলোকনাথ শর্মার হিতো-পদেশ, তারিণীচরণ মিত্রের ঈশপের গল্প, চণ্ডীচরণ মুন্সীর তোতা ইতিহাস, রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্র-

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরাজ ও বাঙ্গালী পণ্ডিতদের বাংলা গ্রন্থ-রচনা

চরিত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রাজাবলী, হিতোপদেশ ও প্রবোধ-চন্দ্রিকা এবং হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষ-পরীক্ষা। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মিঃ হেন্‌রী সার্জেন্ট, মহাকবি ভার্জিলের "ইনিয়াদ্" চারিখণ্ড এবং মিঃ মঙ্কটন সেক্সপীয়র-রচিত "টেম্পেস্ট" বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বার্ষিক অধিবেশনে স্বয়ং বড়লাট, কলেজ কাউন্সিলের সভাপতি ও সদস্যেরা, কলেজের কর্মচারী ও অধ্যাপকমণ্ডলী, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, সহরের সমুদয় সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় এবং ভারতবাসিগণ সমবেত হইতেন। এই সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে ছাত্রদের ভিতর একটি বিষয়বস্তু লইয়া বাংলা বা অপর প্রাচ্য ভাষায় বক্তৃতা ও আলোচনা হইত এবং মহামতি কেরী সেই তর্ক-প্রতিযোগিতায় মধ্যস্থের কাজ করিতেন। এমন কি, মার্টিন ও টড্ প্রভৃতির ন্যায় মনস্বী রাজপুরুষেরা উক্ত কলেজের ছাত্র-হিসাবে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিতেন।

ইংরাজ সিভিলিয়ান-দের বাংলা বক্তৃতা ও রচনা

শ্রীরামপুর খ্রীষ্টপ্রচারকেন্দ্রও এই বিষয়ে উদাসীন রহিলেন না। মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন, গ্রন্থ-প্রকাশ, সংবাদপত্র-প্রচার এবং নানাস্থানে কলেজ ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সে যুগে ইঁহাদের অপূর্ব কীর্তি। ইঁহাদের চেষ্টায় বাংলা ভাষার সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল,—ইঁহারা সাধারণের ভিতর নানা বিষয়ক জ্ঞান, ও সর্ববিধ তথ্য সহ বাংলা গ্রন্থ প্রভৃতি রচনা এবং প্রচার করিয়া বাঙ্গালীর চিত্তে জ্ঞানার্জনের একটা আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিলেন। কেরী, মার্শমান প্রভৃতি শ্রীরামপুরের পাদরীরা

শ্রীরামপুরের পাদরী সম্প্রদায় ও সংবাদপত্র-প্রচার

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিচারে জ্ঞান-প্রচারে ও শিক্ষা-বিস্তারে ব্রতী হইয়াছিলেন। বাস্তবিক সেই সময়ে মহাত্মা কেরীর নেতৃত্বে, ইংরাজ রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলার পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের রূপান্তর ঘটে।

রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরি-জীবন ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার রচনা-প্রভাবে ফিরিঙ্গী-বাংলা-সাহিত্যের গতি ভিন্নমুখী হইল। তিনি সর্বপ্রথমে সহজ বাংলাভাষায় ভারতের শাশ্বত চিন্তাধারার সঙ্গে বাংলার জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দিলেন—বাংলা গদ্যসাহিত্যে ও ভাষায়। বাঙ্গালীর চিত্তে একটা আত্মসম্বিত জাগাইলেন—তাঁহার প্রকাশিত বেদান্ত গ্রন্থ রচনায়। তিনি ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে শাঙ্করভাষ্য-সম্বলিত ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তসার, সামবেদীয় কেনোপনিষদ্, শুক্ল-যজুর্বেদীয় ঈশোপনিষদ্, কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদ্, এবং অথর্ববেদোক্ত মণ্ডূক ও মাণ্ডূক্যোপনিষদের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া প্রচণ্ড আন্দোলন তুলিলেন। দিকে দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

রামমোহনের বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব ও বাঙ্গালীর আত্মসম্বিতের উন্মেষ

যে বাংলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীতে অদ্বৈতসিদ্ধি-প্রণেতা দ্বিতীয় শঙ্কর তুল্য মধুসূদন সরস্বতী আবির্ভূত হইয়াছিলেন—যখন দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের সম্মিলিত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল অদ্বৈত-বেদান্তের বিরুদ্ধে—যখন বিপক্ষ পক্ষের কূট দার্শনিক তর্কযুদ্ধে তাৎকালীন সমগ্র ভারতের শাঙ্কর-বেদান্তবাদীরা নিষ্প্রভ, হীনতেজ ও ম্রিয়মাণ হইতেছিলেন—সেই সময়ে বাঙ্গালী ফরিদপুর কোটালীপাড়াজাত দণ্ডি-সন্ন্যাসী মধুসূদন

মধুসূদন সরস্বতী, বলভদ্র ও ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী

তাঁহার "অদ্বৈতসিদ্ধি" প্রকাশ করিয়া অদ্বৈতবাদের বিজয়দুন্দুভি নিনাদ করিয়াছিলেন। সেই অপূর্বপ্রতিভাশালী মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া আজও ভারতের পণ্ডিত-সমাজ নতমস্তকে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে বলিয়া থাকেন —

"মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী।
পারং বেত্তি সরস্বত্যাঃ মধুসূদনসরস্বতী ॥"

এই সপ্তদশ শতাব্দীতেই মধুসূদন-শিষ্য বাঙ্গালী বলভদ্র "অদ্বৈতসিদ্ধি-ব্যাখ্যা" ও "সিদ্ধিসিদ্ধান্ত" গ্রন্থ রচনা করিয়া দার্শনিক জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন—আবার সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই হউক বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই হউক, যে বাংলার ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী "বৃহচ্চন্দ্রিকা," "লঘুচন্দ্রিকা" ও "সূত্রমুক্তাবলী" রচনা করিয়া সকলের হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছেন, সেই বাংলারই রামমোহন উনবিংশ শতাব্দীতে বেদান্তগ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া জাতীয় আত্মসংবিৎ জাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন। রামমোহন শাস্ত্রগ্রন্থ ভাষায় প্রকাশ ও অনুবাদ করিয়া বাংলা ভাষাকে তেজঃসম্পন্ন করিয়াছেন ও বাঙ্গালীর স্বাধীন চিন্তা উন্মেষের সুযোগ দিয়াছিলেন। সেই দিন বাংলার পণ্ডিত-মণ্ডলী বাংলা-ভাষার গৌরব বুঝিতে পারিলেন এবং বাংলা ভাষায় বিচার করিতে অগ্রসর হইলেন। আধুনিক কৃতবিদ্যদের মত কোন কোন প্রাজ্ঞ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "তোমার এই নূতন শাস্ত্র কোথা হইতে আনিয়াছ?" তাঁহাদের উত্তরে রামমোহন তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলিয়াছিলেন, "বেদের যে সকল ভাষাবিবরণ আমরা করিয়াছি তাহা গৃহমধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি এমত নহে,

তাহার ভূরি পুস্তক অন্যত্র প্রচলিত আছে এবং বেদান্ত-ভাষ্য ও বার্ত্তিকাদি পুস্তকসকলও এই নগরেই মহানুভব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকটে এবং রাজগৃহে আছে, অতএব আমাদের কৃত ভাষা-বিবরণের কোনও একস্থানে অসমর্থ তাহার প্রমাণ করিবার সমর্থ হইলে দর্শাইয়া এরূপ যদি লিখিতেন তবে হানি ছিল না নতুবা অজ্ঞান ব্যতিরেক দ্বেষ ও পৈশূন্যতার বাক্যে কে বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা ও স্বীয় পরমার্থ লোপ করিবেক। এ যথার্থ বটে যে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য আমরা নহি যেহেতু শ্রুতির বিশেষবেত্তা মন্বাদি ঋষিরা হয়েন, কিন্তু ঐ সকল ঋষির ও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে আমরা প্রণব গায়ত্রী ও উপনিষদাদির বেদের বিবরণ করিয়াছি এবং করিতেছি; স্মৃতি ও ভাষ্য গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হয় এবং পরস্পর ঐক্য করিয়া ঐ সকল শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিবার যোগ্যতা জ্ঞানবান্ মাত্রেরই আছে।"

শাঙ্করভাষ্য ও বার্ত্তিকাদি গ্রন্থ বাংলাদেশে রামমোহনের নূতন প্রচার নহে

রামমোহন দেখিলেন যে এই দেশে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার আবশ্যক। তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের সহিত ইংরাজী সাহিত্যকে মুখ্যভাবে শিক্ষা দিবার আন্দোলন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজী ভাষা লোকে কার্য্যোপলক্ষে, ইংরাজ রাজপুরুষ ও বণিক্‌দের সহিত কথোপকথন চালাইবার জন্য, এবং কখনও কখনও সখের নিমিত্ত শিক্ষা করিত। ইংরাজী ভাষা ও শব্দ কি ভাবে এদেশে প্রচার হয় তাহার বেশ একটি কৌতুককর ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে একখানা ইংরাজী মানোয়ারী জাহাজ ভাগীরথী-বক্ষে বর্ত্তমান গার্ডেন

বাংলায় ইংরাজী শিক্ষা আন্দোলন

রিচের নিকট পৌঁছে। জাহাজের কাপ্তেন বাঙ্গালী ধনী ব্যবসায়ী শেঠ-বসাকদের সমীপে একজন "দোভাষীয়া" চাহিয়া পাঠান। করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলে যদিও তখন এই শব্দটি প্রচলিত ছিল কিন্তু বাংলাদেশে ইহার আদৌ চলন ছিল না। অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল যে কাপ্তেন সাহেব ধোবা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। তখন তাঁহারা উত্তম উত্তম পক্ক কদলীর কাঁদি ও অন্যান্য ফল মিষ্টান্নাদি উপঢৌকন সহ তাঁহাদের ধোবাকে উক্ত কাপ্তেন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রজকপুঙ্গবও নির্ভীক চিত্তে জাহাজে উঠিয়া মানোয়ারী গোরা কাপ্তেনের সম্মুখীন হইল। আকার ইঙ্গিতে সে তাহার মনোভাব জানাইল এবং কাপ্তেন সাহেবও তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন। তদবধি সে জাহাজে যাতায়াত করিতে করিতে কতকগুলি ইংরাজী শব্দ শিখিয়া ফেলিল। ইহার আবার অনেক শিষ্য প্রশিষ্য জুটিল। ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকায় এই সব ইংরাজী-নবিশ বাঙ্গালীরা বাংলা শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ জানা থাকিলে তাহা উচ্চারণ করিয়া আকারে ইঙ্গিতে অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বুঝাইয়া দিত। ইংরাজী শব্দসম্পদের মধ্যে তাহাদের পুঁজি ছিল "Yes", "No", ও "Very well."

ইংরাজী শিক্ষায় বাঙ্গালীর প্রথম আগ্রহ

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদের ইংরাজী ভাষা শিখিবার জন্য বাস্তবিক আগ্রহ জন্মিল। ইংরাজী জানা থাকিলে রাজ-পুরুষদের সহিত কথোপকথন, পত্র-ব্যবহার, মেলামেশা এবং চাকুরী গ্রহণের সুবিধা; এই সব প্রলোভনে ও স্বার্থে ভদ্র বাঙ্গালী প্রথমে ইংরাজী শিখিতে উদ্যম করিতে লাগিল।

কিন্তু তখন ইংরাজী শিখিবার বিদ্যালয়ের অভাব। ইংরাজ বণিকেরা তখন রাজ্যস্থাপন ও ধনসঞ্চয়ে ব্যস্ত, সুতরাং সেদিকে কোম্পানী সরকারের আদৌ দৃষ্টিপাত করিবার সময় ছিল না। যে কয়জন কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী ব্যবসায়-বাণিজ্যোপলক্ষে ইংরাজের সংশ্রবে আসিতেন, তাঁহারা সামান্য ইংরাজী ভাষা শিখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশ-বাসীকে ইংরাজী শিখাইয়া দু-পয়সা রোজগার করিতেন। Thomas Dycher প্রণীত "Spelling Book" এবং "School Master" তাঁহারা পড়াইতেন। বাঙ্গালী ছাত্রদের স্মরণ রাখিবার জন্য তাঁহারা বাংলা ও ইংরাজী শব্দ প্রতিশব্দ দিয়া ছড়া বাঁধিয়া দিতেন।

ফিরিঙ্গী শিক্ষক ও ফিরিঙ্গী-পাঠশালা

তাঁহাদের দেখাদেখি দেশী ফিরিঙ্গী ইউরেশীয়ানেরা কেহ কেহ শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা জমীদার, অর্থশালী ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদের বাড়ীতে গিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ভদ্রলোকেরাও তাহাদের গৃহে গিয়া ইংরাজী শিখিয়া আসিত। এইরূপে তখন ফিরিঙ্গী শিক্ষকদের গৃহগুলি ক্ষুদ্র বিদ্যালয় বা ইংরাজী পাঠশালায় পরিণত হইল। তাঁহারা পূর্বোক্ত "Spelling Book" ও "School Master" ব্যতীত "Arabian Nights Entertainments" পড়াইতেন। এই পাঠ্যগুলি যিনি সমাপ্ত করিতে পারিতেন—সেকালে তিনিই ইংরাজী ভাষায় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন।

রাধাবাজারের ঘড়ি-বিক্রেতা ডেভিড হেয়ার সাহেব ও রামমোহন বাংলা দেশে ইংরাজী উচ্চশিক্ষা প্রচলনের জন্য ব্যস্ত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিবার জন্য

রামমোহন মহামতি কেরী সাহেবকে একখণ্ড জমি দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা-কার্যে পরিণত হয় নাই। অবশেষে রামমোহন হিন্দু বালকদের জন্য শুঁড়িপাড়ায় একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। দুইজন শিক্ষকের

ডেভিড হেয়ার ও রামমোহনের ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের উদ্যোগ

অধীনে প্রায় দুইশত ছাত্র নিয়মিত ভাবে অধ্যয়ন করিত। মাসিক দশটাকা বেতনে গোলোক মিস্ত্রী নাপিত প্রধান শিক্ষক, এবং তাঁহার সহকারী ছিলেন মাসিক আট টাকা বেতনে দেবনারায়ণ দত্ত নামে জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোক। যে সব মেধাবী বুদ্ধিমান্ বালক উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিত, রামমোহন তাহাদের জন্য তাঁহার বাসভবনের সংলগ্ন উদ্যানে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি মনক্রফ্‌ট সাহেবকে মাসিক একশত টাকা বেতনে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তথাকার পাঠ্য ছিল সংস্কৃত, ইংরাজী ও ভূগোল। কুশাগ্রবুদ্ধি রামমোহন বুঝিলেন, বাংলা দেশে তাঁহার আদর্শমতে শিক্ষা দিতে গেলে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন—তাঁহার একার সামর্থ্যে কুলাইবে না। তিনি এই বিষয় লইয়া তাঁহার ইংরাজ ও বাঙ্গালী বন্ধুদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে সুপ্রীম কোর্টের চিফ্‌ জস্টিস্ সার হাইড ঈস্টের গৃহে এই উদ্দেশ্যে একটি সভা আহূত হইলে তাঁহাদের আশা ফলবতী হইতে পারে। রামমোহন উক্ত সাহেবের নিকট গিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবটি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার গৃহে একটি সভা আহ্বান করিতে সবিনয় অনুরোধ ও প্রার্থনা জানাইলেন। সাহেব তদুত্তরে বলিলেন যে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি এই কার্যে উৎসাহ দিতে পারেন, কিন্তু সরকারী

উচ্চ রাজকর্মচারী হিসাবে তিনি ইহাতে যোগদান করিতে পারেন না, এবং সরকার বাহাদুরের বিনা অনুমতিতে এতদুদ্দেশ্যে কোনও সভা আহ্বান করিতে পারেন না। তবে যদি এই নগরের হিন্দু জনসাধারণ নিজেদের ব্যয়ে ও আয়ত্তে এইরূপ বিদ্যালয় চালাইতে চাহেন তবে বোধ হয় সরকার বাহাদুরের কোন আপত্তি থাকিবে না। এই বিষয়ে কাহাদের আগ্রহ আছে এবং কাহাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে ঈস্ট সাহের তাঁহাদের নামের তালিকা চাহিলেন। রামমোহন পূর্বেই একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ঈস্ট সাহেব চাহিবামাত্রই তিনি উহা তাঁহাকে দিলেন। যাহা হউক, ঈস্ট সাহেব বড়লাট বাহাদুরকে রামমোহনের প্রস্তাব ও তাঁহার সহিত কথোপকথনের মর্ম জানাইলেন। বড়লাট বাহাদুর তাঁহার পারিষদবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে ঈস্ট সাহেব যে ভাবে প্রস্তাব করিয়াছেন অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি হিন্দু জনসাধারণের অর্থব্যয়ে ও আয়ত্তে পরিচালিত হইলে সরকার বাহাদুরের কোনও আপত্তি নাই। ঈস্ট সাহেব অনায়াসে সভা আহ্বান করিতে পারেন। যথাসময়ে উক্ত সাহেবের গৃহে সভা আহূত হইল, একা রামমোহন ব্যতীত কলিকাতা সহরের সমুদয় গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ তথায় সমবেত হইলেন। সকলেই এইরূপ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সভায় যখন রামমোহনের নিকট হইতে চাঁদা লইবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল তখন অনেকের আপত্তি হইল। কারণ তিনি হিন্দু হইয়া হিন্দুধর্ম ও সমাজকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করেন। তদানীন্তন হিন্দুসমাজ রামমোহনের সংস্কার-

হিন্দুমহাবিদ্যালয় ও সার হাইড ঈস্টের গৃহে সভা

চেষ্টার রুদ্র তেজ সহ্য করিতে পারেন না জানিয়াই তিনি সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। পাছে তাঁহার নাম সংযুক্ত হইলে এই প্রচেষ্টা বিফল হয় তাই তিনি সমুদয় আয়োজন করিয়াও অন্তরালে রহিলেন। যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের মূল, যাঁহার ক্ষুরধারতুল্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও জাতির কল্যাণ-কামনা এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি, যিনি সেই দুর্দিনে প্রতীচ্য-জ্ঞান-সম্পদ্ ও সংস্কৃতিকে সাদরে আহ্বান করিলেন—যিনি হিন্দু মহাবিদ্যালয়ের স্রষ্টা—তাঁহাকে দূরে দর্শকরূপে থাকিতে হইল, ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের আর কি পরিহাস হইতে পারে? যাহা হউক, কলিকাতা শহরের সম্ভ্রান্ত শিক্ষানুরাগী হিন্দু ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রচারাকাঙ্ক্ষী ডেভিড হেয়ার ও সার হাইড ঈস্ট প্রমুখ ইউরোপীয়গণের সমবেত চেষ্টায় হিন্দু বিদ্যালয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইল। পরে সাধারণ শিক্ষা কমিটির কর্মসচিব হোরেস হেমান উইলসনের চেষ্টায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা কলেজে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দু বিদ্যালয়-গৃহ প্রথমে চিৎপুরে এবং পরে ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের সরকারী জমিতে স্থাপিত হয়।

রামমোহন ও গোঁড়া হিন্দুসমাজ

হিন্দুবিদ্যালয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইল—যখন কাপ্তেন রিচার্ডসন এবং বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক অসাধারণ প্রতিভাশালী সুকবি ও সুপণ্ডিত ইউরেশিয়ান যুবক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও অধ্যাপনার কার্যে বৃত হইলেন। এই কলেজে তৎকালে পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট ছিল রবার্টসনের ইতিহাস, হিউম-গিবনের পুস্তকাবলী, আডাম স্মিথ ও জেরেমি বেন্থামের

ইংরেজী শিক্ষায় ডিরোজিওর প্রভাবে তরুণ হিন্দু যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিদ্রোহ

অর্থনীতি-বিষয়ক গ্রন্থাদি, লক, বার্কলি, ডুগাল্ড-স্টুয়ার্টের দার্শনিক রচনানিচয় এবং স্কট, বার্ণস্, পোপ, ড্রাইডেন, মিল্টন ও সেক্সপীয়রের কাব্য ও নাটকাবলী। রিচার্ডসনের অদ্ভুত অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে তরুণ ছাত্রদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিরাট কল্পনার অপূর্ব সৌন্দর্য্যচ্ছবি, এবং তেজঃপূর্ণ জীবন্ত ভাষার সুললিত ঝঙ্কার। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল ডিরোজিওর যুক্তিবাদে তরুণ ছাত্রদের হৃদয়ে জন্মিল অশৃঙ্খলিত স্বাধীন চিন্তা;—যাহার পরিণাম—ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও সমাজ প্রভৃতির প্রতি একটা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা। যুক্তিবাদী ডিরোজিও তাঁহার যুক্তিবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করিতেন। তাঁহার অনুরক্ত ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়েও সংশয়বাদ গভীরভাবে অঙ্কিত হইল। তাঁহারা মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, "আমাদের অশিক্ষিত পিতামাতার মত কেন দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিব? তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? শাস্ত্রপুরাণাদি যে অজ্ঞ দেশবাসীদের ভুলাইবার জন্য স্বার্থান্বেষী লোভী হিন্দু পুরোহিতকুলের স্বকপোল-কল্পিত উপন্যাস নয়—তাহার প্রমাণ কি? পুরোহিতকুলের শাস্ত্রবিধি কেন মানিয়া চলিব? নিজেদের রুচিমত পান-ভোজন করিব না কেন? আমাদের মত যাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই সেই বর্বর যুগের প্রাচীন শাস্ত্ররচকগণের বিধিনিষেধ কেন মানিব?" ছাত্রদের এই সন্দেহাগ্নিতে ডিরোজিও হবিঃ প্রদান করিলেন।

তরুণ হৃদয়ে যুক্তিবাদে ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও সমাজের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা

তাঁহার অধ্যাপনাকালে পাঠগৃহ শিক্ষক ও ছাত্রদিগের স্বাধীন বিচার-বিতর্কের পীঠস্থানে পরিণত হইত। তাঁহার

অধ্যাপনাকৌশলে ছাত্রেরা শুধু পাঠ স্মৃতিপটে রাখিত না কিংবা রাশি রাশি জ্ঞানের বোঝা স্কন্ধে বহিয়া চলিত না অথবা পরের সিদ্ধান্তগুলি রোমন্থন করিত না। তাহারা স্বীয় চিন্তাবলে যুক্তিপূর্ণ বিচারে অনেক সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইত।

ডিরোজিওর অধ্যা-পনা-কৌশল

এই তরুণ যুবকের দল স্বাধীন চিন্তার একটা মুক্ত আনন্দের মাদকতায় মাতিয়া উঠিল। এই তরুণ শিক্ষকের জ্ঞানের নির্ঝর বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া তাহাদের পিপাসা মিটাইতে পারিত না। তাহারা ঝঞ্ঝা-বাত্যা উপেক্ষা করিয়া দলে দলে তাঁহার বাস-ভবনে তাহাদের হৃদয়-পাত্র ভরিয়া জ্ঞানসুরা পান করিত। স্বাধীন চিন্তার মাদকতায় উন্মত্ত ছাত্রবৃন্দ ডিরোজিওর নেতৃত্বে ও উপদেশমতে সভাস্থাপন, সংবাদপত্র-প্রকাশ এবং দেশের অজ্ঞতা দূর করিতে ব্রতী হইল। ছাত্রদের পরিচালিত "পার্থিনন" সংবাদপত্রের প্রবন্ধাবলী—হিন্দু কলেজের পরিচালকবর্গের দৃষ্টিগোচরে পতিত হইল। কয়েক সংখ্যা বাহির হইবার পর তাঁহারা উহা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে বিনা বিচারে পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সে ডিরোজিও কর্মচ্যুত হইলেন।

ইংরাজী শিক্ষার স্বাধীন চিন্তার মাদকতা

ডিরোজিও ছাত্রদের শুধু নাস্তিকতা,—শাস্ত্রবিধির অসারতা ও গতানুগতিক চিরপ্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা দেন নাই। তাহাদের তরুণ হৃদয়ে তিনি স্বদেশ-সেবা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির সুদৃঢ় রেখাপাত করিয়াছিলেন। এই তরুণ কবির রচিত "Fakir of Jangeera"

ডিরোজিওর স্বদেশ-প্রেম

নামক সুন্দর কাব্যের নিম্নোদ্ধৃত অংশে তাঁহার সুগভীর স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

My country ! In thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast :
Where is that glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou,
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of the misery !

ইয়ং বেঙ্গল ও সংস্কারকের মাদকতা

ডিরোজিওর পদত্যাগের পর হিন্দু কলেজ হইতে অনেক ছাত্র পাঠ ত্যাগ করেন—তন্মধ্যে ছিলেন বাংলার সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের অনেকেই ছিলেন বাংলাদেশে—আধুনিক যুগের সংস্কারক, ধর্মপ্রচারক, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাবান্বিত বাংলা সাহিত্যের গঠনকর্তা। এই যুগে সতীদাহ-প্রথার ভীষণ আন্দোলন, রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভায় বেদান্ত-প্রতিপাদিত-সত্যধর্ম, খ্রীষ্টীয়-প্রচার-কেন্দ্র, কলিকাতায় সংবাদপত্র ও গ্রন্থপ্রচার সমগ্র বাংলার হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করিতেছিল। রামমোহন শান্ত সংযত ভাবে শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বনে যে সংস্কার কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন—হিন্দু কলেজের তরুণ যুবকের দল তাহা মানিয়া চলিলেন না। তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পূর্বরাগের মাদকতায়, অসংযত স্বাধীন চিন্তার প্রবল উন্মাদনায়, হিন্দু জাতিকে

পাশ্চাত্যভাবে গঠিত করিবার দুর্দমনীয় ইচ্ছায় এবং বিদ্রোহের প্রচণ্ড তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে সুরাপান ও হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য ভোজন এবং সভাসমিতিতে যেখানে সেখানে হিন্দুর ধর্ম ও সমাজকে গালিবর্ষণদ্বারা অবিরত কঠোর আঘাত করিতে ব্যগ্র। শুধু হিন্দু-ধর্ম নহে, খ্রীষ্টধর্মকেও তাঁহারা অবজ্ঞা করিতেন। শিক্ষাব্রতধারী সৌম্যমূর্তি বাংলার ছাত্রসমাজের বরেণ্য ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষী—খ্রীষ্টান হেয়ারসাহেব কোন ছাত্রকে খ্রীষ্টানুরাগী দেখিলে কঠোর শাসন করিতেন। তাঁহার আশঙ্কা পাছে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষামন্দিরগুলি হিন্দুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়—পাছে তাহারা মনে করে এই সব নব নব উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান জাতিকে খ্রীষ্টান করিবার ফাঁদ, শিক্ষাপ্রচারের ভান মাত্র।

শিক্ষা প্রচারে হেয়ার সাহেবের উদারতা

রামগোপাল, রসিককৃষ্ণ, দক্ষিণারঞ্জন, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতি যাঁহারা ডিরোজিওর নেতৃত্বে Academic Association স্থাপন করিয়াছিলেন—তাঁহারা এই যুগেই Epistolary Association, Circulating Library এবং পরিশেষে জ্ঞানোপার্জনী সভা নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন।

সংঘবদ্ধভাবে বাঙালীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

এই তরুণের দলকে লোকে ব্যঙ্গ করিয়া ইয়ং বেঙ্গল বলিত। ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব শুধু হিন্দু কলেজের বা ইংরাজী-শিক্ষিত তরুণ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না—সংস্কৃত কলেজের শান্ত নিরীহ সংস্কৃত বিদ্যার্থী ছাত্রবৃন্দের উপরও বিস্তার-লাভ করিয়াছিল। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং বলিয়াছেন, "সংস্কৃত

সংস্কৃত কলেজে ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব

কলেজ ও হিন্দুস্কুল একই হাতার মধ্যে। হিন্দুস্কুলের ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা মদ খাইত; আমরা দেখিতাম, আমাদের পয়সা ছিল না,—মদ খাইতে পারিতাম না। দেখিয়া দেখিয়া আমাদের একটা নেশা করার ঝোঁক হইল। আমরা কতকগুলি উপর ক্লাসের ছেলে ছিটে ধরিলাম।" এই ইয়ং বেঙ্গলের দল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহে এতদূর উন্মত্ত ছিলেন যে, তাঁহারা অনেকেই প্রথম প্রথম বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিতেন। মেকলের ন্যায় তাঁহারা মনে করিতেন যে "A single shelf of a good European Library is worth the whole native literature of India and Arabia."

ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার ফল

যদি ইংরাজী ভাষাকে মুখ্য না করিয়া বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাকে মুখ্য করিয়া রামমোহন ইংরাজী শিক্ষাকে গৌণ করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা সাহিত্য ভিন্ন ভাব ধারণ করিত, তাহা হইলে বোধ হয় তরুণ যুবকদের এই আসুরিক উন্মত্ততা দেখিতে হইত না।

যাহা হউক, তরুণ তীক্ষ্ণধী মেধাবী ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করিলেন। তিনি হইলেন এই ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতা। প্রতি সন্ধ্যাকালে তাঁহার গৃহে তরুণদল সম্মিলিত হইতেন। একদিন তাঁহারা সকলে সংস্কারমুক্ত হইয়াছেন কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য গোমাংস আনাইলেন। তাঁহারা সকলেই উহার স্বাদ গ্রহণপূর্বক অবশিষ্ট মাংস পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর গৃহে নিক্ষেপ করিয়া

কৃষ্ণমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল

"Beef! Beef! Beef!" বলিয়া সমস্ত পল্লীটিকে সন্ত্রস্ত করিলেন। ইহা লইয়া কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন চলিল—পরিশেষে কৃষ্ণমোহনকে গৃহত্যাগী হইতে হইল। এই কৃষ্ণমোহনই "Enquirer" নামক ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র স্বরূপ ইংরাজী সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেছিলেন—তাঁহার পরামর্শে "জ্ঞানান্বেষণ" নামে বাংলা সংবাদপত্রও পরিচালিত হইতেছিল। এই বাঙ্গালী কৃষ্ণমোহনই বাংলায় ভাক্তধর্মধ্বজী হিন্দু নেতাদিগকে গালি দিয়া ইংরাজীতে "The Persecuted" নামে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য ধরনে নাটক রচনা করেন।

কৃষ্ণমোহনের ইংরাজী নাটক রচনা

পাদরী ডফ্ ইহারই প্রাক্কালে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং বাঙালীদের মধ্যে তাঁহার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সাহায্যকারী ছিলেন—রামমোহন রায়।

ডফ্ সাহেব দেখিলেন যে বিদ্বান্ মেধাবী বাঙালী যুবকদিগকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত না করিলে বাংলায় ধর্মপ্রচার স্থায়ী ও দৃঢ় হইবে না। তাই তিনি ইংরাজী উচ্চ শিক্ষা প্রচার-কল্পে General Assembly Institution নামে একটি শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। ডফের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রচার-কার্যে রামমোহন সর্বপ্রথমে সাহায্য দান করেন। তিনি জোড়াসাঁকোর ফিরিঙ্গী কমলকৃষ্ণের গৃহে ডফ্ সাহেবের সঙ্কল্পিত বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেই বাড়িতে রামমোহনের ব্রাহ্ম সভাও ছিল। রামমোহন অগ্রণী হইয়া এই বিদ্যালয়ে প্রতিদিন সর্বাগ্রে "Lord's Prayer"

পাদরী ডফ্ সাহেবের প্রভাব ও রামমোহনের সাহায্য

হিন্দু ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রবর্তন করিলেন। পাদরী ডফ্ সাহেব হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা প্রবর্তন করিতে প্রথমে সাহস পান নাই—রামমোহনই তাঁহাকে সাহস দিয়া নিজে উদ্‌যোগী হইয়া অস্বীকৃত ছাত্রমণ্ডলীকে তাঁহার বাগ্‌বিভূতির সম্মোহনে ও নিজের দৃষ্টান্তে খ্রীষ্টীয় প্রার্থনায় যোগদান করাইলেন। রামমোহন বিলাতে যাইবার পরে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাদরী ডফ্ সাহেবের প্ররোচনায় কতকগুলি কৃত-বিদ্য হিন্দু যুবক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেন ;—তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সুপণ্ডিত কৃষ্ণমোহন ও মনস্বী ইংরাজী লেখক লালবিহারী দে। কৃষ্ণমোহনের চেষ্টায় আবার অনেকে খ্রীষ্টান হন—তন্মধ্যে প্রধান প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং বাংলার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন।

শিক্ষিত যুবকের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ

এই খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্লাবনের গতিরোধ করিলেন হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিয়া হিন্দু ও ফরাসী দর্শনের সংমিশ্রণে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করিলেন। খ্রীষ্টান গির্জার অনুকৃত মন্দির, বেদী, শ্রোতৃবর্গের বসিবার আসন, প্রার্থনা, বক্তৃতা, সমবেত কণ্ঠে স্তোত্র আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রবর্তিত হইল। তাঁহার আদর্শ চরিত্রে, মনোমুগ্ধকরী ভাষায়, অপূর্ব ধর্মভাবোচ্ছ্বাসে এবং নবীনতার আকর্ষণে অনেক শিক্ষিত যুবক যোগ দিলেন। প্রচলিত হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠানে এবং খ্রীষ্টধর্ম-তত্ত্বে যাঁহাদের প্রাণ সায় দিত না—যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রতিমাপূজার বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা আসিয়া

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং প্রচার

দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে প্রধান উদ্‌যোগী হইলেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু এবং রামতনু লাহিড়ী। খ্রীষ্টীয় প্রচার কেন্দ্রের আদর্শে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ ও তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইল। সংস্কার যুগে ব্রাহ্মসঙ্গীত, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, দেবেন্দ্রনাথের সরল প্রার্থনার ভাষা, অক্ষয়কুমারের ওজস্বিনী রচনা এবং রাজ-নারায়ণের চিন্তাশীল প্রবন্ধাবলী ও গ্রন্থ বাংলা গদ্য-সাহিত্যে এক অভিনব শ্রী ও মাধুর্য প্রদান করিয়াছিল।

ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি

নূতন নূতন ভাবের ও জাতির সংস্পর্শে বাংলার কলাবিদ্যারও রূপান্তর ঘটিয়াছে। নীলপূজায় ও চড়কের গাজনে বৌদ্ধ এবং নাথ যোগীদের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। পাঁচালী, কীর্তন ও নাটক কতকটা তাহাদের সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাই, খেমটা, তরজা ও মজলিসে মুসলমানের সংশ্রব বাংলার জাতীয় আমোদ-প্রমোদের উপকরণ বৃদ্ধি করিয়াছে। ঝুমুরে, তরজায়, টপ্পা-সঙ্গীতে এবং বাউলে মুসলমান সম্প্রদায়েরও বিশেষ দান আছে।

বাংলায় কলাবিদ্যার রূপান্তর

পাশ্চাত্ত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের আমোদ-উৎসবেরও ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটিতেছিল। পর্তুগীজদের নিকট বাঙ্গালী বেহালা পাইয়া দেশীয় রাগ-রাগিণীতে বাজাইতে শিখিয়াছে। যাত্রা ও পাঁচালীর 'সাজ-বাজানো'তে বেহালা বাদ্য-যন্ত্রের তালিকায় স্থান পাইয়াছে। হ্যালহেড্ সাহেব যাত্রাদলে মিশিয়া অভিনয় করিয়াছেন।

বাংলার যাত্রাগানে ও পাঁচালীতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব

ক্যাপ্তেন রিচার্ডসনের আমলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের হৃদয়ে পাশ্চাত্ত্য নাটক ও রঙ্গালয়ের একটা উজ্জ্বল ছবি উদিত হইল। সাহেবদের আমোদ-প্রমোদের জন্য তখন ইংরাজী নাট্যশালার অভাব ছিল না। ইউরোপীয়দের আগমনের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য আমোদ-প্রমোদও বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে। দিনের বেলায় পাশ্চাত্ত্য বণিকেরা যেমন অর্থার্জনে ব্যস্ত থাকিত, সন্ধ্যার পর তেমনি তাহাদের জাতীয় আমোদ উপভোগ করিতে কন্‌সার্ট, বলনাচ প্রভৃতি প্রমোদ-বিলাসেরও বিরাম ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের পর খিদিরপুর অঞ্চলে সাহেবেরা অনেক উদ্যান-বাটী নির্মাণ করেন, তন্মধ্যে "Kidderpur House" বিখ্যাত ছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা লাটসাহেবের পারিষদ জেমস্ আলেকজেণ্ডার মুর্শিদাবাদের নবাবকে এই উদ্যানবাটী বিক্রয় করেন। রিচার্ড বারওয়েল্ (Richard Barwell) নবাবের নিকট হইতে খরিদ করিয়া ইহা একটি ইউরোপীয় মহিলার জিম্মায় রাখেন। ইনি মিসেস্ টমসন্ (Mrs. Thompson) বলিয়া ইউরোপীয় সমাজে পরিচিত ছিলেন। ইঁহার আমলে এই উদ্যান-বাটী ইউরোপীয়দের আমোদ-প্রমোদ ও অভিনয়ের স্থান ছিল। কিন্তু মিসেস্ টমসন্ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করিলেন। ইহার পরই ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইব স্ট্রীট্ ও লায়ন্স রেঞ্জের সংযোগস্থলে কলিকাতা থিয়েটার স্থাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন, পলাশী যুদ্ধের পূর্বে লাল বাজার ও মিশন রোর সংযোগস্থলের
বাংলায় ইংরাজ সমাজের পূর্বদিকে যেখানে সেণ্ট এণ্ড্রুজ গির্জা মস্তক
রঙ্গালয় ও শ্রেষ্ঠ অভি- উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—ঐখানে
নেতা গ্যারিকের সাহায্য পূর্বে ইংরাজী নাট্যশালা ছিল। এই সব
নাট্যশালায় পুরুষেরাই স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিত। বিশ্ব-

বিশ্রুত ইংরাজ অভিনেতা ডেভিড্ গ্যারিক এই রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষতা করিতে মেস্তিক্ নামে জনৈক ইংরাজকে বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। এই রঙ্গমঞ্চে সেক্সপীয়রের Hamlet, Richard III প্রভৃতি নাটক ছাড়া অন্যান্য নাটকও অভিনীত হইয়াছিল। The School for Scandal ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হইয়াছিল। মিসেস ব্রিস্টো নামক জনৈক ইউরোপীয় অভিনেত্রী ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া অভিনয় করেন। কলিকাতায় ইংরাজী রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় স্ত্রীলোকের অভিনয় এই প্রথম। কিন্তু তিন বৎসর পরে তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় ইংরাজী রঙ্গালয়ে সর্বপ্রথম ইংরাজ অভিনেত্রীর অভিনয়

যে সময়ে অভিনেত্রী ব্রিস্টো এদেশে আসেন ঠিক সেই সময়ে জেরাসিম লেবেডফ্ নামক জনৈক রুষদেশবাসী ভদ্রলোক কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। ইনি মাদ্রাজে দুই বৎসর ব্যাণ্ড মাস্টার থাকিয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। লেবেডফ্ সাহেব "The Disguise" এবং "Love is the Best Doctor" নামে দুইখানা ইংরাজী নাটক বাংলাতে অনুবাদ করেন। গোলোকদাস তাঁহার বাংলাভাষার শিক্ষক ছিলেন। বই দুইখানি সমাপ্ত করিয়া সাহেব কয়েকজন পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিয়া তাহা দেখাইলেন। তাঁহারা পড়িয়া ভূয়সী প্রশংসা করিলে গোলোকদাস বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দ্বারা প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনয় করাইবার প্রস্তাব করিলেন। লেবেডফ্ বড়লাট স্যার জন সোরের অনুমতিক্রমে ডোমতলায় একটি বিস্তৃত রঙ্গশালা নির্মাণ করাইতে যত্নবান্

গোলোকদাস ও লেবেডফ্ এবং বাংলার নটনটীর রঙ্গালয়ে অভিনয়

হইলেন। গোলোকদাস বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিন মাস অতীত হইলে রঙ্গালয় প্রস্তুত হইয়া গেল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর ও ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে "ছদ্মবেশ" নাটকখানি অভিনীত হইল। এই অভিনয়ে বাঙ্গালার বাদ্যযন্ত্রের সহিত ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রও বাজিয়াছিল এবং এক একটি অঙ্ক শেষ হইলে রং তামাসারও বন্দোবস্ত ছিল। লেবেডফ্ মাত্র দুই বার অভিনয় দেখাইয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করিলেন। সে যুগে বাংলা নাটক অভিনয়ের এই খানেই যবনিকা পড়িল। কিন্তু কলিকাতা থিয়েটারের পর নানা স্থানে ইংরাজী নাটকের অভিনয় চলিতে লাগিল। চন্দননগর থিয়েটার, এথিনিয়াম থিয়েটার, খিদিরপুর, দমদম, বৈঠকখানা থিয়েটার প্রভৃতি ইউরোপীয়দের চিত্তবিনোদন করিত। কিন্তু ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চৌরঙ্গী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তথায় গিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। অধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসন বিলাতের সুবিখ্যাত অভিনেত্রী মিসেস্ সিডন্সের পৌত্রীকে বিবাহ করেন—তিনি এবং কাপ্তেন রিচার্ডসন এই চৌরঙ্গী রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। উইলসন সাহেবের Theatre of the Hindus গ্রন্থ দেশ-প্রসিদ্ধ। কাপ্তেন রিচার্ডসনের আমলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের হৃদয়ে ইংরাজী নাটক ও রঙ্গালয় সম্বন্ধে একটা উজ্জ্বল আদর্শের ধারণা জন্মিয়াছিল। শোনা যায় যে রিচার্ডসনের মত সেক্সপীয়র হইতে আবৃত্তিকার দুর্লভ। তিনি ছাত্রদিগকে সর্বদা রঙ্গালয়ে

বাঙ্গালা বাদ্যযন্ত্রের সহিত ইংরাজী বাদ্যযন্ত্র

হোরেস উইলসন

কাপ্তেন রিচার্ডসন ও হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ

যাইতে বলিতেন। এমন কি, ছাত্রেরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করিলে তিনি সর্ব্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করিতেন, "Are you going to the Theatre ?" তাঁহার উৎসাহে উদ্দীপনায় হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা যে কোন অনুষ্ঠানব্যপদেশে ইংরাজী নাটকের অভিনয় বা আবৃত্তি করিতেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্‌যোগে হিন্দু কলেজের ছাত্র হরচন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ যুবকদিগের উৎসাহে হিন্দু থিয়েটার প্রসন্ন-কুমারের নারিকেলডাঙ্গার বাগান বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজী ভাষায় অভিনয় হয়। ইঁহারা সেক্সপীয়রের **Julius Caesar** এবং উইলসন সাহেব কৃত উত্তর-রাম-চরিতের ইংরাজী অনুবাদ প্রথমে অভিনয় করেন। ইঁহাদের নাটকাভিনয় দেখিতে স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, কর্ণেল ইয়ং, এবং রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি যাইতেন। সমাচার দর্পণের জনৈক পত্র-প্রেরক হিন্দু থিয়েটারের উল্লেখ করিয়া লিখিয়া-ছিলেন, "অধিকন্তু সুখের বিষয় ইঁহারা ধনিলোকের সন্তান ইঁহারদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না কালিদমুনের চোঁড়াগুলো সর্ব্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আদুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গ ভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় সে আপদ নাই।" সাধারণ লোকে ইংরাজী থিয়েটারকে প্রথমে কি চক্ষে দেখিত ইহা হইতেই বুঝা যায়। এই হিন্দু থিয়েটারে **Nothing Superfluous** নামে একখানি

প্রসন্নকুমারের হিন্দু থিয়েটারে ইংরাজী অভিনয়

থিয়েটার সম্বন্ধে সাধারণ বাঙ্গালীর মতামত

প্রহসনও অভিনীত হইত। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের পর ইহা লোপ পায়। এই বৎসরের শেষ ভাগে কিংবা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসু শ্যামবাজারে একটি দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙ্গালী নটনটী দ্বারা বাংলা রঙ্গমঞ্চে বাংলা ভাষায় "বিদ্যাসুন্দর" নাটক প্রথমে অভিনীত হয়। বৎসরে চারি পাঁচখানা বাংলা নাটক ইঁহারা অভিনয় করিতেন। তিন বৎসর পরে ইহাও লোপ পাইল। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা ইংরাজী নাটক আবৃত্তি ও অভিনয় করিত। পরে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে সাঁ-সুসি থিয়েটার পার্ক স্ট্রীটে নির্মিত হয়। সে যুগের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিসেস্ লিচ্ (Leach) এই রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারিণী ছিলেন। কিন্তু ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে একরাত্রে মিসেস্ লিচ্ সজ্জিত হইয়া যখন নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করিতে যান তখন প্রদীপের অগ্নিতে তাঁহার পোষাক প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আগুনে পুড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সাঁ-সুসি নাট্যশালা ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ লোপ পায়। কিন্তু বাংলার ছাত্র-সমাজে ইংরাজী নাটকের অভিনয় মাঝে মাঝে চলিতে থাকে।

নবীনসুন্দর থিয়েটার ও বিদ্যাসুন্দর

সা-সুসি থিয়েটার ও মিসেস্ লিচ্

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে সংবাদকৌমুদী সমাচারচন্দ্রিকা জ্ঞানান্বেষণ সুধাকর সংবাদসার-সংগ্রহ সংবাদরত্নাকর প্রভৃতি বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাংলার সাহিত্য-গগনে প্রতিভাশালী কবি ঈশ্বর গুপ্তের পরিচালিত সংবাদপ্রভাকর মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা পদ্যের এক

ঈশ্বরগুপ্ত ও সংবাদ-প্রভাকর

নব যুগ প্রবর্তন করেন। ইহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের অখণ্ড প্রভাব চলিতেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গরসে সে স্রোত পরিবর্তন করিলেন। তাঁহার ব্যঙ্গময় সূক্ষ্ম-দৃষ্টি সর্বত্রে বিক্ষিপ্ত হইত। তপস্বীমাছ, বড়দিন, পৌষ-সংক্রান্তি, সমাজ-সংস্কার, রাজনীতিক্ষেত্র, বাঙ্গালীর পূজা-পার্বণ, যেখানে তিনি মেকী দেখিতেন সেইখানে তিনি ঈষৎ মুচ্‌কি হাসিয়া ব্যঙ্গরস ছড়াইয়া দিতেন। পলাশী যুদ্ধের পর এইরূপ প্রাণখোলা হাসি বাঙ্গালী প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। তুমি মেম সাহেবের তুষার-ধবল কান্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছ—ঈশ্বর গুপ্ত হাসিয়া বলিলেন,—"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে।" বাংলার ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন পাশ্চাত্ত্য জাতির গুণে মুগ্ধ ও সম্মোহিত হইয়া অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত, পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রতিভাবান্ মনস্বী ব্যক্তিগণের গৌরব-মহিমা কীর্তনে শতমুখ, তখন গুপ্ত কবি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশ-প্রেম

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ যত্ন করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

ইহা তাঁহার শুধু মুখের কথা নহে—অন্তরের মর্মবাণী। তিনি একদিকে বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মনোমোহন, রঙ্গলাল প্রভৃতি উদীয়মান শিক্ষিত তরুণ ছাত্রদিগকে বাংলা রচনায় এবং বাংলা ভাষার অনুশীলনে উপদেশ দিতেছেন, সংবাদপত্রে তাঁহাদের রচনা মুদ্রিত করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন, প্রতিবৎসর নববর্ষ-

উৎসবে ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা পুরস্কার দেওয়াইতেছেন, আবার কঠোর পরিশ্রমে ও নানাস্থান পর্যটনে বাংলার কবিদিগের জীবনী সংগ্রহ, লুপ্ত সঙ্গীতাবলীর উদ্ধার এবং তাহার প্রচার করিতেছেন। আজকাল আমরা এই প্রতিভাবান্ কবিকে শুধু "কবিওয়ালা" আখ্যা দিয়া একটু কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া থাকি, কিন্তু জীবদ্দশায় গুপ্ত-কবি ছিলেন যশোগৌরবে বাংলাদেশে অদ্বিতীয় সাহিত্য-গুরু এবং একচ্ছত্র সম্রাট্। তাঁহার হৃদয় ছিল আকাশের মত উদার এবং বিনয়ে ফলভারাবনত বৃক্ষের মতই তিনি নম্র ছিলেন।

বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে ঈশ্বর গুপ্তের চেষ্টা

ঈশ্বরচন্দ্রের নির্ভীক-ভাবে ব্যঙ্গ

তিনি ছিলেন সাহিত্য-রসে রসিক, তাই কবি বা হাফ-আখ্ড়াই আসরে বসিয়া গীত রচনা করিয়া সংগ্রাম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ভারত-সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকেও নির্ভীক চিত্তে গুপ্ত-কবি সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তুমি মা কল্পতরু,
আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি শিং-বাঁকানো ঢং।
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।

যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গাম্লা ভাঙ্গে না,
আমরা ভূসি পেলেই খুসী হব,
ঘুসি খেলে বাঁচবো না।

তাঁহার প্রতিভার শ্যামল স্নিগ্ধ ছায়ায় বাংলার প্রাণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিপ্লবেও জাগিয়াছিল। সাহিত্যে ও সমাজে রসের নবীন ধারায় বাঙ্গালীর জীবন-গতি প্রবাহিত হইয়াছিল। বাংলায় জনসাধারণের প্রাণ বাংলার রস-সাহিত্যে মাতিয়াছিল।

বাংলার উপর পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাব ও সংঘর্ষ

এইরূপে ষোড়শ শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্ত্য দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধীরে ধীরে বাংলার ভাষায়, সমাজে, ব্যবহারিক জীবনে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, ধর্মে, এবং ক্রীড়া-কৌতুকে, ও রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিরূপ অদ্ভুত উন্মাদনা, কিরূপ ঘোর মাদকতা আনিয়াছিল তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য উত্তেজনার তাণ্ডবে বিদ্রোহীর রুদ্র মূর্তিতে তখন ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী পাশ্চাত্ত্যানুকরণ-প্রিয় হইয়া হিন্দুর প্রাচীন আয়তনকে আঘাতের পর আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল। এই ধ্বংসমুখী প্রবৃত্তিকে সংযত ও সংহত করিতে সংস্কার-যুগের আরম্ভ। এই ধ্বংসের তাণ্ডব মূর্তির সম্মুখে বাংলার প্রাচীন পদ্যসাহিত্য—কাশীরাম, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, বৈষ্ণব-পদাবলী, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, কমলাকান্ত—যাত্রাভিনয়, কথকতা, পাঁচালী, কবি, হাফ-আখ্‌ড়াই, বাংলার প্রাচীন রসধারা ও সংস্কৃতি—আপনার দুর্জয় শক্তিতে আসিয়া অটলভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রচণ্ড গতিকে ব্যাহত করিয়াছে এবং সামঞ্জস্য ও শক্তির দিকে সংস্কারকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে সংস্কার যুগের আরম্ভ। এই যুগে পুণ্যশ্লোক মনস্বী নির্ভীকচেতা মহাশক্তিশালী যুবক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপ্রতিহত প্রভাব। তিনি

ভাষার গঠনে, শিক্ষার প্রবর্তনে, পবিত্র জীবন যাপনে, শাস্ত্রযুক্তির অনুযায়ী বিধবা-বিবাহের বিধানে, স্বাধীন চিন্তার উন্মেষণে এবং দয়া-দাক্ষিণ্য-মণ্ডিত হৃদয়ের সম্প্রসারণে অদ্বিতীয় পুরুষ। প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য ভাবের আতিশয্য ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত করিয়া একটা অপূর্ব সামঞ্জস্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

সংস্কার-যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলার এই ঘটনাবহুল বিপ্লব-সংস্কারের সন্ধিক্ষণে ও প্রাচীন রস-ধারার পুনরাবর্তন-যুগে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিকে উচ্ছৃঙ্খল ইয়ং বেঙ্গলের পুরোভাগে সংস্কারকামী নানাদিগ্‌বিস্তারী গৌরবদীপ্ত মনস্বী উদ্দাম অগ্রগতি-লক্ষ্যগামী তরুণ যুবকের দল, অপরদিকে ব্যঙ্গরস-রসিক প্রতিভামণ্ডিত গুপ্ত-কবির নেতৃত্বে চালিত প্রাচীন রস-সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়—এই দ্বন্দ্ব-সংকুল সন্ধিযুগে বাগবাজার বসুপল্লীতে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারী—বাংলা ১২৫০ সালে ১৫ই ফাল্গুন সোমবার গিরিশচন্দ্র আবির্ভূত হন।

ঘটনা-বহুল বিপ্লব ও সংস্কার-যুগের সন্ধিক্ষণে গিরিশের জন্ম

গিরিশচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চব্বিশ বৎসরের যুবক, মধুসূদন বিংশতি-বর্ষীয়, বঙ্কিম ও কেশব ছয় বৎসরের বালক, দীনবন্ধু চতুর্দশবর্ষীয় কিশোর যুবক, মনোমোহন ষোড়শবর্ষীয়, রামনারায়ণ দ্বাবিংশতিবর্ষীয় যুবক, ঈশ্বর গুপ্ত ত্রয়োত্রিংশবর্ষীয় পূর্ণ যুবাপুরুষ, এবং দাশরথি একচল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়।

গিরিশের জন্মকালে বাংলার সংস্কারকদের বয়স

গিরিশচন্দ্রের মনোবিকাশ

গিরিশচন্দ্রের বাল্য জীবনের ইতিহাস অতি সামান্যই পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রতিভাশালী পুরুষের ভাবী চরিত্রের একটা অস্পষ্ট ছবি ও মহত্বের বীজ তাঁহার বাল্য জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। তিনি যখন কলিকাতার উত্তরভাগে বাগবাজার পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন তখন বাগবাজার আধুনিক সহরের আকার ধারণ করে নাই—ইহা তখন না-সহর না-পল্লীগ্রাম।

গিরিশচন্দ্রের জন্মগ্রহণের শতবৎসর পূর্বে ইহা একটি সামান্য গণ্ডগ্রামের মতই ছিল—তখনও কলিকাতা সহরের রীতিমত পত্তন হয় নাই। স্টার্ণডেলের "কলিকাতা কালেক্টরেটে" দেখিতে পাওয়া যায় যে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই এপ্রিল শুক্রবার ওয়ারেন হেস্টিংস, রিচার্ড বারওয়েল, ফিলিপ ফ্রান্সিস ও এডওয়ার্ড হোয়েলার মহারাজ নবকৃষ্ণকে সুতানুটী, বাগবাজার ও হোগলকুড়িয়ার তালুকদারী দিতেছেন। নবকৃষ্ণ এই তালুকদারীর জন্য কোম্পানী সরকারকে বার্ষিক ১২৩৭৮/১০ পাই রাজস্ব দিতেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্বে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলা যখন কলিকাতা অবরোধ করেন তখন সেনাপতি মীরজাফর চিৎপুরে সৈন্য স্থাপন করিয়া মারহাট্টা খাতের দক্ষিণে বাগবাজারে হলওয়েল সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধক্ষেত্রকে লোকে সেকালে "বারুদখানা" বলিত। এই চিৎপুরে ও বাগবাজারে পেরিং সাহেবের পরম রমণীয় সুবিস্তীর্ণ উদ্যান

বাগবাজারের ইতিহাস

ছিল এবং কলিকাতার বড় বড় সাহেব সুবারা মেম সঙ্গে লইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় বায়ু-সেবন করিত। রেজাখাঁর উদ্যানবাড়ীও ইহারই সমীপবর্ত্তী ছিল। মীরজাফরের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ আজও এই অঞ্চলে দেখা যায়। বর্গীর অত্যাচারে পল্লীগ্রাম হইতে দলে দলে লোকে গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে বসবাস করিতে লাগিল। বর্গীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে যে পরিখা খনন করা হয় সেই পরিখাই "মারহাট্টা ডিচ্" বলিয়া খ্যাত। মারহাট্টা বর্গীর ভয়ে সন্ত্রস্ত অধিবাসীদের আবেদনে কোম্পানী সরকার যে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম ছিল পেরিণ দুর্গ। কোম্পানীর সহিত নবাব সিরাজদ্দৌলার যে চিঠিপত্র ব্যবহার চলিয়াছিল তাহাতে বাগবাজারের পেরিণ দুর্গেরও উল্লেখ আছে। এমন কি গিরিশচন্দ্রের বাল্যকালে এদিকে কয়েক ঘর পুরাতন সাহেবদের বসতিও ছিল। তাঁহার জন্মগ্রহণের বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সহজে সন্ধ্যাকালে কেহ এই অঞ্চলে আসিত না। প্রবাদ ছিল, চিত্রেশ্বরী মন্দিরে তখন গোপনে নরবলি হইত এবং কলিকাতায় তখন ছেলেধরার একটা প্রবল আতঙ্ক ছিল।

বাগবাজারের খাল ও রাস্তা

ব্যবসায় বাণিজ্যের সুগমের জন্য ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে খাল খাত হয় এবং ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মতলা হইতে বাগবাজার পর্য্যন্ত রাস্তা-নির্ম্মাণ ও স্থানে স্থানে পুষ্করিণী-খনন হইয়াছিল। এমন কি গিরিশচন্দ্রের জন্মের প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামপুকুর অঞ্চলে ব্যাঘ্র-ভীতি ছিল। সাহেব সুবারা এবং মৃগয়াপ্রিয় বাবুর দল এদিকে শিকার করিতে

আসিতেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার "চন্দ্রা" উপন্যাসে সিপাহী-বিদ্রোহের ঘটনা চিত্রিত করিয়াছেন—তাহাতে এই অঞ্চলের বর্ণনা করিয়াছেন "নোনা, ভাট, ঘেঁটুর অরণ্য।" "বাব্‌লার বেড়া," স্থানে স্থানে "নিবিড় আম্রবন।" বাগবাজার খালধারে "দস্যুর আড্ডা" ছিল।

শ্যামপুকুরে ব্যাঘ্রভীতি ও শিকার

সুতরাং গিরিশের বাল্যকাল ভাগীরথী-তীরবর্তী ঘন বন-চ্ছায়াচ্ছন্ন শ্যামল তৃণ-গুল্মাচ্ছাদিত শ্বাপদ-সমাকীর্ণ-বনানী-বেষ্টিত সহর-পল্লীর মাঝেই অতিবাহিত হইয়াছে। উষার অরুণ-রেখায় পূর্ব-গগন উদ্ভাসিত হইলে হিন্দু পল্লীর কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খ-নিনাদে বালকের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। বালক জাগিয়া দেখিয়াছে দলে দলে নরনারী ভক্তি-রসাপ্লুত কণ্ঠে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে, গীত গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। পর্বাহে পর্বাহে কত উৎসব, কত আনন্দ, কত সঙ্কীর্তন। বাড়ীতে তাঁহার মাতা শ্রীধরের সেবার আয়োজনে ব্যস্ত। খুল্ল-পিতামহী সন্ধ্যা-কালে বালক গিরিশচন্দ্রকে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ হইতে কত গল্প শুনাইতেন—গিরিশ একাগ্র মনে উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতেন। সুখে-দুঃখে বিরহ-বেদনার কাহিনীতে তাঁহার হৃদয় মথিত হইত। সেই পুরাণপ্রসঙ্গ গিরিশের মনে কত কল্পনার উচ্ছ্বাস, কত বিষাদ-উল্লাস, কত মহনীয় মূর্তি, কত বরেণ্য বিগ্রহেব ছবি অঙ্কিত করিয়া দিত। অলক্ষ্যে তাঁহার হৃদয়ে ভাবী জীবন-গতির গভীর রেখাপাত করিত—কত অজানা অপূর্ব প্রদেশের অস্পষ্ট সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিত। এই

গিরিশের বাল্যকাল

পুরাণ-প্রসঙ্গের প্রভাব

পুরাণ-প্রসঙ্গ শুনিতে বালকের কিরূপ আন্তরিক ব্যাকুলতা, কিরূপ চঞ্চল-ব্যগ্রতা ও কিরূপ আকুল আকাঙ্ক্ষা জড়িত ছিল তাহা একটি ঘটনায় বেশ বুঝা যাইবে। একদিন তাঁহার ভক্তিমতী খুল্ল-পিতামহী বৃন্দাবনচন্দ্রের মথুরাগমন এবং তাঁহার বিরহে ব্রজধামে বৃক্ষের লতা-পাতার, যমুনার, গোচারণে, শ্যামলী-ধবলী-গাভীদের, কৃষ্ণ-সখা সুবল ও সুদাম প্রভৃতি রাখাল দলের এবং কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত গোপ-গোপীদের প্রাণহীন অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আর কৃষ্ণ চলে গেলেন !" ব্যথিত মর্মপীড়িত বালক-গিরিশ সজল নয়নে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন, "আবার কবে এলেন ?" পিতামহী সাশ্রুকণ্ঠে বলিলেন, "আর এলেন না !" বিষণ্ণভাবে বালক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর মোটে এলেন না ?" বৃদ্ধাও বাষ্পপূর্ণনেত্রে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "না ভাই, আর এলেন না।" বালক-গিরিশ এই শোকাবেগ সংযত করিতে না পারিয়া নিরুদ্ধ অশ্রুপূরিতলোচনে গুরুভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ভাবুক গিরিশ জীবনের শেষ প্রান্তেও মাথুর পদাবলী কীর্তন শুনিতে পারিতেন না। বালক-বয়সে এইরূপ স্থায়ী গভীর ভাববিহ্বল হৃদয়াবেগ জগতে দুর্লভ।

বালক গিরিশের ভাবাবেগ

রসানুভূতিতেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ—আনন্দের স্ফূর্তি। তীব্র রসানুভূতিই কবির প্রাণ, কবিত্বের অমৃত-নির্ঝর ও মনের মনন-ক্রিয়া। গিরিশচন্দ্র বাল্যকালে এই রসানুভূতি লইয়া কথকের কথকতা, হাফ্‌ আখড়াইয়ের গান, কবির লড়াই, যাত্রার অভিনয় এবং পাঁচালী শুনিতেন। তাই গিরিশ উত্তরকালে

বাল্যে গিরিশের সহানুভূতি

তাঁহার "কাব্য ও দৃশ্য" প্রবন্ধে বলিয়াছেন "বাল্যকালে দেখিয়াছি নারায়ণ দাসের যাত্রার দলে প্রহ্লাদকে বিষ প্রদান করিতে হইবে কোন পাত্র তো উপস্থিত নাই—মন্দিরাই বিষপাত্র হইল। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা একটি হাসিবার কথা। কিন্তু যখন প্রহ্লাদ গান ধরিল—

দুখ দেবে প্রাণে স'বে ক্ষতি তায় কিছু হবে না।
আমি ম'লে ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ নাম কেউ লবে না॥

অমনি সহস্র দর্শক স্তম্ভিত, ভক্তি-করুণায় আর্দ্র হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল।"

এই ভক্তি-করুণায় আর্দ্র হইয়াই গিরিশের রসলিপ্সু মন বাল্যকালে পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে।

বাংলার আমোদ ও উৎসব

গিরিশচন্দ্রের বাল্যকালে বাংলাদেশে যাত্রা, পাঁচালী, কবি ও হাফ্‌আখড়াইয়ের খুব প্রচলন ছিল। পূজা পার্বণে আমোদ উৎসবে ইহাই ছিল সেকালে বাঙ্গালীপ্রাণের আনন্দের উৎস—রসের অভিব্যক্তি। প্রতিভাবান্ কবি দাশরথি তখন বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রিয়। তাঁহার রচিত গীত গাহিয়া ভিখারী রাজপথে পয়সা রোজগার করিত, তাঁহার রচিত গীত শুনিয়া বাঙ্গালী নয়নজলে সিক্ত হইত, ভক্তহৃদয়ে ভক্তি-রসের প্রবাহ ছুটিত, তাঁহার রঙ্গ-রস-কৌতুকে বাঙ্গালী হাসিত, কাঁদিত ও আনন্দ করিত এবং বাঙ্গালীর প্রাণে রসের সঞ্চার হইত।

পাঁচালী

কিন্তু এই পাঁচালীর স্রষ্টা দাশরথি ছিলেন না। এক সময়ে বাংলার সাহিত্য ও ধর্ম রস-রচনা পাঁচালীর দ্বারাই প্রচারিত হইত। কবিকঙ্কণ চণ্ডী,

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, কাশীরামদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এমন কি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পাঁচালী-প্রবন্ধে রচিত হইয়া গীত হইত। পাঁচালীই বাংলার প্রাচীন পদ্য-সাহিত্যকে গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়াছিল। পাঁচালী যে কত প্রাচীন তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। কেহ বলেন ইহা পাঞ্চাল দেশ হইতে আসিয়াছে তাই ইহার আদি নাম ছিল পাঞ্চালী, শেষে কথাবার্তার উচ্চারণে দাঁড়াইয়াছে পাঁচালী। কেহ বলেন ইহা পাঁচমিশালী বলিয়া ইহাকে পাঁচালী বলে। আবার কেহ বলেন ইহাতে প্রথম প'য়ে চন্দ্রবিন্দু ছিল না—পাদচারণা করিয়া গাহিত বলিয়া ইহাকে 'পাচালী' বলে। সে যাহা হউক পাঁচালীতে পাঁচটি অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বহু প্রাচীন আমোদ-প্রমোদ সাধারণতঃ পঞ্চাঙ্গপ্রধান। পাঁচালীও পঞ্চাঙ্গমূলক। প্রথমতঃ পা-চালী—অর্থাৎ পাদচারণা করিয়া সম্প্রদায়ের অধিকারী আসরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদগান ও ব্যাখ্যা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ ভাব-কালি—ব্যাখ্যায় ও গানে হস্ত, পদ, চক্ষু, মুখ এবং কণ্ঠের সুরে অভিনয়-ভঙ্গীতে ভাবের সঙ্কলন করিয়া তাহার বিকাশ দেখাইতেন। তৃতীয়তঃ নাচাড়ি—ছন্দ বিশেষে রচিত পদ্য নৃত্য করিতে করিতে আবৃত্তি ও গান চলিত। চতুর্থতঃ বৈঠকী—কখনও কখনও বসিয়া ভাল রাগ-রাগিণীতে গানের আলাপ হইত; এবং পঞ্চমতঃ দাঁড়া কবি—অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া সমস্বরে গান গাহিত। প্রাচীনকালের এই পাঁচালীর সংস্কার করেন গঙ্গারাম নস্কর ও গুরু দুম্বা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে লুপ্তপ্রায় পাঁচালীর পুষ্টিবর্ধন ও প্রচার করেন—দাশরথি রায়। তাঁহার আমলে

পাঁচালী সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাজ-বাজানো, তানপুরা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মোচাং প্রভৃতি দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান বাদন, পরে তাহার সঙ্গে ফ্লুট প্রভৃতি ইংরাজী বাদ্য-যন্ত্রও জুটিয়াছিল। সাজ-বাজানোর পর মঙ্গলাচরণ, দেবদেবী-বিষয়ক গীতি—অধিকাংশ স্থলে শ্যামা-সঙ্গীত, পরে কাটানদার কখনও পদ্যে কখনও গদ্যের ছুটকথায় উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিত, সুকবি সুরসিক কাটানদার হইলে লোকে নানা রসের তরঙ্গে ভাসিত। পরে সকলে মিলিয়া কোরাস বা সমবেত সঙ্গীত করিত। ইহার পর প্রতিদ্বন্দ্বী দল থাকিলে তাহারা আসরে আসিয়া—ঠিক প্রথম দলের মত একই ভাবে সাজ বাজাইয়া মঙ্গলাচরণ, কাটানদারের আবৃত্তি এবং সমবেত সঙ্গীত করিয়া চলিয়া যাইত। ইহার পর প্রথম দল আসিয়া সাজ বাজাইয়া তাহাদের পালা গাহিত। কেহ সখী-সংবাদ, কেহ মাথুর, কেহ দানকেলি বা কেহ মানের পালা গীত আরম্ভ করিত। সেই গীতের পর আবার সেই পালার গদ্য-পদ্যময় পর পর কয়েকটি ছড়া কাটিয়া গান গাহিয়া প্রস্থান করিলে প্রতিদ্বন্দ্বী দলও ঠিক সেই একই পালায় গদ্য-পদ্য ছড়া কাটিয়া গীত গাহিলে আসর ভাঙ্গিত। যে দলের গীত বা আবৃত্তি অধিকতর সরস ও ভাব-ব্যঞ্জনামূলক হইত সে দল লোকের নিকট প্রশংসা ও বাহবা পাইত। কিন্তু যে পালা বা সংবাদ প্রথমে গীত হইবে—সেই সংবাদ বা গীত দুই দলকে আগাগোড়া গাহিতে হইত। অন্য সংবাদ বা ভাবের দ্বারা কেহ রসভঙ্গ করিতে পারিত না।

বোধ হয় পাঁচালীর দাঁড়াকবি ও কাটানদারের অনুকরণে কবিদলের উৎপত্তি। কবিদলের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস

পাওয়া যায় না। গোঁজলা গুঁই নামক একজন কবির নাম

কবি

পাওয়া যায়। ইঁহাকে কেহ বলেন এখন হইতে প্রায় তিনশত বৎসরের, আবার কেহ বলেন প্রায় দুইশত বৎসরের পূর্বেকার কবি। তাঁহার রচিত বলিয়া একটি মাত্র গান প্রচলিত আছে। ইঁহার শিষ্য লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস ও রামজী দাস। রঘুনাথের শিষ্য রাসু নৃসিংহ এবং হরু ঠাকুর। লালু নন্দলালের শিষ্য নিতাই বৈরাগী। নিতাই বৈরাগীর শিষ্য রামানন্দ, রামজীর শিষ্য নীলু পাটনী ও রমাপ্রসাদ ঠাকুর এবং হরু ঠাকুরের শিষ্য ভোলা ময়রা। ইহা ছাড়া ফিরিঙ্গী আণ্টুনী সাহেব, কেষ্টামুচি, আকাবাই, মহেশকানা প্রভৃতি অসংখ্য কবির দল বাংলা দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহারা পাঁচালীর মতই সখী-সংবাদ, মাথুর, গোষ্ঠ, মান-ভঞ্জন প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পালা অবলম্বন করিয়া গীত বাঁধিত। এইজন্যই বাংলাদেশে একটি প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে যে "কানু ছাড়া গীত নাই।" কবিদলের সঙ্গে বাদ্য থাকিত শুধু ঢোল ও কাঁসি। দুই দলে প্রথমে কবিতা-সংগ্রাম চলিত। কেহ পূর্বপক্ষ কেহ উত্তরপক্ষ হইয়া ছড়ার লহর তুলিয়া কবিতায় বাদ-প্রতিবাদ করিত। প্রথম প্রথম কবির দল এই সব উত্তর-প্রত্যুত্তর লিখিয়া আনিত, পরে 'উপস্থিত কবিতা'র ছড়ায় জবাব দিত। এই উপস্থিত কবিতার বাঁধনদারেরা শ্লীল-অশ্লীল মানিত না। ফলে শেষে খেউড়ে পর্যবসিত হইত। মূল পালা গীতে ইহাদের রসরচনা রসিকবৃন্দের উপভোগ্য ছিল। স্থানে স্থানে অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্যে ও রসমাধুরীতে বিকশিত হইত। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ইঁহাদের রসপূর্ণ কাব্য-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া প্রাচীন কবিদের

জীবনী ও গীতি সংগ্রহ করিতে বাংলাদেশেরনানা স্থানে পর্যটন করেন। তাঁহার সময়ে সুকবির দল প্রায় লুপ্ত। তিনি বহু ক্লেশ, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে লুপ্তরত্ন উদ্ধার করিয়া ধারাবাহিকভাবে বাংলা ১২৬১ সালে “সংবাদপ্রভাকরে” প্রকাশ করেন। ইহাতে শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গিরিশচন্দ্র “সংবাদ-প্রভাকর” আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন এবং তাঁহার মুখে অনেক কবিদের গীত আবৃত্তি শুনিয়াছি। বিরহ-সংবাদে

রাম বসু ও হরু ঠাকুর

রাম বসু এবং সখী-সংবাদে হরু ঠাকুর প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাম বসু সাধারণ নায়ক-নায়িকার ভাব লইয়া তাঁহার গীত রচনা করিতেন—তাঁহার প্রথা একটু স্বতন্ত্র ধরনের ছিল। তাঁহার নিম্নলিখিত গানটি বাংলাদেশে এক সময়ে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল।

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে—
তারে বলি বলি আর বলা হ’ল না।
সরমে মরমের কথা বলা হ’ল না।

হরু ঠাকুরের সখী-সংবাদের গানও জনপ্রিয় ছিল। তাঁহার রচিত গান—

আমি রসিকের স্থানে পেয়েছি সন্ধান,
তোমার নাকি আছে সখি প্রেমরসজ্ঞান।
আমি এসেছি বিবাগে মনের বিরাগে
প্রীতিপ্রয়াগে মুড়াব মাথা!
সখি, কোন্ প্রেম লাগি প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী কোন্ প্রেমে ?

সাধারণের কণ্ঠে কণ্ঠে ইহা গীত হইত। এই সব গীতি-পদাবলী কীর্ত্তনের সুর হইতে ভিন্ন। মহড়া, চিতেন ও অন্তরা কবির সুরের প্রাণ। মহড়ায় গীত ধরিয়া চিতেনে তাহা বিকাশ করিয়া অন্তরায় তাহার পূর্ণ প্রকাশ করিত। গীত বুঝিয়া চিতেন ও অন্তরায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন হইত। পূর্ব্বে এই কবিগান ধনিনির্ধন-নির্বিচারে পাণ্ডিত ও ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে পূজা-পর্ব্বাহে আমোদ-উৎসবে গীত হইত এবং উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনিয়া সকলে আনন্দ ভোগ করিত। কিন্তু পরিশেষে সমাজের নিম্নস্তরে ইহা প্রচলিত হইলে লহরে ও খেউড়ে সকলের অশ্রাব্য হইয়া উঠিল। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনায়' লিখিয়াছিলেন, "বাংলার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় স্বল্প। এক একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহা দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্ব্বেও তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না।"

কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত

বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, "রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতিকবি। তৎপরে কতকগুলি "কবিওয়ালার" প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু,

হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।" গিরিশচন্দ্র সঙ্গীত রচনায় কবিওয়ালাদের উৎকৃষ্ট গীতগুলিকে তাঁহার মানস সমক্ষে রাখিতেন। তাঁহার সঙ্গীতে তাহাদের প্রভাবও দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মতামত

পাঁচালীর অনুকরণে কবির গানের অনুরূপে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে শান্তিপুরে আখড়াই গানের সৃষ্টি হয়। পরে সঙ্গীতশাস্ত্রপারদর্শী সুপণ্ডিত কুলুইচন্দ্র সেন নামক জনৈক ভদ্রলোক আখড়াই গানের অনেক সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন। ইনি ছিলেন বাংলার টপ্পা-সঙ্গীতের স্রষ্টা রামনিধি গুপ্ত মহাশয়ের মাতুল। রামনিধি গুপ্তকে লোকে বাংলায় "নিধুবাবু" বলিয়া জানে। নিধুবাবু সর্বপ্রথম ইঁহারই নিকট গীত শিক্ষা করেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ কুলুইবাবুর একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রায় শোভাবাজার রাজবাটীতেই তিনি বাস করিতেন। নিধুবাবু ও তাঁহার মাতুলের চেষ্টায় সেকালে কলিকাতায় আখড়াই গানের খুব প্রচলন ছিল। বিশুদ্ধ রাগরাগিণীতে তাল মান লয়ে—সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে ইহা গীত হইত। হাফ্ আখড়াইয়ের আমলে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সময়ে তাঁহার রাজবাটীতে একবার ইহার আসর বসিয়াছিল, তখন সকলে ইহার নাম দিয়াছিল ফুল আখড়াই। কবি ঈশ্বর গুপ্তের আমলের "সংবাদ-প্রভাকরের" প্রিণ্টার

আখড়াই গান

স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র করের নিকট এই ফুল আখড়াইয়ের বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়াছি।

নিধুবাবুর প্রাচীনাবস্থায় আখড়াই দলের প্রধান প্রধান সঙ্গীতকলাবিদ্‌গণের মৃত্যু হইলে ইহা লোপ পাইয়াছিল।

হাফ্‌ আখড়াই

এই সময়ে বাগবাজারনিবাসী মোহনচাঁদ বসু আখড়াই গান ভাঙ্গিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভাবে নূতন সুরে হাফ্‌ আখড়াই গানের স্বষ্টি করেন। তৎকালে কবি ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ-প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন, "মোহনচাঁদ আখড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ্‌ আখড়াইয়ের নূতন ধরণের সুর করিয়া যৎকালে বড়বাজারস্থ বাবু রামসেবক মল্লিক মহাশয়ের ভবনে শীতকালে এক শনিবার রাত্রিতে গাহনা করিলেন বোধ হয় তৎকালে প্রশংসার শব্দে বাটীর থাম পর্যন্ত কাঁপিয়াছিল, সেবারে যোড়াসাঁকো ও পাথুরেঘাটার সংযোজিত মহাশয়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পরে সেই দৃষ্টান্তানুসারে সুর প্রস্তুত করণে শিক্ষিত হইলেন তথাপি তাঁহারা অত্যাবধি তদ্বৎ উৎকৃষ্টরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।" বলিতে কি হাফ্‌ আখড়াই গান তখন কলিকাতা ভদ্রসমাজে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। গিরিশচন্দ্র বাল্যকালে এই হাফ্‌ আইড়াইয়ের আসরে কবি ঈশ্বর গুপ্তের হাস্যময় প্রতিভোজ্জ্বল বদনমণ্ডল, জনসমাজে তাঁহার অপূর্ব সমাদর এবং তাঁহাকে দর্শন করিতে জনতার আকুল আগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হন এবং সেই জনাকীর্ণ আসরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার বাল-হৃদয়ে এইরূপ কবি-যশঃপ্রার্থীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদয় হইয়াছিল। উত্তর-কালে হাফ্‌ আখড়াইয়ের আসরে গিরিশচন্দ্র গানের বাঁধনদার এবং কবিতা-সংগ্রামে গুপ্ত কবির মত সমাদরে স্থান পাইয়াছিলেন।

সেকালে যাত্রার অভিনয়ও খুব চলিত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত বা প্রাকৃত নাটকের রূপান্তর হইয়া যাত্রার উদ্ভব হইয়াছে কি না, অথবা পাঁচালী হইতে যাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে কি না, কিংবা প্রাচীনকালে প্রচলিত বাংলার কোনও দেবদেবীর উৎসব হইতে যাত্রার উদ্ভব হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

যাত্রা

পাঁচালীর মত যাত্রারও পাঁচ অঙ্গ আছে। প্রথমে সাজ-বাজানোর মত বেহালা তানপুরা ঢোলক মন্দুরার ঐকতান বাদ্য, পরে মঙ্গলাচরণ বা নর্তকীর বেশে বালকদলের কোন দেবদেবীর বন্দনাগীতি। তারপর অভিনেতাদের পাদচারণা করিতে করিতে দাঁড়াইয়া কথোপকথনে অভিনয়, অভিনেতার মুখে কখনও কখনও বৈঠকী গীত এবং স্থলবিশেষে দোহার বা জুড়ীদের সমবেতভাবে দাঁড়াইয়া গান। প্রাচীন নাটকাদিতে অভিনয় পঞ্চাঙ্গমূলক বলিয়া উল্লিখিত আছে। আবার "মহানাটকে" বৈতালিকদের গীতির সঙ্গে যাত্রার জুড়ীদের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে এইরূপ মহানাটক-জাতীয় নাটকাদি হইতেই যাত্রাভিনয়ের পরিকল্পনা হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, যাত্রার আদর্শেই মহানাটক-জাতীয় নাটকাদি রচিত ও অভিনীত হইত। রামায়ণে ও বৌদ্ধযুগে "সমাজ" নামে এক প্রকার অভিনয়োৎসবের উল্লেখ আছে, তাহাই পরে যাত্রা নামে প্রচলিত হইয়াছে কি না তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে প্রাচীনকালে জনসাধারণের প্রচলিত রঙ্গাভিনয়ের আদর্শে মহানাটকের রচনা-পদ্ধতি ও যাত্রার উদ্ভব হইয়াছে। যাহা

পাঁচালীর মত যাত্রারও পঞ্চাঙ্গ

হউক, পাঁচালীর মত যাত্রায় পাঁচ অঙ্গ থাকিলেও ধরন স্বতন্ত্র। মহাকবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় আচার্য গণদাস পঞ্চাঙ্গ অভিনয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাত্রা যে কতকালের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, তাহা আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। বাস্তবিকই যাত্রাকে বাঙ্গালীর জাতীয় নাট্যকলা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। যাত্রাকে পাশ্চাত্ত্য নাটকাবলীর ঘটনামূলক ক্রিয়ার গতিভঙ্গী দ্বারা বিচার করিলে চলিবে না। পাশ্চাত্ত্যের কথাসাহিত্য বা নাটকের আদর্শ ঘটনাবহুল ক্রিয়া—আমাদের সাহিত্যে ঘটনা অপেক্ষা রসের প্রাধান্য। আমাদের যাত্রার নাট্যকার বা অভিনেতার মুখ্য দৃষ্টি থাকে রসসৃষ্টিতে। সুতরাং যাঁহারা যাত্রায় সঙ্গীতের বাহুল্য বা সঙ্গীতাভিনয় দেখিয়া মনে করেন ইহা প্রকৃত নাটক নহে, তাঁহারা দেশীয় আদর্শ ভুলিয়া পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া এই কথা বলেন। গিরিশচন্দ্র বাংলার যাত্রাকে এবং পাশ্চাত্ত্য রঙ্গালয়কে একই নাট্যকলার অন্তর্গত বলিয়া তাঁহার নাট্যপ্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "যাঁহারা এই যাত্রাকে থিয়েটারের সহিত প্রভেদ করেন, তাঁহাদের বোধ হয় অজানিত যে সেক্সপীয়র বেন জনসন প্রভৃতি মহাকবির নাটক-সকল প্রথমে যাত্রার ন্যায়ই অভিনীত হইত। কবির বর্ণনায় রম্য উপবন, সাগর, বিশাল প্রান্তর, নিবিড় কানন দর্শককে বুঝিতে হইত যেমন আমাদের দেশে যাত্রার দর্শককে বুঝিতে হইয়াছিল।" এই প্রসঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহাকবি কালিদাস বা ভবভূতি প্রভৃতি প্রতি অঙ্কে নাটকীয় চরিত্রের

যাত্রার সহিত পাশ্চাত্ত্য থিয়েটারের তুলনা

ভঙ্গী এবং পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহাতে সহজেই অনুমিত হইতে পারে, সে সময় দৃশ্যপট থাকিলেও অভিনেতার ভঙ্গী ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাদি দর্শকদিগকে মহাকবিদের বর্ণনাতেই বুঝিতে হইয়াছিল। শকুন্তলার প্রথম অঙ্কেই "মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্," "পশ্চোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি," আয়ুষ্মন্ পশ্য পশ্য, এষ খলু কাশ্যপস্য কুলপতে-রনুমালিনীতীরমাশ্রমো দৃশ্যতে," "কিং ন পশ্যতি ভবান্," "ইদমাশ্রমদ্বারং যাবৎ প্রবিশামি" প্রভৃতির দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আনুপূর্বিক বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, দৃশ্যপটের অপেক্ষা না রাখিয়া দর্শকবৃন্দকে বুঝাইবার জন্য মহাকবির কবিত্বরসের অমৃতনির্ঝর উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহাদের অনুপম বর্ণনায় সকল দৃশ্য ও চরিত্র যেন শ্রোতার মানসপটে দিবালোকের মত উদ্ভাসিত—বাহিরের সহায়তার অপেক্ষা রাখিত না।

প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের বর্ণনা

বাংলার প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যাত্রা কত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। শ্রীচৈতন্য যখন আবির্ভূত হন তখন পাঁচালী; মঙ্গলগীতি ও যাত্রার খুব প্রচলন ছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে জানিতে পারা যায় যে নিত্যানন্দ তাঁহার ক্রীড়া-সঙ্গীদিগকে লইয়া রাম ও কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিতেন। যে অভিনয় তৎকালে প্রচলিত ছিল তাহারই অনুকরণ করিয়া দেখাইতেন।

বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে "যাত্রা"

শ্রীচৈতন্য যৌবনোদ্গমেও পার্ষদ সঙ্গে স্বয়ং অভিনয় করিয়াছেন—তাহার সাজ সরঞ্জাম ও বর্ণনা যাত্রারই অনুরূপ।

তখনও যাত্রা অঙ্ক বিভাগ করিয়াই অভিনীত হইত। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে শ্রীমন্ত বাল্যকালে সহচরদের সঙ্গে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়া খেলিতেন এবং রঙ্গভূমির অভিনেতারা যে স্ব স্ব ভূমিকানুরূপ বেশ ধারণ করিতেন তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন পদ্যসাহিত্যে যাত্রার উল্লেখ

"স্নান করি নীলাম্বর ধরে পূর্ব কলেবর
নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ।"

যাহা হউক কালক্রমে যাত্রা প্রাণহীন হইয়া পড়িল। রাজ্যবিপ্লবেই হউক বা সুদক্ষ নাট্যশিল্পীর অভাবেই হউক প্রাচীন যাত্রা একটা গতানুগতিক অনুষ্ঠানে দাঁড়াইয়াছিল। বীরভূমনিবাসী পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম সুবল অধিকারী, কেঁদেলী গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণ শিশুরাম অধিকারী, কৃষ্ণলীলায় তাঁহাদের অভিনব রচনার সরস সঙ্গীতে যাত্রাভিনয়ে নূতন গতি দান করিয়াছিলেন। এই সকল যাত্রার সাধারণ নাম ছিল কালীয়দমন যাত্রা। প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী, জয়চাঁদ অধিকারী রামচরিত্র লইয়া অভিনয় করিতেন—তাহার নাম ছিল রামযাত্রা। লোচন অধিকারী—শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস লীলা অভিনয় করিয়া যাত্রার একটা রূপান্তর ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহার "নিমাই-সন্ন্যাস" দেশপ্রসিদ্ধ ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডী অবলম্বন করিয়া গুরুপ্রসাদ বল্লভ চণ্ডীযাত্রা প্রচলন করিয়াছেন এবং লাউসেন বড়ালের "মনসার ভাসান" এই চণ্ডীযাত্রারই অন্তর্গত ছিল। রসের অবতারণা ও বিকাশ করাই ইহাদের প্রধান

যাত্রার রূপান্তর

লক্ষ্য। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর "রাই উন্মাদিনী," "স্বপ্ন বিলাস," "বিচিত্র বিলাস" ভাবজগতে রসের অপূর্ব দান। বাংলার ঘরে ঘরে তাঁহার গান গীত হইত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও "গোবিন্দ অধিকারী," "নীলকণ্ঠ অধিকারী," "নারায়ণদাস অধিকারী," "বদন মাষ্টার," "অভয় দাস," "মতিলাল" প্রভৃতির প্রভাবে জনসাধারণের চিত্ত রসের উন্মাদনায় নাচিয়া উঠিত। কি সহরে কি পল্লীগ্রামে ইঁহাদের রসপূর্ণ সঙ্গীতে বাঙালী ভাবে বিমোহিত হইত। ধনী হইতে সামান্য কৃষক ও শ্রমজীবী, নিরক্ষর মুর্খ হইতে পণ্ডিত, বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাদের গৃহকাজ ফেলিয়া, অর্থচেষ্টা ছাড়িয়া, এই রস সম্ভোগ করিত। অশ্রু-ধারায় প্লাবিত হইয়া নগণ্য দরিদ্র, যে ফলমূল তরকারী বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত সেও এই রসাস্বাদন ও আনন্দোপ-ভোগের নিমিত্ত স্বীয় হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের নিদর্শনস্বরূপ যথাসাধ্য উপঢৌকন দিত। যাত্রার রসাভিনয় ও সঙ্গীত বাল্যে ও কৈশোরে গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে কিরূপ অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। তাঁহার রসলিপ্সু কোমল হৃদয়ে ইহার রস উদ্দীপনার প্রভাব কিরূপ অনুভূত হইয়াছিল তাঁহার নাট্য প্রবন্ধাবলীতে স্থানে স্থানে তিনি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রা

"আমরা দেখিয়াছি 'শ্রীমন্তের মশান' যাত্রা হইতেছে, যাহারা দারোয়ান সাজিয়াছে তাহারা 'ডোঁক ব্যাটা ডোঁক' বলিয়া হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথাটা এই—শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিতে চাহিতেছে, কোতোয়ালেরা বলিতেছে 'ডাক বেটা, চণ্ডীকে ডাক।' শ্রোতারা হাসিতেছে, শ্রীমন্তের হাতে

৮

লাল রুমাল জড়ান, পীড়নের কোন চিহ্নই নাই। শ্রীমন্ত গান ধরিল—

'মা, কোথায় আছ শঙ্করি !
প'ড়ে ঘোর দায় ডাকি মা তোমায়
বন্ধন-জ্বালায় জ্বলিয়া মরি।'

ইহাতে শ্রোতারা অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। লাল রুমাল হাতে জড়ানোতে বন্ধন-জ্বালা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না, তথাপি শত শত ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত, সঙ্গীতে শ্রীমন্তের মশান উদ্দীপন করিয়াছে, সকলে বলিতেছে, 'লোকা কি গায় !' "

এই লোকা হইতেছে সুপ্রসিদ্ধ যাত্রার অধিকারী লোকা ধোবা ! যাত্রায় সঙ্গীতে রস উদ্দীপনায় যাত্রার অধিকারীরা কিরূপ নিপুণ ছিলেন তাহা বদন অধিকারীর নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে বোঝা যাইবে। বৃন্দাবনচন্দ্র মথুরায় গিয়াছেন—বিরহ-ব্যথিতা কিশোরী স্বর্ণকমল দিন দিন মলিন হইয়া পড়িতেছে—তাঁহার সেই জীবন্মৃত অবস্থা দেখিয়া শ্রীবৃন্দা দূতী মথুরায় শ্রীকৃষ্ণকে আনিতে গিয়াছেন—কৃষ্ণের বাঁশরীর কথা উল্লেখ করিয়া মথুরাবাসীকে বলিতেছেন—

তেমন বাঁশী বাজেনা হেথায় !—
তোদের মথুরায় !
যে বাঁশী শুনে আকুল প্রাণে
কুল ত্যজেছে গোপিকায় !

শুন্‌তো বাঁশী সারি-শুকে
শুন্‌তো কোকিল অধোমুখে
কুঞ্জমাঝে গুঞ্জরিতে
ভুলে যেত ভ্রমরায় !

আকাশে রবিশশী
শুন্‌তো যে মোহন বাঁশী—
তেমন বাঁশী প্রাণ-উদাসী
বাজে কি যেথায় সেথায় ?

গিরিশচন্দ্র তাঁহার "কাব্য ও দৃশ্য" প্রবন্ধে যাত্রাপ্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "এই শ্রেণীর সমালোচক (অর্থাৎ যাঁহারা পাশ্চাত্তাভাবের বাহ্য দৃশ্যপটে সাজসজ্জায় কৃত্রিম অনুকরণে মুগ্ধ) প্রথমে যাত্রার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করেন, ইহাতে ক্ষতি লাভ উভয়ই হইল। যাত্রায় কতকগুলা অশ্লীল ভাঁড়ামি ছিল তাহা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বদন অধিকারী গোবিন্দ অধিকারীর মধুর রসের সঙ্গীতস্রোতও লোপ পাইল।"

উদ্ধৃত বাক্যেই বোঝা যায়, গিরিশচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরে যাত্রার রসসঙ্গীত ও রসাভিনয় তাঁহার কোমল চিত্তে কিরূপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, সঙ্গীত রচনা-কালে তিনি প্রাচীন কবিদের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে সর্বপ্রথম এই সঙ্গীত-রচনার প্রতিভাই বিকাশ পাইয়াছিল। বাংলাদেশে "বিদ্যাসুন্দরের" রসসঙ্গীত ঘরে ঘরে গীত হইত।

কথকতাও তাঁহার বাল্যজীবনে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। এই কথকতার সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন—সোনামুখী

গ্রামের গঙ্গাধর শিরোমণি। পূর্বে পুরাণ-পাঠই প্রচলিত ছিল—গঙ্গাধর পুরাণ-পাঠে অদ্বিতীয় ছিলেন—তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা অপূর্ব ছিল। একদিন বৈকালে বেদীতে বসিয়া পাঠ করিতে গিয়া দেখেন যে শ্রোতার সংখ্যা অতি অল্প। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ঐ গ্রামে এক জায়গায় রামায়ণ গান হইতেছে—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাহা শুনিতে গিয়াছে। শিরোমণি সব শুনিয়া গম্ভীরভাবে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে জানাইলেন যে, "আগামী কল্য আমি এখানে ভাগবত গান করিব—গ্রামবাসীদিগকে জানাইয়া দিবে।" শিরোমণি মহাশয় একাধারে গায়ক, পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তাঁহার সুন্দর কণ্ঠস্বর, সুবিন্যস্ত সরস কবিত্বপূর্ণ মনোহর সুললিত বর্ণনা, প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এবং সরস সঙ্গীতে সকলে মুগ্ধ হইলেন। নিকটবর্তী নানাগ্রাম হইতে লোকে দলে দলে তাঁহার এই অদ্ভুত নূতন রীতিতে পুরাণ-পাঠ শুনিল। শিরোমণি মহাশয়ও ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত হইতে নানা আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া দিনের পর দিন এইরূপ কথকতা করিতে লাগিলেন। পরে কৃষ্ণহরি ও গোবরডাঙ্গার রামধন শিরোমণি নানা বৈচিত্র্যময় হাবভাব প্রবর্তন করিয়া ইহাকে পুষ্ট ও প্রচার করেন। কিন্তু শ্রীধর কথক ও ধরণী কথক তাঁহাদের অসামান্য প্রতিভায়, সঙ্গীত রচনায় ও অপূর্ব বর্ণনা কৌশলে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ইহাকে জনপ্রিয় ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর দিগম্বর কথকের কলিকাতায় বিশেষ প্রতিপত্তি—তাঁহার কথকতার প্রভাব গিরিশচন্দ্রের মনে

কথকতার সৃষ্টি

গিরিশের কথকতা

স্থায়ী রেখাপাত করিয়াছিল। কথকতার কলানৈপুণ্য-প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র উচ্চ প্রশংসা করিলে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার উক্তির প্রমাণ দেখাইবার জন্য যৌবনে তিনি তাঁহার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকবি ও সঙ্গীত-রচয়িতা স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরীর গৃহে "ধ্রুবচরিত্র" আখ্যায়িকা অবলম্বনে নানা হাবভাবের সহিত কথকতা করিয়া উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই কথকতার ফলে তাঁহার ধ্রুবচরিত্র নাটক রচিত।

মাতার হতাদর ও কঠোর শাসন

বাল্যের এই রসলিপ্সু মন মাতৃস্তন্য পীযূষধারায় বঞ্চিত—গিরিশের জন্মের পরই মাতা সূতিকা-রোগাক্রান্তা। একজন বাগ্দিনীর ক্ষীরধারায় গিরিশের শিশুজীবন রক্ষা পাইয়াছে। বাল্য বয়সেও মাতৃস্নেহাতুর বালক মাতার আদর পান নাই। অষ্টম গর্ভের সন্তান পাছে তাঁহার স্নেহদৃষ্টিতে শুকাইয়া যায় —পাছে তাহার জীবনকলিকা তাঁহার নিঃশ্বাসে অকালে ঝরিয়া পড়ে—এই ভয়ে বালককে মাতা তাঁহার স্নেহনীড়ে আশ্রয় দেন নাই। গিরিশের অতৃপ্ত ক্ষুধাতুর মন মাতার স্নেহকণার লোভে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। পিতা নীলকমলের অসীম যত্ন ও আদর বালকের মাতৃস্নেহের পিপাসা মিটাইতে পারিত না। মাতার কর্কশ আচরণে, কঠোর শাসনে ও হতাদরের দারুণ নিষ্ঠুর মূর্তির অন্তরালে যে সন্তান-বৎসলা কল্যাণময়ী জননীর গভীর স্নেহবারিধির উত্তাল তরঙ্গের উচ্ছ্বাস মাতৃবক্ষে ক্রীড়া করিতেছে, তাহা দৈবক্রমে গিরিশ জানিতে পারিলেন। সেদিন গিরিশ কর্ণমূলস্ফীতিজনিত জ্বরে অচৈতন্য—হঠাৎ মাতার অমৃত-স্বরলহরী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ

করিল। গিরিশের প্রাণ-রক্ষার জন্য তাঁহার পিতার নিকট মাতার ব্যাকুল আবেদন। নীলকমলও বিস্মিত। বিস্মিত হইয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "গিরে'র জন্য তুমি এত কাতর কেন?" মাতা সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "আমি রাক্ষসী—একটি ছেলেকে খেয়েছি। পাছে আমার রাক্ষসী দৃষ্টিতে আমার এই অষ্টম গর্ভের সন্তানের কোনও অকল্যাণ হয় তাই আমার নিকট আসিলে তাহাকে দূর দূর করিতাম। একদিনও বাছার ব্যথা-কাতর মুখের দিকে তাকাই নি—একদিনও তাকে আদর ক'রে ডাকি নি।" বলিতে বলিতে মাতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। সেই রোগ-শয্যায় গিরিশের অন্তর্দৃষ্টি খুলিল—মানব-চরিত্রের একটা গূঢ়রহস্যময় দিকের সন্ধান গিরিশের বাল-হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। গিরিশের রসপুষ্ট মনে সূক্ষ্ম বিচারদৃষ্টির বীজ পড়িল। কৈশোরে গিরিশ মাতার অসীম স্নেহধারার সন্ধান পাইয়া তাঁহার আজন্মসঞ্চিত পিপাসা তৃপ্ত করিতে যখন উহা হইতে আকণ্ঠ পান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার মাতা ইহ-জগত হইতে চিরবিদায় লইলেন।

মাতার কথায় গিরিশের অন্তর্দৃষ্টি খুলিল

গিরিশের মাতৃবিয়োগ

জননীর এই কল্যাণনিরতা মহীয়সী মূর্তি গিরিশচন্দ্র জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত নাটকে, গল্পে ও সঙ্গীতে মাতৃভক্তির রস উছলিয়া উঠিয়াছে। "কালাপাহাড়" নাটকে চিন্তামণি বলিতেছেন, "কি, মাকে লজ্জা! যাঁর কোলে দিগম্বর হ'য়ে শুয়ে অমৃত পান ক'রেছি, যে অভয় কোলে যমের ভয় থাকে না, যে নামে রণে, বনে, সঙ্কটে সাহস বাড়ে, যাঁকে ভুলে ঘৃণিত লজ্জিত

নাটকে মাতৃচরিত্র

কুৎসিত কাজ শিখেছি—সেই মাকে বালকবয়সে লজ্জা ক'র্‌বো? . যার মনে পাপ সেঁধিয়েছে, সে লজ্জা করুক, আমি মাকে ডাকি, আমার নিষ্পাপ শরীর।"

গিরিশের অঙ্কিত মাতৃচরিত্রে বৈশিষ্ট্য

তাঁহার বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রচ্ছন্ন মাতৃস্নেহ অঙ্কিত করিয়াছেন অশোক নাটকে "সুভদ্রাঙ্গী" এবং গল্পগুচ্ছে গোবরার "অন্নদা" চরিত্রে। গোবরা গল্পের "মণিবাগ্দিনী" তাঁহার বাল্যের স্তন্যদায়িনী পালয়িত্রী বাগ্দিনীর প্রতিচ্ছবি। "উমাচরণ" তাঁহার আত্ম-জীবনীর ছায়ায় গঠিত। গিরিশচন্দ্র বাল্যজীবনে তেজস্বিনী মাতার কোমল-কঠোর মূর্তি দেখিয়াছেন—তাঁহার সেই বাল্যের হৃদয়জাত কল্পনায় বিকাশ পাইয়াছে তেজস্বিনী পুত্রস্নেহে বিগলিতপ্রাণা পুত্রহারা উন্মাদিনী "জনা"র আবেগোচ্ছ্বাসময়ী শোকার্তার বিলাপধারায়! উত্তরকালে নাটকাদিতে মাতৃচরিত্র অঙ্কনে গিরিশচন্দ্রের একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মাতার কঠোর শাসনে গিরিশের বাল্যহৃদয়ে সত্যনিষ্ঠার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। যদি কখনও বালসুলভ চপলতাবশতঃ

মাতার কঠোর শাসনে গিরিশের সত্যনিষ্ঠা

গিরিশ কোনও অন্যায় বা মিথ্যাচরণ করিতেন, তবে তাঁহার মাতা শুধু কঠোর শাস্তি দিয়াই বিরত থাকিতেন না, কিংবা "আর করিব না" এই প্রতিশ্রুতিতেই মার্জনা করিতেন না। তিনি বালকের মুখে গোময় পূরিয়া দিয়া সেই মুখের শুদ্ধি করিয়া দিতেন। ইহার ফলে গিরিশের সত্যের উপর দৃঢ়নিষ্ঠা জন্মিয়াছিল।

তাঁহার রচনায় সত্য ও সত্যনিষ্ঠার গৌরব-ঘোষণা

তাঁহার নাটকীয় চরিত্রে, কবিতাবলীতে ও প্রবন্ধসমূহে তিনি সত্য ও সত্যনিষ্ঠার গৌরব ঘোষণা

করিয়াছেন। তাঁহার "রামের বনবাস" নাটকে শ্রীরাম কৌশল্যাকে বলিতেছেন—

"মাগো, পিতৃবাক্য পালিব জননি,
নরকে মজিব, সত্যে যদি করি হেলা।
সত্যাশ্রয়ে বিঘ্ন না ঘটিবে,
পুনঃ দেখা হবে, বন্দিব চরণ পুনঃ।"

তাঁহার "কালাপাহাড়" নাটকে নবাব সোলেমানের সম্মুখে লেটো বলিতেছে, "আমি জাঁহাপনার নিকট সত্য কথা বল্‌ছি, আমি সত্যাশ্রয়ী, প্রাণের ভয় করিনে।"

"প্রফুল্ল" নাটকে প্রফুল্ল তাঁহার স্বামী রমেশকে বলিতেছেন, "আমি মিছে কথা ব'ল্‌তে পার্‌বো না; ঠাকরুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়।"

"চণ্ড" নাটকে মুকুলের ধাত্রীমাতা কুশলা রাজমাতা গুঞ্জমালাকে বলিতেছেন, "আমি বৃদ্ধা রাজপুতকুমারী, ধর্মাশ্রিতা সত্যবাদিনী, আমার প্রাণের ভয় কি?"

"পলিসি" নামক প্রবন্ধে গিরিশ লিখিয়াছেন, "স্বার্থত্যাগ করিলে সত্য তোমার অবলম্বন হইবে। সুখে দুঃখে এরূপ অবলম্বন বন্ধুর উপর নির্ভর করিয়া, স্ত্রীর উপর নির্ভর করিয়া, পুত্রের উপর নির্ভর করিয়া করা যাবে না। সত্য বড় বলবান অবলম্বন।" তাঁহার রচিত "প্রতিধ্বনি" কবিতা-পুস্তকে "সত্য" নামক পদ্যে গিরিশ বলিতেছেন—

"আজীবন সত্য তোরে ক'রেছি আদর!
কেন তুমি হ'য়ে আছ পর?

এ সংসারে স্থান নাই　　　সত্য বুঝি বল তাই,
চল যাই যথা, সত্য, তুমি মনোহর!
পর নহ সত্য তুমি, কহিছে অন্তর!"

সত্যের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা, সরল উচ্ছ্বাস এবং প্রবল নিষ্ঠা গিরিশ-চরিত্রের প্রধান গৌরব ছিল। মাতার শিক্ষায় ও কঠোর শাসনে বালক-বয়সেই গিরিশের সত্যের প্রতি অনুরাগ ও নিষ্ঠা জন্মে।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে পিতার পরলোক-গমনের পর গিরিশ তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি লইয়া এক মোকদ্দমায় জড়িত হন। সেই মোকদ্দমায় গিরিশকে সাক্ষী দিতে হয়। তিনি অম্লানবদনে সব সত্য কথা খুলিয়া বলেন—তাহার ফলে তাঁহাকে মোকদ্দমা হারিতে হইয়াছিল এবং আর্থিক ক্ষতিও ঘটিয়াছিল। পল্লীর মুরুব্বিস্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই তাঁহাকে নির্বোধ বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। গিরিশ সেই সময়ে বুঝিলেন, সংসারে সত্যের আদর নাই—মিথ্যারই গৌরব। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগে এবং তাঁহার রচনায় সে আঘাতের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। সংসারের মান, যশ এবং সুখ্যাতির মূল্য গিরিশ বুঝিলেন কিছুই নাই। তাই তিনি আজীবন সংসারের সমাদর ও সুখ্যাতির প্রতি উদাসীন ছিলেন—শুধু উদাসীন নহে রীতিমত উপেক্ষা করিয়াছেন। গিরিশের মনের ইহাও একটা বৈশিষ্ট্য। এই ঘটনার পর হইতে গিরিশ তাঁহার মনের নির্দেশমত চলিয়াছেন—সংসারের মান, অপমান এবং সুখ্যাতি ও অপবাদের

গিরিশের সত্যনিষ্ঠায় আঘাত

নিন্দা-প্রশংসায় ঔদাসীন্য

প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। বাল্যে ও কিশোর বয়সে গিরিশ-চন্দ্রের যে মন বাংলার প্রাচীন ভাবরসে বর্ধিত হইতেছিল—কিশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে তাঁহার সেই রসপুষ্ট মন পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবান্বিত বাংলার নাট্যাভিনয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

সংস্কারযুগে বাংলাদেশে রঙ্গালয়ের আন্দোলন

গিরিশচন্দ্রের জীবনের দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে রঙ্গালয় ও নাটক-রচনার প্রবল আন্দোলন। রামনারায়ণের "কুলীন কুলসর্বস্ব" সংস্কারযুগের প্রথম বাংলা নাটক। ইহার লক্ষ্য ছিল কৌলীন্য-প্রথার উচ্ছেদ। কি কলিকাতা সহরে, কি বাংলার পল্লীগ্রামে সুদূর মফঃস্বলেও ইহা অভিনীত হইয়া নাটকাভিনয়ের একটা নূতন তরঙ্গ তুলিয়াছিল। শিক্ষিত সমাজ একটা সাড়া পড়িয়াছিল। পণ্ডিত-সমাজ ও ইংরাজী-শিক্ষিত

রামনারায়ণ

যুবকের দল—সকলেই এই বাংলা নাটককে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জমিদার পরিতুষ্ট হইয়া নাট্যকারকে পুরস্কার দিলেন এবং সারা বাংলাদেশ কৌলীন্য-প্রথার বর্বরতা বুঝিতে পারিল। রামনারায়ণের রচনায় যেমন লালিত্য ও পাণ্ডিত্য ছিল তেমনি রসিকতাও প্রচুর ছিল। সেকালে যেখানে ভোজের আয়োজন হইত সেখানে প্রাচ্যকল্পের পণ্ডিত ও ইংরাজী-শিক্ষিত যুবক আনন্দে "কুলীন কুলসর্বস্বে"র উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণের কবিতা আবৃত্তি করিত—

"ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি দুচার আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাক ভাজা মতিচুর বঁদে খাজা
ফলারের জোগাড় বড়ই॥"

কিংবা মধ্যম ফলারের

"সরু চিড়ে শুকো দই মত্তমান কাঁকা খই
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয়।"

এই সব সত্ত্বেও ইহাকে নাটক বলা যায় না। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্রের বিকাশ এবং রসের তেমন উচ্চ পরিকল্পনা নাই। নাটকীয় ভাষার বদলে সরস কবিতা ও অনুপ্রাসময় গদ্য ছিল। সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী স্ত্রীলোকের ও নিম্নস্তরের লোকদের মুখে চলিত কথা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু নাটকে ক্রিয়া বা হৃদয়ের স্পন্দন নাই। কোন চিত্রই সজীব নয়। যাহা হউক, তাঁহার "কুলীন কুলসর্বস্ব," "নবনাটক," "উভয় সঙ্কট," "চক্ষুদান" প্রভৃতি সংস্কারযুগের দৃশ্য নাটক। তিনি বাংলা নাটকে অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্যগুলিকে গর্ভাঙ্ক নামে অভিহিত করিয়া বিভাগ করিয়াছেন। এখানে তিনি সংস্কৃতের অনুসরণ করেন নাই। সংস্কৃত হিসাবে গর্ভাঙ্কের এরূপ সন্নিবেশ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক হইলেও, তাঁহার প্রবর্তনক্রমে পরবর্তী নাট্য-কারেরা সচ্ছন্দে গর্ভাঙ্কের দ্বারা অঙ্ক বিভাগ করিয়াছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যে গর্ভাঙ্ক ভিন্নরূপে ও ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। রামনারায়ণ প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেরও অনুবাদ করিয়াছেন।

গর্ভাঙ্কের প্রচলন

কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে সংস্কৃত নাটক বাংলায় অনূদিত হইয়া অভিনীত হইত। ইতিপূর্বে কি স্কুল-কলেজে, কি রঙ্গালয়ে সংস্কৃত নাটকের ইংরাজী অনুবাদ ও ইংরাজী নাটকের অভিনয় চলিত। তাহারই প্রতিক্রিয়া—

ইংরাজী নাটকাভিনয়ের প্রতিক্রিয়া

সংস্কৃত নাটক বাংলা ভাষায় অভিনয়। ওরিয়েন্টাল রঙ্গালয়ে যখন বাঙ্গালী কর্তৃক ইংরাজীতে অভিনয় চলিতেছিল, তখন উক্ত স্কুলের কতিপয় ছাত্রের জাতীয় মর্যাদার অভিমানে আঘাত লাগে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী। তাঁহারা দলবদ্ধভাবে স্কুলের কর্তৃপক্ষকে তাঁহাদের মনোগত ভাব জানাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন তাঁহারা কয়েকজন মিলিয়া সঙ্কল্প করিলেন, যে কোনও প্রকারেই হউক তাঁহারা রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া বাংলা নাটকের অভিনয় করিবেন। স্থান নির্বাচন ও সংগ্রহ করিবার ভার পড়িল— কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীর উপর। তিনি যে বাড়ি ঠিক করিলেন তাহার স্বত্বাধিকারী ভাড়ার প্রলোভনেও উহা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। অগত্যা সে প্রস্তাব সেখানেই ক্ষান্ত রহিল।

কেশব গাঙ্গুলীর সুখ্যাতিতে গিরিশের অভিনেতার উচ্চ-আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক

কয়েক বৎসর পরে এই সব ছাত্রেরাই কলেজ ত্যাগ করিয়া বেলগাছিয়া রঙ্গালয় স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রাসাদোপম বেলগাছিয়া উদ্যান পাইকপাড়ার রাজারা খরিদ করিয়াছিলেন। সেই সুবিশাল উদ্যানে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উদ্‌যোগে বাগবাজার-নিবাসী কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহযোগিতায় এক তরুণ সঙ্ঘ গঠিত হয়। পাইকপাড়ার রাজাদের বিপুল ব্যয়ে রঙ্গশালা নির্মিত হইল, সাজসজ্জা আসিল, সুন্দর সুন্দর দৃশ্যপট চিত্রিত হইয়া শোভা বৃদ্ধি করিল এবং সুনিপুণ অভিনেতার দলও

বেলগাছিয়ার অভিনয়

আসিয়া জুটিল। এই তরুণ সম্প্রদায়ে নাটক-রচয়িতৃভাবে যোগ দিলেন নাট্যকার রামনারায়ণ। বেলগাছিয়ায় রত্নাবলীর অভিনয়ের উদ্‌যোগ চলিল। উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারীদের বোধ-সৌকর্যার্থ নাটকের সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ করিতে ইংরাজী রচনায় সুদক্ষ লোকের প্রয়োজন হইল। গৌরদাস বসাক ইংরাজী Captive Lady কাব্যপ্রণেতা মাইকেল মধুসূদনকে আনিলেন। এই বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে আসিয়া মধুসূদনের অতুলনীয় প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল—তাঁহার করস্পর্শে বঙ্গবাণীর বীণায় অপূর্ব ঝঙ্কার দেখা দিল—বাংলা ভাষার শ্রী অদ্ভুত মাধুরী-সুষমায় মণ্ডিত হইয়া—বাঙালীর চিত্তে নূতন সৌন্দর্যকলার বিকাশ করিল, কিশোর যুবক গিরিশের মনেও নবীন-স্বপ্নের নবীন-রেখা আঁকিয়া দিল।

রত্নাবলীর অভিনয়

রামনারায়ণের অনূদিত রত্নাবলী বেলগাছিয়া বাগানে যখন উজ্জ্বল-দীপাবলী-সজ্জিত-রঙ্গমঞ্চে সুচারু-দৃশ্যপটে নানা-ভরণভূষিত-মুক্তা-হীরক-হার-বলয়-শোভিতাঙ্গ সুন্দর পরিচ্ছদধারী সুশিক্ষিত ভদ্র অভিনেতৃ-বৃন্দ কর্তৃক অভিনীত হইল—তখন কলিকাতা নগরে তাহা বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করিবে—ইহা আর আশ্চর্য কি? আবার সেই রঙ্গমঞ্চে যখন প্রতিভার বরপুত্র পাশ্চাত্ত্য-ভাবমণ্ডিত মধুসূদন বাংলার সারস্বতকুঞ্জ নাট্যবীণার পৌরাণিক তানের লহরে মুখরিত করিলেন—তখন বিমুগ্ধ বাঙ্গালীর তন্দ্রাচ্ছন্ন চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত হইল। আবার যখন বাংলা রাগ-রাগিণীতে পাশ্চাত্ত্য গৎ অনুযায়ী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ ঘোষালের নেতৃত্বে স্বদেশী বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতান-বাদন ঝঙ্কৃত হইল, তখন লোকে বিহ্বল চকিত হৃদয়ে তাহা শুনিতে লাগিল। সর্বোপরি

যখন বাংলার ছোট লাট স্বয়ং স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে মধুসূদনের "শ্রেষ্ঠ নট"—তরুণদলের ভারতীয় গ্যারিক—কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের উপর সরস অভিনয়নৈপুণ্যের অজস্র প্রশংসাবাদ বর্ষণ করিলেন—তখন শুধু বাগবাজার কেন, সমগ্র বাংলাদেশ তোলপাড় হইল। গিরিশের স্বীয় পল্লীবাসী কেশববাবুর সম্মান ও অভিনয়-যশোখ্যাতি যে গিরিশের মত তরুণ-যুবার মনকে অভিনয়-বিদ্যায় উচ্চস্থান লাভ করিতে উদ্বুদ্ধ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীকে ছোটলাটের প্রশংসা

উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র এই সকল নাটকাভিনয়ের প্রসঙ্গে তাঁহার নাট্যপ্রবন্ধে বলিয়াছেন, "আমার স্মরণ আছে, বেলগাছিয়ার 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখিয়া এক ব্যক্তি প্রশংসা করিতেছে,—'কি চমৎকার ব্যাপার! রাজার গলায় মুক্তার মালা, পশ্চাতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে শুনিয়া রাজা সাগরিকাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছুটিলেন, একজন রাজভক্ত ভয়ে তো তাঁহাকে বাধা দিল। তিনি বাধা উপেক্ষা করিয়া ছুটিলেন, অমনি মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া গেল, তাহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না।" কাব্যের প্রশংসা নাই, অভিনেতার বক্তৃতায় কিরূপ হৃদয় দ্রব হইয়াছিল—তাহা নাই, কোনও সরস পঙ্ক্তির আবৃত্তি নাই—কেবল মুক্তার মালা, সাজ-সরঞ্জামের প্রশংসা!"

রত্নাবলি অভিনয়ে গিরিশের মতামত

বিংশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা স্ফুরণোন্মুখী ও কর্মজীবনের প্রারম্ভ। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিফল হইলেও তাঁহার হৃদয়ের তীব্র জ্ঞান-পিপাসা। বিশ্বের বিদ্যালয়ে মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করিতে তিনি

কর্মজীবনের আরম্ভ

একাগ্রমনে ব্রতী হইলেন। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল তরুণ সঙ্গীদের তিনি হইলেন নেতা, দীনদরিদ্রের সাহায্যে, প্রবঞ্চকদের উপদ্রব-দমনে এবং শবের সংকারে তাহাদিগকে নিয়োগ করিলেন। নিজেও অদম্য উৎসাহে এই সব কার্যে যোগ দিলেন।

গিরিশের মনে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ

যৌবনের তরুণ প্রভাতে গিরিশচন্দ্রের মন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে পড়িল। একদিকে কবি হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা—কবি ঈশ্বর-গুপ্তের মত সর্বজনসমাদৃত হইবার যশো-লিপ্সা, অপরদিকে কেশব গাঙ্গুলীর ন্যায় অভিনয়-নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষের সমাদর-লাভ ও শিক্ষিত-সমাজে "ভারতীয় গ্যারিক" খ্যাতির উচ্চাশা। একদিকে পিতার পরলোকগমনে বহু প্রতিপোষ্য সংসারে গুরুতর দায়িত্বভার তাঁহার স্কন্ধে আপতিতপ্রায়, অপরদিকে সমাজে পল্লীতে নিরাশ্রয় রুগ্নের পরিচর্যা নাই, দীন গৃহস্থের শবসৎকারের লোক নাই, দরিদ্র রোগীর পথ্য ও ঔষধ নাই—দ্বিপ্রহরে পল্লীর অন্তঃপুরচারিণীদের প্রবঞ্চনাকারী ভণ্ড বাবাজী বা সন্ন্যাসীর দমন নাই—সমাজসেবা ও লোকসেবার ব্যগ্রতায় তরুণ গিরিশ চিন্তাকুল। একদিকে গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক স্বাধীনতাপ্রিয়তা, কোনও কঠিন নিয়মে বা বিধিনিষেধের প্রতিপালনে চিত্তের সহজ বিদ্রোহিতা, অপরদিকে পরিণয়সূত্রে নব-পরিণীতা সহধর্মিণীর প্রেমনিবেদিত হৃদয়ের বন্ধন। এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে গিরিশের চিত্তও দ্বিধা বিভক্ত হইল। পরস্পরবিরোধী ভাবের দ্বন্দ্ব-সমবায়ে গিরিশের মনোবৃত্তি বিকশিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় দশকে এই ভাবের অঙ্কুর দেখা দিল।

গিরিশের জীবন বিধাতা-পুরুষ যেন দুর্ভাগ্যের কঠোর হস্ত দিয়াই গড়িয়াছিলেন; মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই

মাতৃস্তন্য-পানে নিষেধ, শৈশবে স্নেহদানে মাতার উপেক্ষা—কৈশোরে প্রবল মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইয়া তাহার আস্বাদনকালে জননীর মৃত্যু—তৎপরে পিতার অভাব, ভ্রাতা ও ভগ্নীর বিয়োগ এবং অভিভাবক-শূন্যতা, যৌবনোদ্গমে বিবাহ-রাত্রিতে ভীষণ অগ্নিদাহ—আতঙ্কের হাহাকারে আনন্দরোলের পরিণতি, পাঠ্যাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জনে অকৃতিত্ব, লোক-সেবায় "বয়াটে" খ্যাতি, মানবচরিত্র অধ্যয়নে নৈতিক পদস্খলন এবং রস-পিপাসু মন সওদাগরি অফিসের হিসাবরক্ষকের কার্যে নিয়োজিত হইবার পর পদোন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভ।

দুর্ভাগ্যের কঠোর শিক্ষা

গিরিশচন্দ্র বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, কলিকাতায় ও মফঃস্বলে নাট্যশালা ও নাটকাভিনয়ের প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। কলিকাতা সহরেই চারিটি নাট্যশালা—শোভাবাজার রাজবাটীর প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটী—তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও অভিনেতা শোভাবাজারের রাজকুমারেরা, এবং বেলগাছিয়া নাট্যশালার পুরাতন অভিনেতা নট-কুল-তিলক কেশব গাঙ্গুলীর বিশেষ প্রশংসাপ্রাপ্ত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এবং প্রিয়মাধব মল্লিক প্রভৃতি; পাথুরিয়াঘাটার বঙ্গ নাট্যালয়—স্বয়ং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত, যোড়াসাঁকো থিয়েটার—যশস্বী নাট্যকবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ তরুণদের দ্বারা গঠিত ও নাট্যকলায় নব আদর্শ-প্রবর্তিত এবং বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়—সুদক্ষ অভিনেতা চুনীলাল বসুর উদ্‌যোগে স্থাপিত ও সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসুর রচিত নাটকাবলীর অভিনয়ে মুখরিত।

কলিকাতায় থিয়েটারের আন্দোলন

সংস্কার-যুগে বাংলার রাষ্ট্রচেতনার উদ্ভব হয়। প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাথ, রামগোপাল ও কিশোরীচাঁদ-পরিচালিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বাংলায় তরুণ যুবকদের অন্তরে পাশ্চাত্ত্য ধরনের একটা রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও জাতীয় ভাবের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের অগ্নিমূর্তিতে ইংরাজ জাতির অচঞ্চলতা ও দৃঢ়তায় এবং রাজ্যভারগ্রহণ কালে ইংলণ্ডেশ্বরীর স্মরণীয় ঘোষণায় বাংলার জাতীয় আত্মচেতনা সুপ্তোত্থিত হইয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে হিন্দু পেট্রিয়টের ওজস্বিনী রচনাবলী রাজনীতি আলোচনার দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংরাজ সরকারের সূত্রপাতকাল হইতেই বাংলার জমিদারবর্গের ও কৃষককুলের উপর নীলকর সাহেবদের যে অত্যাচার চলিতেছিল তাহা হিন্দু পেট্রিয়ট-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তীব্রভাষায় উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু "নীলদর্পণ" নাটক রচনা করিয়া বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে তুমুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করেন। বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় ও বাংলা সাহিত্যে—এই বৎসর চিরস্মরণীয়—ইহা নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল। এই সময়ে পুরাতন দলের শেষ কবি ঈশ্বরগুপ্তের পরলোকগমন এবং বাংলার কাব্যগগনে মধুসূদনের অভ্যুদয়। ঈশ্বরগুপ্ত ও মধুসূদনের সন্ধিক্ষণে—দীনবন্ধুর আবির্ভাব। এই সময়ে পাশ্চাত্ত্যের আদর্শে মধুসূদন পৌরাণিক, রোমাণ্টিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিলেন এবং ইয়ং বেঙ্গল ও ভণ্ড গোঁড়া হিন্দুর উপর কশাঘাত করিয়া প্রহসন লিখিলেন। দীনবন্ধু "নীলদর্পণ" ব্যতীত "সধবার একাদশী"তে "জামাই বারিকে" ও "বিয়ে পাগ্‌লা

সংস্কার-যুগের রাষ্ট্র-চেতনা ও সংস্কারমূলক সাহিত্যের আবির্ভাব

নাট্যকার দীনবন্ধু

বুড়োতে”—ইয়ং বেঙ্গল এবং হিন্দুর সামাজিক কুপ্রথার আবর্জনা ও ক্ষত দেখাইলেন। “লীলাবতী” ও “নবীন তপস্বিনী”তে কুমারী যুবতীর স্বাধীন প্রেম ও পতি-পত্নী-নির্বাচনের স্বাধীনতা পাশ্চাত্ত্য আদর্শের অনুকরণে তিনি অঙ্কিত করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে “দীনবন্ধু ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটক নভেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে বাঙ্গালা কাব্যে বাংলার সমাজস্থিত নায়ক-নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই।” নাটক রচনায় দীনবন্ধুর তাৎকালীন সংস্কারকের চক্ষু ছিল, তাই ধর্মসম্বন্ধে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের মহত্ত্ব ও লোকচরিত্রের পরিশুদ্ধি-শক্তির মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর আদর্শে এবং জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে সংস্কার-যুগের মধ্যাহ্নে “বিধবা-বিবাহ” “নব নাটক” “শরৎ সরোজিনী” “প্রণয় পরীক্ষা” “সতী নাটক” “কিঞ্চিৎজলযোগ” “এমন কর্ম আর করবো না” “চক্ষুদান” “উভয় সঙ্কট” প্রভৃতি সমাজসংস্কারমূলক নাটক ও প্রহসন রচিত হইতে লাগিল। আবার জাতির আত্মচেতনার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাবোদ্দীপনকারী “পুরুবিক্রম” “সরোজিনী” প্রভৃতি নাটক অভিনীত হওয়ায়—সমগ্র বাংলা দেশে নাটক ও রঙ্গালয়ের তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল। এই সময়ের রঙ্গালয়ের অভিনয়প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন “এখনকার অভিনয় সভ্যভাবে সভ্য কথায় চলিতে লাগিল। রসের উদ্ভব যত হোক বা না হোক সভ্যতাই ইহার প্রশংসা। অভিনেতারা নানা সভ্য নিয়মে বাধ্য, দর্শককে কোনও অভিনেতা পশ্চাৎ দেখাইতে পারিবেন না, ক্রুদ্ধ ভীম রণস্থলে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতেন না, সকলেই সভ্যভাবে চলিবে,

সংস্কারমূলক নাটক ও প্রহসনাদি

তবে মূর্চ্ছা যাবার অধিকার ছিল—তাহাও খুব সংযতরূপে। দৃশ্যপটের বাহার, সাজসরঞ্জামের বাহার, এইরূপে রঙ্গালয় চলিল।”

মহাভারতের অনুবাদক এবং “হুতোমপ্যাঁচার নক্সা” গ্রন্থাদির লেখক সুরসিক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত গিরিশচন্দ্রের সৌহৃদ্য জন্মে। কালীপ্রসন্ন ও গিরিশবাবুর মধ্যে নানাবিধ নাট্যালোচনা হইত। কালীপ্রসন্ন নিজেও একজন নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাগবাজারের বেণীনাথ বসুর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পল্লীর জামাতা বলিয়াই হউক বা অন্য কোন সূত্রেই হউক প্রায় সমবয়স্ক গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ বসু বলেন “একদিন কালীপ্রসন্নের বাগানবাড়ীতে গিরিশ ও কালীপ্রসন্নের সাহিত্যালোচনা হইতে লাগিল। কালীপ্রসন্নের সূর্যাস্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কালীপ্রসন্ন বলিলেন ‘এস, এই সূর্যাস্ত উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের সঙ্গীত রচনা করা যাক। দেখি কাহার রচনা ভাল হয়।’ গিরিশচন্দ্র অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিম্নলিখিত সঙ্গীত রচনা করিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ও গিরিশ

সিত, পীত, লোহিত, হরিত
মেঘমালা গগন ভূষিত
স্বর্ণ-কিরণ লোহিত তপন,
নাবিল নাবিল ডুবিল সাগরে।

কালীপ্রসন্ন গিরিশের দ্রুত সঙ্গীতরচনার শক্তি দেখিয়া বিস্মিত

হইলেন।" এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের গীত-রচনায় প্রথম প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সর্বপ্রথম গীত—

"সুখ কি সতত হয় প্রণয় হ'লে।
সুখ অনুগামী দুখ, গোলাপে কণ্টক মিলে।"

গিরিশের হাফ আখড়াইয়ের সঙ্গীত

যৌবনে গিরিশবাবু হাফ আখড়াইয়ের আসরে গান বাঁধিয়া অনেককে মুগ্ধ করেন। সুপ্রসিদ্ধ গিরিশ-জীবনী-লেখক অবিনাশবাবু তাহার দুই একটি গান উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গিরিশ একবার বিপক্ষের উপর চাপান দিয়া গান বাঁধেন,

"কুমুদিনী মোদিনী বিলাইয়ে প্রাণ,
কহে অনিল আসি কলি সম্ভাষি
প্রেয়সি, খোল লো বয়ান।"

বিপক্ষ দল চাপানের উত্তর দিতে অসমর্থ হইলে গিরিশ নিজেই উত্তর দিলেন,

"রাসরসমাধুরী করি সখি পান।"

গিরিশচন্দ্রের অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ

এই গীতটির অন্য কলি সংগৃহীত হয় নাই। যৌবনে তাঁহার মাতুল নবীনকৃষ্ণের উত্তেজনায়ই হউক কিংবা বাল্যসঙ্গী ব্রজ-বিহারী সোমের উপদেশেই হউক তিনি গ্রন্থ-অধ্যয়নে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি এই বয়সে মাতৃভাষায় তদানীন্তন গদ্যসাহিত্য ও প্রাচীন কবিদিগের রচনাবলী, বিশেষতঃ মহাকবি কাশীরাম ও কৃত্তিবাস বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতেন।

বৃদ্ধ বয়সেও অনর্গল তাঁহাকে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আবার পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যেও তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। পাশ্চাত্ত্য ভাষার কাব্যে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। আজীবন তিনি অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকিতেন—কিন্তু এই সময়ে তাঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা অত্যন্ত প্রখরভাবে উদ্দীপিত হয়। গিরিশ যখন যে কাজে মন দিতেন ষোল আনাই তাহাতে আত্মনিয়োগ করিতেন, আধাআধি ভাবে কোনও কাজে হাত দিতেন না। লোকচরিত্র অধ্যয়নে ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে তিনি জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থীর ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতেন।

গিরিশের লোকচরিত্র অধ্যয়ন ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ

ইহাতে মান অপমান, যশ অপযশ, নিন্দা প্রশংসা এমন কি চরিত্রের নৈতিক অধঃ-পতনেও তিনি দৃক্‌পাত করিতেন না। নৈতিক অধঃপতনের স্তরবিভাগে মানুষের মানসিক অবস্থার বিপর্যয়, মনোবেগ এবং ভাষা ও দৃষ্টি কিরূপ হয় তাহাও তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার জন্য গিরিশের প্রবল পিপাসা ছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে এইরূপ অবস্থায় নিজদেহে কঠিন জঘন্য রোগের আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। এমন কি সেই অবস্থায় কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মনের ও শরীরের সঙ্গে চিন্তা ও কার্যের ধারা কি ভাবে প্রবাহিত হয় তাহার অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার বাহ্য আকার উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈতিক অধঃপতনের চরমাবস্থা। যে মনোবৃত্তিতে পাশ্চাত্ত্য জগতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু নিজের শরীরে কঠোর যন্ত্রণায় কঠিন ব্যাধির বীজাণু লইয়া তাহার প্রতিষেধক দ্রব্যগুণের পরীক্ষায় তীব্র বিষ প্রয়োগ করিতে সঙ্কুচিত হন না, সেই মনোবৃত্তি

লইয়াই সমাজের অধস্তন স্তরের লোকের সহিত মিশিতে গিরিশ কুণ্ঠিত হন নাই কিংবা যে কোনও ক্লেশ নিজদেহে গ্রহণ করিতে ভীত বা সন্ত্রস্ত হন নাই। তিনি বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া লোকচরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। এইরূপ অনাসক্ত জ্ঞানলিপ্সু মন থাকাতেই গিরিশ ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সেই অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—ইহার প্রমাণ তাঁহার ভাবী আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ভাবময় জীবন। উত্তরকালে আমার সহিত এই সব প্রসঙ্গ হইলে তিনি বলিতেন "জ্ঞানার্জনে ইহা অতি কণ্টকাকীর্ণ পথ। সমুদ্রমন্থনে যে হলাহল উৎপন্ন হইয়াছিল—তাহা স্বয়ং একমাত্র নীলকণ্ঠ কণ্ঠদেশে ধারণ করিতে সমর্থ, আমার মত কীটানুকীট মানুষ কোন ছার। যদি অহৈতুকী গুরুকৃপা লাভ না করিতাম, তবে আমার অবস্থা কি হইত স্মরণ করিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়।"

অহৈতুকী গুরুকৃপা

গিরিশচন্দ্র তাঁহার অভিনয় ও অভিনেতার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "অভিনয়ের পন্থা কঠোর—কুসুমাবৃত নহে। নটের কণ্ঠস্বর লইয়া কাজ। অতএব যে কার্যে কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়—তাহা বিষবৎ পরিহার্য। অন্তর্দৃষ্টি করিতে হইলে অন্তর্বৃত্তিসকল তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে দৃষ্টিতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটে। এই বিশ্লেষণকার্যে মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা বুঝিয়া—আপনার মনোবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিলে কার্যের বিশেষ সহায়তা হয়।"

অভিনয় ও অভিনেতার শিক্ষা

গিরিশচন্দ্র এইরূপ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝিয়াছিলেন যে, "কেবল হস্ত ও মস্তক-সঞ্চালনই হাবভাব নহে। সৈনিক পুরুষ কথা

কহিতেছে কিন্তু কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে তরবারিমুখে ব্যূহ রচনা করিতেছে; মালিনী কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলিভঙ্গীতে মালা গাঁথে; কেরানী কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে অঙ্গুলি দিয়া কি লেখে; প্রেমিক মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে,—সুন্দর বস্তু দেখিয়া অন্যমনা হয়; বেদিয়া চলিতে চলিতে ডিগবাজী খায়; গায়ক শিষ দেয়; বাজিয়ে অঙ্গ বাজায়। এই সকলের প্রতি অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

লোকচরিত্রে গিরিশের অন্তদৃষ্টি

কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া কল্পনা-রাজ্যে দর্শককে আনা তাহার কার্য। সেই কার্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যানানুসারে অভ্যাস, তৃতীয় সজ্জা। তৃতীয় হইলেও সজ্জার স্থান সামান্য নয়। তিনি অভিনয় করিতে না পারিলেও যদি তিনি ভূমিকানুসারে ঠিক সাজিতে পারেন তাহাতেও ভূরি ভূরি প্রশংসা-ভাজন হইবেন।"

গিরিশ বুঝিলেন যে "নটের স্বভাবপ্রদত্ত আকার ও স্বর থাকা চাই এবং তাহার উপর চাই শিক্ষা।" কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। আন্তরিক ও বাহ্য সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য হয় না—যে ভূমিকা অভিনয় করিবে তাহা নট বুঝিতে পারে না। গিরিশচন্দ্র এই সূক্ষ্মদৃষ্টি লইয়া লোকচরিত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক অবস্থায় মনের প্রত্যেক স্তর-বিশ্লেষণে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন ও আজীবন তাহাই করিয়াছেন। তিনি অনুভূতিবলে বুঝিয়াছিলেন যে নটের উচ্চ কল্পনা থাকা চাই।

নটের স্বর, আকার, শিক্ষা ও অভ্যাস

তিনি বলিয়াছেন, "নাটকের চরিত্র লইয়া নট তচ্চরিত্র-প্রস্ফুটনে কিরূপ পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে উপযুক্ত হইবে ও শিল্পদ্বারা নিজ অবয়বে কিরূপ পরিবর্তনই বা আবশ্যক তাহা দর্পণসাহায্যে স্থির করিবেন। শুধু চরিত্র-সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা করিলে চলিবে না, স্বেচ্ছানুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদায় অবয়ব চালিত হওয়া চাই।" গিরিশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে সার হেনরী আরভিং-এর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাঁহার নাট্যপ্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন "ভারতের সীমান্তযুদ্ধে (চিত্রল সমর) আরভিং দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিরূপে গুলির আঘাতে সতেজ সৈনিক মৃত হইয়া পড়ে। তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও সে সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই; তাঁহাকে অভ্যাস করিতে হইয়াছিল রক্তোৎফুল্ল বীরের মদোজ্জ্বল মুখমণ্ডল কি প্রকারে সহসা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় ও তাহাতে মৃত্যুর ছায়া পতিত হয়। দেহের উপর এরূপ আধিপত্য-লাভ অল্প অভ্যাসের কার্য নহে। এই শিক্ষা লাভ করিয়া সার হেনরী আরভিং ফরাসী মন্ত্রী 'রিশলু' অভিনয়ে রাজার সম্মুখে নিজ মৃত্যু যেন আসন্ন দেখাইতেন। কিন্তু রাজা 'রিশলু'কে মার্জনা করিয়া চলিয়া যাইবার পরেই শত্রুদমনোৎসুক আরভিং-রিশলু ভীষণ মূর্তিতে দণ্ডায়মান হইতেন। সুতরাং কল্পিত চরিত্রের সহিত আপনাকে মিলাইয়া ধ্যান করা—চরিত্রের অনুরূপ কথা কওয়া, তাহার হাবভাব আনা—নটের অতি কঠোর সাধনা।" যে নটের এই সব ধ্যান-ধারণা শিক্ষা নাই, যে নটের লোকচরিত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি নাই, বিচারবুদ্ধি নাই, অন্তর্বৃত্তিসকল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করিবার শক্তি নাই তাহার অভিনয় করা বিড়ম্বনা।

নাটকীয় চরিত্রে নট

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা

আরভিং-এর শিক্ষা, অভ্যাস ও অভিনয়

সুন্দর আবৃত্তি করিলেই যে সুনট হইবে এমন নহে। শ্রোতৃবর্গের প্রতিও নটের নজর রাখা দরকার। গিরিশচন্দ্র বলেন "অনেক সময়ে নাটক প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্ত, নট কৌশল করিয়া নাটকীয় কথার এরূপ বিকৃতভাবে উচ্চারণ করেন যে তাহা শ্রোতার কানে লাগে। যে অংশটি ঐরূপ বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় তাহার প্রতি দর্শকের লক্ষ্য পড়ে। দর্শককে এইরূপ আকর্ষণ করিতে না পারিলে নটের কার্য সম্পন্ন হয় না। যেখানে নাটকের কোন পঙ্‌ক্তিতে একটি বিশেষ ভাব আছে, সেখানে সেই ভাবটি দর্শক যদি লক্ষ্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে নট অভিনয়ে যে প্রণালীতে চলিতেছেন তাহা দর্শক বুঝিতে পারিবেন না।" নাটকীয় চরিত্রের ভাষ্যকার—নট এমন কি নাট্যকার—যাহা কল্পনা করেন নাই, সুনট তাঁহার কল্পনাযোগে তাহা দেখান। গিরিশচন্দ্র তাঁহার "অভিনয় ও অভিনেতা" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, "নাট্যকার যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, নট তাহা অনন্যমনা হইয়া চিন্তা করেন। সে চরিত্র যদি স্বয়ং নাট্যকার তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন তথাপি নটের চিন্তা ফুরায় না। নাট্যকার যে ভাবাপন্ন হইয়া নাটক লিখিয়াছিলেন, নাটকীয় চরিত্র বুঝাইবার কালে তিনি সে ভাবাপন্ন নহেন, কিন্তু নটকে চিন্তাযোগে সেই ভাবাপন্ন হইতে হইবে। অনেক সময়ে নটকর্তৃক নাটকীয় চরিত্রের অনুভূতিতে (conception) নাট্যকারকে চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—ভিক্টার হিউগো একখানি নাটক লিখেন। যে রঙ্গালয়ে ইহার অভিনয় হইবার কথা হইতেছিল, তাহার

সুন্দর আবৃত্তিই সুনটের কাজ নহে

সুনট ও নাট্যকার

প্রধান অভিনেত্রীর মতে নাটকখানি ভাল হয় নাই, কিন্তু তথাপি নাটকের মহলা (rehearsal) চলিতে লাগিল। উক্ত অভিনেত্রীর ভূমিকা (part) ব্যতীত সকল ভূমিকাই উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। অভিনেত্রী ভাবিল যে নাটকের তো কেহ নিন্দা করিবে না, আমিই নিন্দাভাজন হইব। তখন সে অভিনেত্রী নিজের ভূমিকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিল। তাহার অভিনয় দেখিয়া ভিক্‌টার হিউগো চমৎকৃত। তিনি দেখিলেন যে সে চরিত্রসম্বন্ধে অভিনেত্রীর কল্পনা এত উচ্চ যে তিনি স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।—'সধবার একদশীতে' 'জীবনচন্দ্রে'র অভিনয়দর্শনে প্রতিভাবান্ নাটককার দীনবন্ধু মিত্র তদভিনেতা অর্ধেন্দুকে 'আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন উহা improvment on the author' বলিয়া যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ভিক্‌টার হিউগো কর্তৃক উক্ত অভিনেত্রীর প্রশংসার অনুরূপ।" "চন্দ্রগুপ্তে" 'চাণক্যে'র অভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের পুত্র নটশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে এইরূপ বিস্মিত করিয়াছিলেন। যশস্বী সুনটের দ্বারা কোনও ভূমিকা সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইলেও কল্পনাসহায়ে সুদক্ষ অভিনেতা তাহা ভিন্ন ভাবে অভিনয় করিয়া অধিকতর বা সমভাবে সুখ্যাতি অর্জন করিতে পারেন। গিরিশ বলেন "দাবা খেলোয়াড়েরা বলিয়া থাকেন—ভাবিলেই চাল বাহির হয়। আমরা নট, আমাদের কার্যও সেইরূপ—ভাবিলেই চাল বাহির হয়।" ম্যাকবেথ-পত্নীর অভিনয়ে দীর্ঘকায়া কুমারী সিডন্‌স্ চরিত্রের যে ভীষণতা দেখাইয়াছিলেন তাহাতে পাশ্চাত্ত্য জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল, সকলেই

অভিনয়ে অভিনেতার ব্যাখ্যার বৈচিত্র্য

এমন কি হ্যাজলিটের মত কঠোর সমালোচক তা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। আবার সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী সারা-বার্ণহার্ট ম্যাকবেথ-পত্নীর অভিনয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দিলেন। সারার অভিনয়ে ম্যাকবেথ-পত্নীর প্রেমিকার রূপই উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ম্যাকবেথ-পত্নী যেন স্বামিপ্রেমবিহ্বলা স্বামীর "উচ্চপদাকাঙ্ক্ষিণী" এবং স্বামীর স্বার্থে আত্মত্যাগিনী! সারা—ম্যাকবেথ-পত্নী—কখনও অনুতাপদগ্ধ স্বামীকে সান্ত্বনা দিতেছেন, কখনও স্বামীকে উত্তেজিত ও আশ্বাসিত করিতেছেন, আবার কখনও স্বামীকে সযত্নে প্রেমকম্পিতহস্তে শয্যায় লইয়া যাইতেছেন। স্বামীর চিন্তায় সারা—ম্যাকবেথ-পত্নী—যেন উন্মাদিনী। দুইটি কল্পনাই মনোরম। নট কবির মত কল্পনার সহচর।

নট ও কবি কল্পনার সহচর

প্রত্যক্ষদর্শী গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন অভিনয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কল্পনায় বিকাশ করিতে হইবে। তিনি নাট্যসাধনায় উপলব্ধি করিলেন যে, "ঠিক তন্ময় হইলে অভিনয় হয় না।" "নট মনকে যেন দুইখণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—একখণ্ডে মন নিজভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ডে সাক্ষিস্বরূপ দেখে যে

অভিনয়ে মনের দুই ভাগ

তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কি না, নাটকের কথা ভুল হইতেছে কি না, সহযোগী-অভিনেতা (co-actor) ঠিক বলিতেছে কি না, যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কি না, রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছেন কি না। এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিদ্যাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশ সাক্ষিস্বরূপ থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ—তন্ময় অংশই অধিক।"

গিরিশচন্দ্র অভিনয়সম্বন্ধে এই সব তত্ত্ব আলোচনা করিয়া স্বীয় জীবনে তাহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন।

গিরিশচন্দ্রের ভিতর যে অসাধারণ বিরাট রসলিপ্সু মন ছিল আফিসের কাজে নীরস কঠোর কর্তব্যসাধনে তাহা কখনও বিমুখ হয় নাই। চাকরিজীবনে যেমন তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা, সতর্কদৃষ্টি ও কর্তব্য-পরায়ণতা ছিল তেমনি আবার স্বাধীনতা-প্রিয়তাও ছিল। আফিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পর সায়ংকালে মেঘবর্ষার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িল আফিসের ছাদে সাহেবেরা নীল শুকাইতে দিয়াছেন, তিনি সেই মুহূর্তে আফিসে গিয়া কুলীমজুর লাগাইয়া তাহা গুদামজাত করিলেন। ইহাতে তাঁহার মনিবের অনেক ক্ষতি বাঁচিয়া গেল। সাহেব তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ পুরস্কার দিলেন। আবার ছোট সাহেব ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহাকে ডাকাতে তিনি স্থির ভাবে তাঁহার স্বীয় আসনে বসিয়া রহিলেন—আফিসের সকল কর্মচারী তাঁহাকে অনুরোধ করিলেও তিনি একপদও নড়িলেন না। অবশেষে বড় সাহেব তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিলে তিনি নম্র অথচ সতেজভাবে বলিলেন, "আমি ঘণ্টার ধ্বনিতে উঠিতে বসিতে অভ্যস্ত নই।" তদবধি আফিসে কোন কর্মচারীকে ঘণ্টা দিয়া ডাকা বড় সাহেব তুলিয়া দিলেন। এই আফিসের কাজেই গিরিশচন্দ্র সুবিখ্যাতা মিসেস লুইসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এই পরিচয় পরে বন্ধুত্বে দাঁড়াইয়াছিল। মিসেস লুইস প্রায়ই গিরিশচন্দ্রকে

গিরিশচন্দ্রের কর্ম-জীবনে মার্কিন অভি-নেত্রীর সহায়তা

চাকরিজীবনে কর্তব্য-নিষ্ঠা ও স্বাধীনতা

গিরিশের মার্কিন অভিনেত্রীর সহিত বন্ধুত্ব ও অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা

তাঁহার Lewis's Theatre Royalএ লইয়া যাইতেন এবং দুইজনের মধ্যে স্বাধীনভাবে অভিনয়সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চলিত। ইহাতে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়সম্বন্ধে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার পরিসর আরও বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার ভাবী অভিনেতা-জীবনে ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাওয়া যায় "সধবার একাদশী"র অভিনয়ে 'নিমে দত্তে'র ভূমিকায়।

গিরিশের গন্তব্যপথে বিজয়াভিযান

গিরিশের যে মন সাহিত্য-মধুচক্রের মধুপানে বিভোর ছিল, যে মন মানস জগতের ঘটনানিচয় বিশ্লেষণ করিয়া তত্ত্ব আহরণে নিরত ছিল, যে মন কল্পনার বিরাট সৃষ্টি ও মনোহর সৌন্দর্যধ্যানে নিমগ্ন হইত—সেই মন আবার সওদাগরী আফিসের হিসাব-নিকাশে, ত্রুটীহীন কর্তব্যকার্যের পরিচালনে ও প্রভুর তুষ্টি-সম্পাদনে নিযুক্ত হইল। ইহাও অদ্ভুত মনঃশক্তির বিকাশ। কল্পনা ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষেই তাঁহার সুপ্ত অন্তর-মানুষটি সজাগ হইয়া ভাব-রাজ্যের বিশালবক্ষে বিচরণ করিতে শিখিয়াছিল, সারস্বতকুঞ্জের সরসকুসুমোত্থানে মধুপঝঙ্কারে আপনার অন্তর্বীণায় তান মিশাইয়া ছন্দে ছন্দে শব্দসম্পদের মাধুর্যে স্বপ্নলোকের আলোকরেখায় উদ্ভাসিত হইতেছিল এবং অপার অনন্ত চিত্তবারিধির চক্রায়িত তরঙ্গভঙ্গে অসীম বেলাভূমির অস্পষ্ট ছায়াবিস্তারে অপূর্ব পুলকসঞ্চারে গভীর আনন্দে আত্মহারা হইত। যৌবনসীমা উত্তীর্ণ হইলে আলোক-অন্ধকারে এই অপ্রতিহত-গতিসম্পন্ন মন জীবনের দ্বন্দ্বসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যসমাচ্ছন্ন দুর্গম সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া সেই দুর্যোগে আপনার গন্তব্যপথ চিনিয়া লইয়া বিজয়াভিযানে অগ্রসর হইল।

লোকচরিত্র অধ্যয়ন এবং মানস জগতের অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়

করিতে গিরিশের যেমন তৃষ্ণা ছিল, তেমনি প্রবল পিপাসা ছিল স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে। সুপণ্ডিত মাতুল নবীনকৃষ্ণের তর্কালোচনার উত্তেজনাবশতঃই হউক কিংবা তাঁহারা প্রায় সমবয়স্ক সঙ্গী ব্রজবিনোদ সোমের তিরস্কার বা ভর্ৎসনাতেই হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া গিরিশ একাগ্রমনে নানা গ্রন্থপাঠে নিরত ছিলেন। জীবনের কোন সময়েই বাণীর এই চিহ্নিত পুত্রটি গতানুগতিক শিক্ষায় আকৃষ্ট ছিলেন না. অথচ ইংরাজী সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস এমন কি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পর্যন্ত তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আবার আমাদের দেশীয় কাব্য, পুরাণ ও সাহিত্য প্রভৃতিতে তাঁহার অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার নিকট বসিয়া আমি কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মুখে কতদিন নানা গ্রন্থ হইতে সুন্দর আবৃত্তি শুনিয়াছি। কাশীরাম, কৃত্তিবাস এবং সেক্সপীয়র, মিলটন ও বায়রন তাঁহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। তাঁহার এরূপ তীব্র জ্ঞানপিপাসা ছিল যে তিনি প্রৌঢ় বয়সে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের; প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভায় বিজ্ঞান-শিক্ষা ও আলোচনার জন্য যাইতেন। ইহাতে ডাক্তার সরকারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ প্রীতিসম্বন্ধ জন্মিয়াছিল।

গিরিশের জ্ঞানতৃষ্ণা ও গভীর পাণ্ডিত্য

শোকে গণিত আলোচনা

স্ত্রী বা পুত্রশোকে মনকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য তিনি গণিতের আলোচনা করিতেন ও জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি প্রভৃতির সমস্যা-সমাধানে নিরত থাকিতেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্রের নিকট শুনিয়াছি যে একদিন তিনি উপস্থিত হইয়া দেখেন গিরিশ

একাগ্রমনে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়িতেছেন। পাঠে তখন তিনি এত গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন যে সারদাবাবুর উপস্থিতি তিনি জানিতে পারেন নাই। পরে তাঁহাকে দেখিয়া গিরিশ প্রশ্ন করেন, "আপনি কখন এসেছেন?" গিরিশ ইংরাজী দর্শন ও জড়-বিজ্ঞানের আলোচনায় এক সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান ও ধর্মবিষয়ে উপেক্ষাকারী ছিলেন। তিনি "পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "সে সময়ে জড়বাদী প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা এক প্রকার মূর্খতা ও হৃদয়-দৌর্বল্যের পরিচয়, সুতরাং সমবয়স্কের নিকট একজন কৃষ্ণ বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া ঈশ্বর নাই' এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত। আস্তিককে উপহাস করিতাম, এবং এ-পাত ও-পাত বিজ্ঞান উল্টাইয়া স্থির করা হইল যে, ধর্ম কেবল সংসাররক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়।"

পাঠে তন্ময়তা

জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় গিরিশের নাস্তিকতা

বেলগাছিয়া নাট্যশালার পর বাংলার তরুণ সম্প্রদায় নিজ নিজ পল্লীতে অস্থায়ী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছিল। বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রামদাস সেন মহাশয় "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" লিখিয়াছিলেন—

বাংলায় নাটক রচনা ও অভিনয়ের প্রবল আন্দোলন

"আহা কি আহ্লাদ!

পয়ার।

নিত্য নিত্য শুন্‌তে পাই অভিনয় নাম।
অভিনয়ে পূর্ণ হ'লো কলিকাতা ধাম॥

হায় কি সুখের দিন হইল প্রকাশ।
দুখের হইল অন্ত সুখ বার মাস॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয় সভ্যতা সোপান।
দিন দিন বৃদ্ধি হৈল বাঙ্গলার মান॥
হায় কি সুখের দিন হইল উদয়।
এদেশে প্রচার হলো নাট্য অভিনয়॥"

নাট্যাভিনয়ে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী অভিজাত সম্প্রদায়ের যোগদান

এই সময়ে মুরলীধর সেনের নেতৃত্বে মেট্রোপলিটান কালেজে "বিধবাবিবাহ" নাটক অভিনীত হয়। আচার্য কেশবচন্দ্র সেন এই নাটকাভিনয়ে রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ ছিলেন। ধর্মপ্রচারক বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই নাটকে একটি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে-অবতীর্ণ হন। মিঃ হলবেন (Holbein) সাহেব দৃশ্যপটগুলি অঙ্কিত করিয়া দেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অগ্রণী বিদ্যাসাগর মহাশয় একাধিকবার ইহার অভিনয় দেখিতে যান। ইহার পর গোপীমোহন ঠাকুরের পুরাতন বাড়ীর দোতলার নাচঘরে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়—সেখানে রামনারায়ণের মালবিকাগ্নিমিত্র বাংলায় অনূদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক "বিদ্যাসুন্দরে"র অশ্লীলতা অংশ বর্জ্জিত হইয়া নাটকাকারে রূপান্তরিত ও অভিনীত হয়। এই সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের সভাপতিত্বে শোভাবাজার রাজবাটীতে এক নাট্যসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের উদ্‌যোগে মাইকেল মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "কৃষ্ণকুমারী" নাটক অভিনীত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাদের অভিনয় দেখিয়া উচ্চ প্রশংসার সহিত সুখ্যাতি করেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে "নব নাটক" অভিনীত হয়। কিন্তু দুই বৎসর পরে তাহাও উঠিয়া গেল। এই সকল নাটক ও নাট্যশালা দেখিয়া মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা এবং তরুণ যুবকের দল মফঃস্বলে ও কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে সখের থিয়েটার ও সখের যাত্রা প্রতিষ্ঠা করেন।

বসুপাড়ার সখের যাত্রায় গিরিশের সঙ্গীত-রচনা

গিরিশচন্দ্রের স্বীয় পল্লীতে একটি সখের যাত্রা-সম্প্রদায় ছিল। তাঁহার বন্ধুবান্ধব এবং ঘনিষ্ঠ পরিচিত তরুণদল ইহার প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। গিরিশচন্দ্র প্রায়ই সেখানে যাইতেন। প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয়ের নিকট অনেক হাঁটাহাটি করিয়াও যখন এই সম্প্রদায় "শর্মিষ্ঠা" পালার জন্য একখানি গানও আদায় করিতে পারিলেন না, তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়িলেন—তখন আর গিরিশ আত্মগোপন রাখিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এত কষ্ট কেন? এস আমরা গান বাঁধি।" তখনকার প্রথা ছিল ওস্তাদ সুর নির্দেশ করিয়া দিতেন—রচয়িতা গান বাঁধিতেন। ওস্তাদ হিঙ্গুল খাঁর সুরনির্দেশে গিরিশচন্দ্র গান বাঁধিয়া দিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার পূর্বে গিরিশচন্দ্র নিজে নিজে গীত-রচনায় অভ্যাস করিতেন। ইহাই নাকি তাঁহার রচিত সর্বপ্রথম সঙ্গীত—

"সুখ কি সতত হয় প্রণয় হ'লে।
সুখ অনুগামী দুখ গোলাপে কণ্টক মিলে॥
শশি-প্রেমে কুমুদিনী প্রমোদিনী উন্মাদিনী
তথাপি সে একাকিনী, কত নিশি ভাসে জলে॥"

কলিকাতার টাউনহলে গিরিশ-শোকসভায় সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, গিরিশচন্দ্র বাল্যকালে যে সব সঙ্গীত রচনা করিতেন শুধু তাহাই মুদ্রিত হইলে যে কেহ একজন বিখ্যাত কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত। প্রমাণস্বরূপ তিনি নিম্নলিখিত গানটির উল্লেখ করিয়াছিলেন—

গিরিশের বাল্যরচনায় অমৃত বসু

"কথায় যদিও কিছু বল'নি কখন,—
কখনো কি কোন কথা বলেনি তব নয়ন ?
যে কথা ব'লেছে আঁখি, ভুলিয়ে গিয়েছ নাকি
ইসাদি আছে হৃদয়ে, শুধালে হবে স্মরণ ॥"

এইখানে "ইসাদি" শব্দপ্রয়োগে গিরিশের প্রগাঢ় ভাবুকতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত দুটি গীতই নিধুবাবুর ভাবে প্রভাবান্বিত।

কিন্তু "শর্মিষ্ঠা" পালার গানের বাঁধনদার হিসাবে গিরিশ-চন্দ্রের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যাত্রার গীত রচনা করিতে বাংলা সাহিত্যের আসরে গিরিশের সর্বপ্রথম আবির্ভাব। "শর্মিষ্ঠা"র—

শর্মিষ্ঠার গান

"আহা মরি ! মরি !
অনুপম ছবি মায়া কি মানবী
ছলনা বুঝি করেন বনদেবী !

রঞ্জিত রোদনে বদন অমল
নয়ন-কমল নীরে ঢল ঢল,
নিতম্বচুম্বিত বেণী আলুলিত
বিমোহিতচিত হেরি মাধুরী!

কবিত্বের ইহা এক সুন্দর আলেখ্য! সঙ্গীতের রসমাধুর্য অপেক্ষা কবিত্বসৌন্দর্যই ইহাতে অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়াছে। গিরিশের সম্পূর্ণ মৌলিক প্রতিভায় ইহা দীপ্ত।

বাগবাজার রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা ও নটশ্রেষ্ঠ অর্দ্ধেন্দুশেখর

ইহার পর বাগবাজারের তরুণ সম্প্রদায় রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া অভিনয় করিবার উদ্‌যোগ করিলেন। তাঁহারা গিরিশচন্দ্রের পরামর্শানুসারে দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী" অভিনয় করিতে আয়োজন করিলেন। এই নাটকখানি নির্বাচন করিবার প্রধান কারণ, ইহাতে সাজসজ্জা দৃশ্যপটের ব্যয়বাহুল্য নাই। গিরিশচন্দ্রকে এই সম্প্রদায়ের কর্ণধার হইতে হইল। সুপ্রসিদ্ধ নট অর্দ্ধেন্দুশেখরও এই সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন। পল্লীর বালক বলিয়া গিরিশ ইঁহাকে পূর্বেই চিনিতেন এবং বয়সেও ইনি গিরিশচন্দ্রের অপেক্ষা ছয় বছরের ছোট ছিলেন। কয়লাহাটার থিয়েটারের "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনে ইঁহার অসাধারণ অভিনয়-সুখ্যাতি পূর্বেই ছিল। যাহা হউক, গিরিশ-চন্দ্রের এই সম্প্রদায়ের উপর অখণ্ড প্রভাবের কারণ—তাঁহার

সধবার একাদশীতে নিমে দত্ত

পাণ্ডিত্য, চরিত্রানুযায়ী অভিনয়সম্বন্ধে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি, পরিচালন-ক্ষমতা এবং রচনা-শক্তি। এতগুলি গুণ একাধারে তাঁহার তরুণ বন্ধুদের মধ্যে আর কাহারও ছিল না। "নিমে দত্তে"র মত

কঠিন ভূমিকা অভিনয় করিবার যোগ্য লোক না থাকাতে অগত্যা গিরিশকেই উক্ত "নিমে দত্তে"র ভূমিকা লইতে হইল। বাংলার রঙ্গাভিনয়ে "নিমে দত্তে"র ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের সর্বপ্রথম আবির্ভাব। তাঁহার অদ্ভুত অভিনয়নৈপুণ্যে সকলেই চমৎকৃত, বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গুণানুবাদ করিয়াছে। "নিমে দত্তে"র অভিনয় দেখিয়া স্বয়ং নাট্যকার দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি না থাকিলে এ নাটক অভিনয় হইত না। নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা হইয়াছিল।" পরলোকগত হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ বাংলা সাহিত্য-সেবী সুপণ্ডিত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বৃদ্ধকালে সেই অভিনয়ের কথা স্মরণ করিয়া নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন, "বয়োবৃদ্ধিবশতঃ ক্রমশঃ অনেক জিনিষ ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব, ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নাম মাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রের 'নিমচাঁদে'র অভিনয় বোধ হয় কখনও ভুলিব না। সেই রাত্রি হইতে দীনবন্ধুর উপর শ্রদ্ধাভক্তি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইল। অভিনয়নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল।" সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহার বাল্যকালের সতীর্থ অর্দ্ধেন্দুশেখরের মুখে গিরিশচন্দ্রের "নিমে দত্তে"র অভিনয়-সুখ্যাতি শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহাদের জিমন্যাস্টিক দলের অভিনয়ের জন্য একখানি প্রহসন লিখাইতে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের নিকট গিয়াছিলেন। সে সময়ে সখের যাত্রার পালা-রচনায় গিরিশের খুব সুখ্যাতি—লোকে তাঁহার রচনার প্রশংসা করিত।

নিমে দত্তের ভূমিকায় গিরিশের অদ্ভুত অভিনয়-নৈপুণ্য

অমৃতলালের ধারণা, গিরিশের পাকা হাতে প্রহসনটি রচিত হইলে তাঁহাদের দলের গৌরব বাড়িবে। অমৃতলাল "পুরাতন প্রসঙ্গে" তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "এক রবিবার আমি একাকী গিরিশবাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। গিরিশবাবু বলিলেন, 'তুমি কেগা? তোমার নাম কি? উত্তর হইল, 'আজ্ঞে, আমার নাম অমৃতলাল বসু, আমি কৈলাশচন্দ্র বসুর ছেলে।' 'ও: বুঝেছি, বোসো; তুমি কি করছ?' 'সম্প্রতি আমি এণ্ট্রান্স দিয়েছি; আপনার কাছে এসেছি একটু কাজে; আমরা acrobatic performance করচি; একটী farce যদি আপনি লিখে দেন তা হ'লে বড়ই ভাল হয়।' 'তোমাদের কি রকম ফার্স দরকার তা তো আমি জানি না। ফার্স যদি তোমরা ক'রে থাক, আর একদিন সেই খানা নিয়ে আমার কাছে এস।' কিছুদিন পরে একখানা বই লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি বইখানা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'এখানা কে করেছে?' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে, আমি।' 'তুমি ত মন্দ করনি; তুমিই লেখ না—আমি দেখে দেবো।' তাঁহার মুখে সেক্সপীয়র আবৃত্তি শুনিতাম,—তাঁহার সে grand voice আপনারা শুনিতে পান নাই,—'সধবার একাদশী'ও তিনি আবৃত্তি করিতেন।"—গিরিশচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা ও মনীষায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রথম মধুর সম্ভাষণে অভিভূত হইয়া অমৃতলাল "নতমস্তকে শ্রদ্ধাপুর্ণ হৃদয়ে" তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না।

গিরিশ ও অমৃত বসু

দেশবিশ্রুত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের ভ্রাতা সুবিখ্যাত প্রাচীন অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের যৌবনের সঙ্গী নাট্যাচার্য

রাধামাধব কর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলেন, "তখন বোস-পাড়ার একটা সখের যাত্রার দল ছিল; 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয় করিয়া তাহারা বেশ সুখ্যাতি অর্জন করিল। গিরিশবাবু তাহার গোটা কতক গান বাঁধিয়া দেন। নগেন বলিলেন, 'ওরা যাত্রা করেছে, এস আমরা থিয়েটার করি।' তাহার কথায় আমরা সকলেই নাচিয়া উঠিলাম। নগেন থিয়েটারের সবই জানে, কারণ 'পদ্মাবতী' নাটকে নিজে অভিনয় করিয়াছে। গিরিশবাবুর পরামর্শে 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করা হইল।" "অভিনয়ের দিন দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও বন্ধু-পরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। গিরিশবাবু নট-নটীর একটি prologue রচনা করেন, কয়েকটী নূতন গানও সন্নিবেশিত করিয়াছেন।"

নাট্যাচার্য রাধামাধব করের স্মৃতিকথায় বাগবাজার থিয়েটারের ইতিহাস

"সধবার একাদশী"তে গিরিশচন্দ্র যে প্রস্তাবনা-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

"আমরি শোভিছে কিবা সভা মনোহর।
বিরাজে রসিকব্রজ অশেষগুণ আকর ॥
রঞ্জিতে রসিকচিত নবরস-বিভূষিত
হইতেছে বিচলিত সভয় অন্তর ॥"

পরে এই গীতটি তাঁহার "সীতার বিবাহ" নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্রের বয়সে যেমন যৌবনের রং ধরিয়াছিল, তাঁহার মনেও তেমনি নব নব উন্মেষশালিনী শক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। একদিকে তিনি সওদাগরী আফিসে সুখ্যাতির সহিত হিসাব-

রক্ষকের কাজ করিতেছেন—আফিসের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কার্য্যের প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখিতেছেন, ওদিকে সংসারে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পড়াশুনা দেখিতেছেন, নিজে নানা বিষয়ক গ্রন্থ পড়িতেছেন, বন্ধুদের সহিত সাহিত্যচর্চা করিতেছেন আবার বিলাতী রঙ্গালয় কলিকাতায় আসিয়া যখন যাহা অভিনয় করিতেছে তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেছেন, কখনও সখের যাত্রায় গান বা পালা বাঁধিয়া দিতেছেন—রঙ্গালয়ের সংগঠনকল্পে দলের নেতৃত্ব করিতেছেন ও অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন—কর্ম্মের যেন তিনি একটা বিরাট জীবন্ত মূর্তি! কিন্তু আশ্চর্য, কোন কাজেই গিরিশ নিজে উদ্‌যোক্তা নহেন। গীত বাঁধিয়া বা পালা রচনা করিবার জন্য তিনি উপযাচকভাবে কাহারও দ্বারে যান নাই—বা যাচিয়া কাহাকেও বলেন নাই। লোকে প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছে বা কোনও দলের প্রয়োজন-বশতঃ গান বাঁধিতে বা পালা রচনা করিতে হইয়াছে। যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকটে আসিয়াছে—তাহা তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তহস্তে সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে দিয়াছেন। ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিভার বিরাট বৈচিত্র্য।

গিরিশের বহুমুখী শক্তির বিকাশ

"সধবার একাদশী"র অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইয়া গিরিশচন্দ্র দলপতি হইবার জন্য প্রার্থী হন নাই কিংবা কোন আয়াসও করেন নাই। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'সধবার একাদশী' শেষ হইল। লীলাবতীর অভিনয় আরম্ভ হইল। এ সম্প্রদায়-স্থাপনে আমার একজন পূর্ববঙ্গীয় বন্ধু উদারচেতা শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ উৎসাহী। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ না থাকিলে সম্প্রদায় স্থাপিত হইত না, তাঁহারই

অর্থব্যয়ে আখড়া-খরচ চলিত। বহুদিন লীলাবতীর মহলা চলে। প্রথমে তথায় আমার বেশী যাতায়াত ছিল না, কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া বিশেষরূপে যোগদান করিতে হয়। চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও 'সাধারাণী'র সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া লীলাবতী-সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের সুখ্যাতি অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইল। বাগবাজারের লীলাবতী বসিয়াছে বটে, কিন্তু সকল অংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। যদিও অন্যরূপ কারণ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাই, তথাপি আমার যোগদানের স্বরূপ কারণ বলিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিভাশালী ষ্টেজ ম্যানেজার ধর্মদাস সুর সমবেত হইয়া আসিয়া অর্দ্ধেন্দু আমার নিকট বলিলেন, 'চুঁচুড়ার দলের নিকটে হারিয়া যাইব—তুমি কি বসিয়া দেখিবে?' অর্দ্ধেন্দুরই সর্বাপেক্ষা বিশেষ অনুরোধ। নাট্যকার দীনবন্ধু তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন, 'তোমরা পারিবে না'।"

লীলাবতী অভিনয়ের ইতিহাস

গিরিশচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি লীলাবতী অভিনয়ের বিজয়-সাফল্যের জন্য উদ্‌যোগী হইলেন।

রাধামাধব কর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "লীলাবতী ও ললিতের কথা অমিত্রাক্ষর ছন্দে থাকার দরুন অনেকেই পশ্চাদপদ হইলেন। শেষে গিরিশবাবু আসিয়া যখন ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, তখন আর কোনও বাধা রহিল না। পাত্র-পাত্রী-নির্বাচন স্থির হইয়া গেল।" গিরিশবাবু বলেন,

দীনবন্ধুর সুখ্যাতি ও 'দুয়ো বঙ্কিম'

"লীলাবতীর অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। অভিনয়-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধুবাবু আমায় বলিলেন, 'তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া দলের তুলনাই হয় না—আমি পত্র লিখিব—দুয়ো বঙ্কিম।' গিরিশের অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্যে বিস্মিত হইয়া দীনবন্ধু তাঁহাকে যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 'আমার কবিতা যে এমন করিয়া পড়া যায় তাহা আমি জানিতাম না। **Take this compliment at least.**' এইবার বাগবাজার নাট্য-সম্প্রদায় বিজয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইল। দলে দলে লোকে ইহাদের অভিনয় দেখিতে ছুটিল—টিকিটের জন্য এত উমেদার হইল যে রাজেন্দ্র পালের বৃহৎ প্রাঙ্গণে আর স্থান কুলাইল না। প্রাচীন অভিনেতা যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এই দলে ছিলেন। তাঁহার "স্মৃতিকথা"য় তিনি বলিয়াছেন যে, লীলাবতী অভিনয়ের উদ্‌যোগ-সময়ে গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের বলেন, "তোমাদের গুটান দৃশ্যপটে (scenes) সব ঘটনা ভাল করিয়া দেখান হয় না—সরান দৃশ্যপট (moving scenes) আবশ্যক। যদি ভাল করিয়া ষ্টেজ করিতে চাও তবে অলিম্পিক থিয়েটার দেখিয়া আইস।"

সরান দৃশ্যপট-সম্বন্ধে গিরিশের উপদেশ

ভবিষ্যতে বাংলার যিনি স্থায়ী নাট্যশালা গঠন করিবেন তাঁহার সর্বদিকে এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা চাই। যিনি রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিবেন, যিনি দৃশ্যপট অঙ্কন করিবেন, যিনি সাজসজ্জাদি প্রস্তুত করিবেন, যিনি প্রেক্ষাগৃহ পরিচালনা করিবেন, যিনি অভিনয় করিবেন—তাঁহাদের প্রত্যেককেই চালিত করিতে ও পরামর্শ দিতে একা গিরিশচন্দ্র সমর্থ ছিলেন। কারণ তাঁহার মত

গিরিশের একাধারে বহু গুণ ও শক্তির সমাবেশ

বহুমুখী প্রতিভা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি, নানাবিষয়িণী বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য, লোকচরিত্রে গভীর জ্ঞান, বিচারশীল মন, দুর্লভ কবিত্ব ও কলা নৈপুণ্যের কল্পনা এবং তীক্ষ্ণ ব্যবসায়ী বুদ্ধি—একাধারে সে দলে আর কাহার ছিল ?

রাজেন্দ্র পালের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে আর লোক ধরিল না বলিয়া সম্প্রদায় টিকিটের মূল্য করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাবই ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপনের ভিত্তি। পূর্বে যাঁহারা থিয়েটারকে অগ্রাহ্য করিতেন—তাঁহাদের অনেকেই ইহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন। "নীলদর্পণ" অভিনয়ের মহলা চলিতে লাগিল। গিরিশচন্দ্র "ন্যাশন্যাল" নামকরণের বিরোধী হইলেন। গিরিশচন্দ্র বলেন, "ন্যাশন্যাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ একেই তো তখন বাঙালীর নাম শুনিয়া ভিন্ন জাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থায় ন্যাশন্যাল থিয়েটার দেখিলে কি না বলিবে এই আমার আপত্তি। ন্যাশন্যাল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ—বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাশন্যাল থিয়েটার করিতেছে ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল। এই মতভেদ।"

নীলদর্পণে গিরিশচন্দ্র

ন্যাশন্যাল থিয়েটারের নামকরণে গিরিশের আপত্তি

গিরিশের মনে যে জাতীয় মর্যাদা-জ্ঞান ছিল—যে জাতীয় গৌরবের অপূর্ব কল্পনায় তাঁহার মন বিভোর ছিল—অভিনয় ও নাটকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনের যে পরিকল্পনার ছবি তাঁহার মনে উদিত হইত—সেই আকাঙ্ক্ষা—সেই সাধ—সেই

ভাবের দুয়ারে তিনি আঘাত পাইয়াছিলেন। সে আঘাতে শিক্ষাগুরু গিরিশচন্দ্র সম্প্রদায়ের উৎসাহ-উদ্যমে আর সায় দিতে পারিলেন না। এখানেও গিরিশের মনে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল।

ন্যাশন্যাল রঙ্গালয়ে শিষ্যবর্গের প্রতি গিরিশের ব্যঙ্গ ও শ্লেষ

বাগবাজারের সখের যাত্রায় "দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে" দুইটি সং দেওয়া হইয়াছিল—সাপুড়ে ও বাউল। রাধামাধব কর বাউল সাজিয়া গাহিলেন—

"লুপ্ত বেণী বইছে তেরো ধার।
তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ ইন্দুকিরণ
সিঁদূর মাখা মতির হার॥

নগ হতে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণা কায়
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়;
শিব শম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি
যদুপতি অবতার।

কিবা ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান,
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান,
অবিনাশী মুনি ঋষি কর্‌ছে ব'সে ধ্যান;
সবাই মিলে ডেকে বলে, দীনবন্ধু কর পার॥

কিবা বালুময় বেলা
পালে পাল রেতের বেলা
ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা;
মিছে ক'রে আশা, যত চাষা
নীলের গোড়ায় দিচ্চে সার!

কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে
জ্ঞান হয় বা দিনের গৌরব এতদিন খসে ;
স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ী-শুঁড়ি—
পয়সা দে দেখে বাহার ॥”

এই গানটিতে কৌশলক্রমে সকল অভিনেতা ও থিয়েটারের কর্তৃপক্ষদের নাম আছে। ইহা শুধু শ্লেষ ও ব্যঙ্গে পূর্ণ। ইহাতে গিরিশ যাঁহাদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাঁহারাও আনন্দে গাহিয়া নাচিয়াছেন। অমৃত বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় এই গীতটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, “একদিন একটী ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, ‘ওহে, গিরিশ ঘোষ তোমাদের নামে একটা গান বেঁধেছে, তোমাদের খুব ঠাট্টা করেছে। আমরা বলিলাম, ‘বটে, কই সে গান দেখি।’ আমাদের গালাগালির গানটী পড়িয়া আমাদের এত ভাল লাগিল যে আমি বলিলাম, ‘ওহে, চমৎকার গান, এস গাওয়া যাক্।’ আমরা সকলে গান ধরিলাম। গিরিশবাবুর এই গানটী আমরা মহানন্দে গাইলাম। তাহার ফলে তাঁহার মনে ভাবান্তর হইল।” আশ্চর্য, কেহ কেহ ইহার মধ্যে ঈর্ষা ও কুটিলতা দেখিতে পান। ইহাকেই বলে যাহার মাথা নাই তাহার মাথাব্যথা !

অমৃত বসু প্রমুখ গিরিশের শিষ্যবর্গের ব্যঙ্গগানে উল্লাস

যাহা হউক, গিরিশচন্দ্র এই সম্প্রদায়ের শিক্ষাগুরু ছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই সম্প্রদায়ের ম্যানেজার ছিলেন ধর্মদাস সুর, এবং ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ভুবনমোহন নিয়োগী, বাগবাজার অন্নপূর্ণা ঘাটের উপর তাঁহার পিতামহ-নির্মিত সুবৃহৎ বারদ্বারী বৈঠকখানায় সম্প্রদায়ের মহলা চলিত।

ইঁহারা উভয়ে লিখিয়াছেন যে, "গঙ্গাতটস্থ বৈঠকখানায় গিরিশবাবুর প্রস্তাবমত 'নীলদর্পণের' রিহারস্যাল (সম্প্রদায়) দিতে লাগিলেন। রিহারস্যাল সমাপ্ত হইলে দর্শকবৃন্দের আগ্রহাতিশয়-দর্শনে সম্প্রদায় টিকিট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে তাঁহাদের অভিনয়-শিক্ষক শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ অসম্মত হন,—তিনি বলেন, 'আমাদের রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এখনও এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে ন্যাশন্যাল থিয়েটার নামকরণপূর্ব্বক টিকিট বিক্রয় করিয়া সাধারণে প্রকাশিত হওয়া যায়।' কিন্তু সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশই এরূপ উত্তেজিত হন যে তাঁহাদের শিক্ষাগুরু, যাঁহার অসাধারণ শিক্ষানৈপুণ্যে তাঁহাদের সম্প্রদায় এত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং যাঁহার বিপুল অধ্যবসায়গুণে সুশিক্ষিত হইয়া তাঁহারা নীলদর্পণ অভিনয়ে এরূপ নবোৎসাহে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই গিরিশবাবুর কথা রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। চিরস্বাধীন গিরিশবাবু তাঁহার বহু যত্নে শিক্ষাদানের পরে 'নীলদর্পণ' অভিনয়-দর্শনে সাধারণে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে সে কৌতূহল-নিবৃত্তির আগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সম্প্রদায়ের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।" গিরিশচন্দ্রও বলিয়াছেন যে, "নীলদর্পণ শিখাইবার অংশ অদ্যাবধি জীবিত ধর্ম্মদাসবাবু আমাকে কাগজে কলমে দেন।"

নীলদর্পণের অভিনয়ে গিরিশের শিক্ষাদান

নীলদর্পণের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্রকে না দেখিয়া দীনবন্ধু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের (serious part) actor যোগদান করে নাই।"—

নীলদর্পণে দীনবন্ধুর আক্ষেপ

গিরিশ বলেন, "ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বলিয়াছি, তখন আমার সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু যখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইয়াছিল—তখন আমায় যোগ দিতে হয়। ভীমসিংহের ভূমিকা আমার উপর অর্পিত হইল।" গিরিশ আরও বলেন, "আমি আমার নাম amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে অভিনয় করিতে অসম্মত হই।" প্রয়োজন বুঝিয়াই সম্প্রদায় গিরিশচন্দ্রের নিকট গিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন গিরিশচন্দ্র ভীমসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিলে 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় সর্বাঙ্গ সুন্দর হইবে এবং "নিমচাঁদ" "ললিতে"র মত একটা হুলস্থুল পড়িতে পারে। বাস্তবিক ঘটিয়াছিল তাহাই। ভাল নাটক সুন্দরভাবে অভিনয় করিতে হইলে গিরিশচন্দ্র ব্যতীত করা সে সময়ে দুষ্কর ছিল। সম্প্রদায় হইতে গিরিশ মাত্র কয়েক দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপিত হয় এবং সেই রঙ্গমঞ্চে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারীতে গিরিশচন্দ্র ভীম-সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইহাতে ব্যবধান মাত্র আড়াই মাসের। নাটকের মহলা ও শিক্ষা দিতেও গিরিশকে কিছুদিন পূর্বে এই সম্প্রদায়ে যোগদান করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া অমৃত বসু মহাশয়ের স্মৃতিকথায় যেখানে তিনি গিরিশবাবুর ব্যঙ্গ-গীতির উল্লেখ করিয়াছেন—সেখানে "আবার শনিবার নীলদর্পণ অভিনয় করা গেল"—বলায় বোধ হয় দ্বিতীয় শনিবার-রজনী অভিনয়ের পরেই গীতটি তাঁহারা সকলে মিলিয়া গাহিয়াছিলেন এবং তাহা শুনিয়া গিরিশবাবুর ভাবান্তরের উল্লেখে বুঝা যায়—

ন্যাশন্যাল রঙ্গমঞ্চে ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশের অভিনয়

মাত্র ১০।১৫ দিনের ব্যবধান। সম্প্রদায় আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতেই তাঁহার শিষ্যবৎসল প্রাণে সব অভিমান ভাসিয়া গেল। প্রয়োজনের আহ্বানেই গিরিশ ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যোগ দিলেন—তাঁহার জীবনের এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

গিরিশের ভীমসিংহের অভিনয় দেখিয়া স্বয়ং নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন মুগ্ধ হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। সম্প্রদায়ের অনুরোধে—ভীমসিংহের অভিনয় করিলেও গিরিশ থিয়েটারের আভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনায় যোগ দেন নাই। সর্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয়ে যেমন অর্থের সমাগম হইল—তেমনি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহাদের আত্মকলহ ঘটিল। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া অমৃতবাজার সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, বাগবাজারের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং গিরিশচন্দ্র ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা সম্প্রদায়ের আত্মকলহ থামাইতে পারিলেন না। সুতরাং কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ের পনের দিনের মধ্যেই ন্যাশন্যাল থিয়েটার উঠিয়া গেল। গিরিশচন্দ্রের রচিত একটি গীত গাহিয়া রঙ্গমঞ্চে তাহা বিজ্ঞাপিত করা হইল। কিন্তু সে গীতে আশা আকাঙ্ক্ষার কথাও ছিল—আবার তাঁহারা রঙ্গালয় নির্মাণ করিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিবেন এই প্রার্থনাও ছিল।

গিরিশের ভীমসিংহের অভিনয়ে মধুসূদনের প্রশংসা

ন্যাশন্যাল লোপের শেষ দিনে গিরিশের গান

"নির্ম্মাইয়ে নাট্যালয়
আরম্ভিলে অভিনয়
পুনঃ যেন দেখা হয়
এ মিনতি পায়।"

অমৃত বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলেন, "গান শেষ হইল। দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হইয়া আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন। মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে মক্ষিকার দল যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গুন্ গুন্ করিতে থাকে তদ্রূপ সেই দর্শকমণ্ডলী—অস্ফুট কলরব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন 'কেন তোমরা বন্ধ কর্‌বে? কেন তোমরা বিদায় চাও? তোমাদের ভুল্‌ব কেন? যেখানে অভিনয় কর্‌বে আমরা আসব বৈ কি?' বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা চাঁদার খাতা খুলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরিতাম, তাহা হইলে নাট্যালয় নির্মাণের খরচ তখনই সই করাইয়া লইতে পারিতাম।"

দর্শকদিগের মধ্যে দুঃখ ও চাঞ্চল্য

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্রবে আসিয়াই কবিগুরু মাইকেল মধুসূদন জাতীয় নাট্যশালার অভাব অনুভব করেন। তিনি সুবিখ্যাত নটকুল-শিরোমণি কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলিকে একটি জাতীয় নাট্যশালা গঠনে উদ্‌যোগী হইতে বারংবার বলিয়াছিলেন। কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনার সময় উক্ত কেশববাবুকে লিখিয়াছিলেন, "If this tragedy be a success, it must ever remain as the foundation-stone of our National Theatre." আবার নাটক রচনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন, "It strikes me, that if the Drama is to be acted, you had better at once organise your company and begin operations with the two acts already printed. Go on rehearsing at Jatindra's and then you can settle whether we are to do

মাইকেল মধুসূদনের চেষ্টায় শরৎ ঘোষের বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা

the thing in the Town Theatre or blaze out at dear old Belgachia. সেই মধুসূদন ন্যাশন্যাল থিয়েটার লোপ পাইলে একটি জাতীয় রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্‌যোগী হইলেন। তিনি সুবিখ্যাত ধনী সাতু বাবুর পৌত্র নাট্যামোদী যুবক শরৎচন্দ্র ঘোষকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করেন। সহরের গণ্যমান্য লোক লইয়া নাট্যশালা পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইল। সে যুগের সর্বপ্রধান সংস্কারক ও শিক্ষা-প্রচারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন, বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত সামাশ্রমী ও রামবাগানের প্রসিদ্ধ মনীষী উমেশ-চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ইহার সদস্য ছিলেন। থিয়েটারের নামকরণ হইল বেঙ্গল থিয়েটার। কমিটিতে মধুসূদন প্রস্তাব করিলেন যে অভিনয়ে স্ত্রীচরিত্রের ভূমিকা পুরুষের দ্বারা না হইয়া স্ত্রীলোকের দ্বারা হউক। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু ভোটের জোরে মধুসূদনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন কমিটির সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে গোলোকদাসের পর বাংলার রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয়ের প্রথম প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন। পরে যখন ন্যাশন্যাল থিয়েটার সম্প্রদায় আবার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে আসিলেন, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। ন্যাশন্যাল থিয়েটার এই সময় "গ্রেট" শব্দ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। গিরিশ তখন ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন নাই, কারণ পারিবারিক নানা দুর্ঘটনা-বশতঃ ও

রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোক অভিনেত্রীর প্রথম প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন

বেঙ্গল থিয়েটারের অনুকরণে গ্রেট ন্যাশন্যালে স্ত্রীলোক অভিনেত্রীর আমদানি

সূতিকারোগে স্ত্রী মুমূর্ষু থাকায় তিনি উদ্বেগগ্রস্ত। অমৃত বসু বলেন, "রামবাগানের উমেশ দত্ত একদিন স্পষ্টই বলিলেন, 'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় না করিলে রঙ্গালয় জমাইতে পারিবে না'।" অবশেষে বেঙ্গল থিয়েটারের অনুকরণে গ্রেট ন্যাশন্যাল অভিনেত্রী আমদানি করিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন গিরিশ সম্প্রদায়ের অনুরোধে আসিয়া যোগ দিলেন, তখন লীজ পরিবর্তন করিয়া তিনি ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম রাখিলেন। মধুসূদন তাঁহার ঈপ্সিত রঙ্গালয় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য নাটক অসমাপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিল—তিনি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুন পরলোক গমন করেন। প্রথম অভিনয় রজনীতে বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় ১৬ই আগস্ট—মাত্র প্রায় দেড়মাসের ব্যবধান। হায় মধুসূদন!

মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু

গ্রেট ন্যাশন্যালের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে বঙ্কিমবাবুর মৃণালিনী প্রভৃতি উপন্যাস নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয় করিতেন। কিন্তু সে সময়ে তাহা ধারাবাহিকভাবে করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। শোকে রোগে দুর্ভাবনায় তিনি জর্জরিত ছিলেন। সে অবস্থায় যে মাঝে মাঝে সম্প্রদায়কে সাহায্য করিতেন তাহাই আশ্চর্য।

গিরিশের গ্রেট ন্যাশন্যালে সাহায্য

এই সময়ে বাংলার সাহিত্যগগনে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যাহ্ন-ভাস্করের মত তাঁহার প্রতিভারশ্মি বিকিরণ করিতেছিলেন। গদ্য-সাহিত্য তখন নব যৌবনোদ্‌গমে আপন সৌন্দর্যে নব-বিকসিত শতদলের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছিল। বঙ্কিমের উপন্যাস ও

রচনা তখন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘরে ঘরে পঠিত হইতেছিল।

বাংলার ধর্ম, সাহিত্য ও রঙ্গালয়ের প্রবল আন্দোলন

বাংলার জাতীয় জীবনে ঊনবিংশ শতাব্দীর এ যুগ বড় গৌরবময়। একদিকে ধর্ম-সংস্কারক দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ ও শিবনাথ, অপরদিকে হিন্দুধর্মপ্রচারক শশধর ও পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ প্রবল ধর্মান্দোলনে বাংলার প্রাণরসকে উদ্দীপিত করিতেছেন। এক-দিকে মহাকবি মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলার সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করিয়া বাংলাভাষার অপূর্ব সৌন্দর্য মাধুর্য ও ওজঃ শক্তির বিকাশে সকলকে চকিত ও বিস্মিত করিতেছেন, অপরদিকে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল ও রামদাস ভারতেতিহাসের লুপ্ত রত্নোদ্ধার করিয়া প্রাচীন গৌরবের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন। একদিকে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অদ্ভুত হাস্য করুণ রসে নাটক রচনায় বাংলার নাট্যসাহিত্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন, অপরদিকে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল নানা রাগরাগিণীতে বাংলার কাব্যকুঞ্জে আলাপ করিতেছেন। একদিকে প্যারীচাঁদ মিত্র নূতন কথা-সাহিত্যে আলালের ঘরের দুলাল রচনা করিয়া যে উপন্যাসের অঙ্কুর বপন করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভায় ও যত্নে তাহা নানা ফল-ফুলে শোভিত মহা-মহীরুহে পরিণত হইয়াছে—তৃষ্ণার্ত পথিক তাহার শান্তস্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া প্রাণ ভরিয়া সরস সুমিষ্ট ফলে পিপাসা ও ক্ষুধা নিবারণ করিতেছে অপরদিকে নাট্যশালা গিরিশচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভায় উজ্জ্বল—তাঁহার অপূর্ব অভিনয়ে ও সঙ্গীতে, তাঁহার অপরূপ নাটকীয় চরিত্রের

পরিকল্পনায় ও অভিনয়ের ভৈরব ঝঙ্কারে সমগ্র বাংলা মুগ্ধ ও বিস্মিত।

অভিনেতা গিরিশচন্দ্র, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকগুলি অভিনয় করিবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অপূর্ব রসধারা রঙ্গমঞ্চে প্রবাহিত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি একে একে কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয় করিলেন। নাটকাকারে গঠন করিতে গিরিশচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব নাট্যপ্রতিভা দেখাইয়াছেন। উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করিতে, পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিতে, পারিপার্শ্বিক রস ও ঘটনার সংস্থানে স্থাপিত করিতে অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ সকল নাটকের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছেন।

বঙ্কিমের উপন্যাস নাটকাকারে রূপান্তরিত করিতে গিরিশের নৈপুণ্য

যখন গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন তাঁহার পারিবারিক জীবনে ঘোর বিপর্যয় ঘটে। একে একে তাঁহার সহোদর-সহোদরা এবং প্রিয়তমা পত্নী কাল-কবলে পতিত হইলেন। ইহার উপর যে আফিসে তিনি সুখ্যাতি ও পদবৃদ্ধির সহিত কাজ করিতেছিলেন তাহা উঠিয়া গেল। দারুণ আঘাতে তাঁহার হৃদয়ের নিরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া গিয়া কবিতার অমৃতময় উৎস বাহির হইল। স্ত্রীবিয়োগে তাঁহার যে মনোবিকার-ব্যাধি হইয়াছিল—তাহা লক্ষ্য করিয়া কবি তাঁহার "শৈশব বান্ধব" কবিতায় বলিতেছেন—

কবি গিরিশচন্দ্র

তুমি আমি দুইজনে হেরিব শ্মশান—
বিভূতি-ভূষিত,

ধবক্ ধবক্ চিতানল ভালে দীপ্তিমান,
গণ্ডগোল শিবার সঙ্গীত,
বিবশে ভূতলে সতী চিতানলে জ্বলে পতি
পিতামাতা মৃত পুত্র মুখপানে চায়,
বিচ্ছিন্ন লতিকা প্রায় ধূলায় ঢালিয়া কায়
যুবক চাহিয়া দেখে প্রাণ-প্রতিমায়।
তুমি আমি মরুভূমে করিব গমন
বালুময় দেশ,
কেবল অনলভার বহে সমীরণ
দিনকর প্রাণহর বেশ,
বালির তুফান উঠে ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটে
প্রাণিশূন্য, তবু যেন সদা হাহাকার,
ধূ ধূ ধূ ধূ ধূ ধূ কার দূর চক্র সীমা তার
উপমার স্থলমাত্র হৃদয় আমার।

কখন বিয়োগ-বিধুর কবি আঁধারের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন—

তরুলতা ফুলপুঞ্জ, কোকিল-কূজিত কুঞ্জ,
অলির ঝঙ্কার প্রাণ না চাহে আমার।—
রবি শশী তারা হার, হাসিমুখ ললনার,
কেবল তোমারে ভাল বাসি হে আঁধার!
অসীম অনন্ত তুমি সম চিরদিন।
না হাস না কাঁদ, নহ কালের অধীন॥

কখনও ধুতুরাকে দেখিয়া ভাবোন্মত্ত কবি বলিতেছেন—

গোপনে ফুটেছ তুমি গোপনে শুকাবে,
জীবন যৌবন মন যার তরে সমর্পণ
আসন্ন সময়ে তারে দেখিতে কি পাবে?

তাঁহার এই শোকাতুর অবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শে সওদাগরী অফিসের চাকুরী লইয়া তিনি ভাগলপুরে গমন করেন। সেখানে কহলগাঁর পাহাড় দেখিয়া কবি গিরিশচন্দ্র বলেন—

সুরঙ্গ কুরঙ্গ হেম অঙ্গ পাখিগণে—
ঋক্ষ ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর জীবঘাতী বনচর—
শরণ লইয়া আছে তব আলিঙ্গনে,
আশ্রয় কি দাও গিরি, ভাগ্যহীন জনে?

গিরিশচন্দ্রের "হল্‌দি ঘাটের যুদ্ধ" বাংলা পদ্য-সাহিত্যে অতুলনীয়।

গিরিশের রঙ্গালয়ে যোগদান ও মেঘনাদবধ অভিনয়

ভাগলপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি চাকুরী ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিশিষ্ট সুহৃদ্ অমৃতবাজার-সম্পাদক স্বর্গীয় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের অনুরোধে তিনি Indian Leagu-eএর হেডক্লার্ক ও কেসিয়ারের পদ গ্রহণ করেন। বৎসর-খানেক পরে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। এই সময় তাঁহার দ্বিতীয় পরিণয় হয় এবং পার্কার সাহেবের আফিসে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে বুককিপারের কাজে তিনি নিযুক্ত হন। তৎকালে গিরিশ রঙ্গালয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখেন যে "গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটার মুমূর্ষুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ্ সুসাহিত্যিক নাট্যকবি কেদারনাথ চৌধুরীর অনুরোধে ও উৎসাহে গিরিশ পুনরায় রঙ্গভূমিতে যোগ দিলেন। ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম দিয়া তিনি "মেঘনাদ" কাব্য নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয় করিলেন। তাঁহার এই সময়ে রচিত সঙ্গীত—

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধুবিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে॥

ইহা দেশ বিখ্যাত। মেঘনাদবধে তিনি যে প্রস্তাবনা পাঠ করেন তাহা তেজঃপূর্ণ উদ্দীপনাময় এবং সুন্দর!

আসি এই রঙ্গস্থলে কতলোক কত বলে
সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন,
কাব্যে যার অধিকার দাস তার তিরস্কার
অকপটে কহে, করে মস্তকে ধারণ।
সুধীজন-পদধূলি রাখি আমি মাথে তুলি
তিরস্কার তাঁর দোষ বারণ কারণ;
এনকোর "ক্ল্যাপে" যাঁর আছে মাত্র অধিকার
তাঁরো আজি করি আমি চরণ-বন্দন।
সবিনয়ে কহে ভৃত্য নহে বারাঙ্গনা-নৃত্য
"মেঘনাদে" বীরমদে বিপুল গর্জন,
রুণু ঝুণু নাহি আর কঙ্কণের ঝণৎকার
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনি-পতন॥

মেঘনাদবধে গিরিশচন্দ্র অদ্ভুত অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র একাই "রাম" ও "মেঘনাদে"র ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার অভিনয় দেখিয়া "সাধারণী"তে অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। যাঁহারা সে অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। উত্তরকালে গিরিশচন্দ্রের প্রায় বৃদ্ধবয়সে "মেঘনাদবধে" তাঁহার অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল—যাহা দেখিয়াছি তাহা এখনও চক্ষুর সম্মুখে

ভাসিতেছে। তাঁহার সেই ভাবপূর্ণ আবৃত্তি কর্ণে এখনও ধ্বনিত হইতেছে। "মেঘনাদে"র অভিনয়ে তাঁহার যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশীসমূহের উপর তাঁহার অদ্ভুত আধিপত্য, ভাবের রূপান্তরে আকৃতির বিকৃতি এবং সর্বোপরি জীবন্ত চরিত্রের ভাবরসের স্ফূর্তি যাহা দেখিয়াছি তাহা আজ পর্যন্ত কোথাও দেখি নাই। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় গর্জিয়া একবার উঠিতেছে আবার পড়িতেছে—যেন ছন্দানুক্রমে নৃত্য করিতেছে। সে রকম আবৃত্তি তো আর কাহারও মুখে শোনা যায় না। ইহা অত্যুক্তি নয়—প্রশংসার আতিশয্য নয়—ইহা স্বরূপ বর্ণনার চেষ্টা মাত্র।

গিরিশের অপূর্ব অভিনয় ও আবৃত্তি

তারপর "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়া অভিনীত হয়। অবশেষে ভাল নাটক রচনার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। কিন্তু নাটক জুটিল না! অগত্যা বাধ্য হইয়া গিরিশচন্দ্র নাটক লিখিতে বসিলেন। আশ্বিন মাসে বাঙালী যখন "আগমনী" গীতে মাতিয়া উঠে, যে আগমনী গীতিতে বাংলার ঘরে ঘরে হাসি-কান্না মিশাইয়া আছে, যে আগমনী গীতের রসধারায় বাঙালীর মাতৃবক্ষ কন্যাস্নেহে উথলিত হয়, দুহিতাকে জননীর আলিঙ্গনস্মৃতি জাগাইয়া দেয়, পবিত্র কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তি বাঙ্গালীর হৃদয়পটে অঙ্কিত করে, যে "আগমনী"র সঙ্গে বাংলার দুর্গোৎসব জড়াইয়া আছে, সেই আগমনী গান গাহিয়া বাংলার রঙ্গশালায় গিরিশ ধীরে ধীরে নাট্যকাররূপে দেখা দিলেন। তখন গিরিশের মস্তকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংস্কৃতির কুণ্ডলীকৃত জটাজূট, জাতীয় সমস্যা-সমাধানে

গিরিশের নাটক রচনা "আগমনী" ও "অকাল-বোধন"

ধ্যানমগ্ন অর্ধনিমীলিত নয়ন, শ্রুতিমূলে অভিনয়-খ্যাতির ধুতুরা-ফুল, কণ্ঠে কবিত্বের ভৈরব ঝঙ্কার, করধৃত দুই কুক্ষিতে পূর্বপশ্চিমের রসপূর্ণ দুই পাত্র, অঙ্গে প্রতিভার দীপ্ত বিভূতি—পদযুগলে নটের নৃত্য। "আগমনী" গাহিয়া নটনাথের অনুচর নটভৈরব গিরিশ বাংলার রঙ্গালয়ে মহাশক্তির "অকালবোধন" করিলেন। জীবনের তৃতীয় দশকের মধ্যভাগে নাট্যকাররূপে বাংলার নাট্যশালায় গিরিশের সর্বপ্রথম আবির্ভাব।

নটনাথের নটভৈরব গিরিশ

নাট্যকলায় মনোবিকাশ

সম্মুখে অসীম অনন্ত নীলাম্বুরাশি, ফেনিল, তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছ্বসিত, বিক্ষুব্ধ, চক্রায়িত, অপার গভীর ও বৈচিত্র্যময়। উপরে অনন্ত নীলাকাশ সীমাশূন্য, দিক্‌শূন্য, আলোকজ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত, কোটী কোটী তারকামালাখচিত, কোটী কোটী বিশ্ব মহাশূন্যে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে আবার লয় পাইতেছে—সৃষ্টিপ্রবাহে আবার ভাসিয়া উঠিতেছে। অনন্ত সমুদ্রাপেক্ষা ইহা অধিকতর রহস্যময়, অনধিগম্য, গভীর ও বৈচিত্র্যশালী। কিন্তু মানব-মন পরিদৃশ্যমান জগতের অনন্ত বারিধি ও অনন্ত আকাশ অপেক্ষাও অধিকতর বিচিত্র, অপরিমেয়, অসীম, গূঢ় রহস্যাবৃত, উচ্ছ্বাসময়, অপার অগাধ ও শক্তিসম্পন্ন। এই মানব-মন সেই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন আনন্দঘন ব্রহ্মের সন্ধানে যাইতেছে, স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া গভীর সমাধিমগ্ন হইতেছে এবং ব্রহ্মবিদ্ ঋষি ও দ্রষ্টা রূপে অপৌরুষেয় জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া যুগ-যুগান্তে বিশ্বজগতে বন্দনার অর্ঘ্য পাইতেছে। আবার এই মন সমুদ্রের অতলতলে রত্ন কুড়াইবার উপায় নির্ধারণ করিতেছে, সমুদ্রবক্ষে রাজপথ নির্মাণ করাইতেছে, আকাশের গ্রহনক্ষত্রের গতি ও সংস্থান পরিমাপ করিবার স্পর্ধা করিতেছে এবং অনন্ত জগৎ-রহস্যের যবনিকা

সমুদ্র ও আকাশের অপেক্ষাও মানব-মন অধিকতর বিরাট্ ও রহস্যময়

মানব-মনকে স্তরে স্তরে বিশ্লেষণ করিয়া দেখায় বলিয়া নাট্যকার ভাবজগতে অমর

উত্তোলন করিয়া ক্রীড়াময়ী প্রকৃতির নিত্য নূতন অভিনয় প্রত্যক্ষগোচর করাইতেছে। নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে চিত্রকর, কবি ও নাট্যকার এই পরিবর্তনশীল জগৎকে ও অন্তর্গূঢ় মানব-মনকে স্তরে স্তরে বিশ্লেষণ করিয়া মনস্তত্ত্বের অনুপম অভিনব সৌন্দর্যমহিমা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতেছে। এইজন্য প্রকৃত কবি, নাট্যকার, চিত্রকর ও ভাস্কর ভাবজগতে অমর।

রসই সাহিত্যের প্রাণ

শ্রুতি বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ"—তিনি রসস্বরূপ। এই রসানুভূতির আনন্দই সাহিত্যের সৃষ্টিশক্তি। এই রসানন্দকেই সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা "ব্রহ্মানন্দ-সহোদরঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি এই রস-ধারার মূল উৎস তিনি যে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম। ব্রহ্মানন্দের মত এই রস যে তাঁহার আনন্দধারায় ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে। এই রস যেমন জীবজগতের প্রাণ—তেমনি সাহিত্যেরও প্রাণ। এই রসের লাবণ্যেই সৌন্দর্যের বিকাশ। তাই সৌন্দর্যের উপাসক রসানুভূতিতেই চিরসুন্দরের পূজা করিয়া থাকে—কবি কল্পলোকে রসধারার মাধুর্য আনন্দের অমৃতায়মান সৌন্দর্যের অপূর্ব ছবি ফুটাইয়া তোলেন এবং শব্দঝঙ্কারে নৃত্যশীল ছন্দের গতিতে তিনি ভাবোন্মাদে দুই হস্তে সেই আনন্দসম্পদ্ বিতরণ করেন। চিত্রকারও তুলিবিন্যাসে চিত্রপটে সেই অপূর্ব ছবি আঁকিয়া ভাবদ্যোতনার ললিতলাস্যে আনন্দ-মাধুরী ছড়াইয়া দেন। ঘটনা—সন্নিবেশে ও মানবচরিত্রের বিচিত্র উপাদানে নাট্যকার নানা অবদানের অন্তরালে রসের স্ফূর্তি করিয়া স্তরে স্তরে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের বিকাশ

নাট্যকার নানা অবদানের অন্তরালে রসের বিকাশ করেন

করেন। এই রসপূর্ণ সৃষ্টি-চাতুর্যেই নাট্যকারের নাট্যশক্তির পরিচয়।

কবে কোন্ শুভ মুহূর্তে কবিগুরুর হৃদয়ের প্রেম-শতদলে কবিতাসুন্দরী আবির্ভূতা হইয়া উষার অরুণরেখায় পূর্বভাগে গৌড়দেশে উপনীত হইয়াছিলেন—কবে নট-গুরু ভরতের শতপুত্রেরা ভারতী, সাত্বতী ও আরভটী বৃত্তিমূলক নাট্যশাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন—কবে দেবগুরু বৃহস্পতি কৈশিকীবৃত্তি প্রবর্তন করায় প্রজাপতি অপ্সরাদের সৃষ্টি করেন—আবার কবে বীণাপাণির করুণাদৃষ্টিতে নাটক শ্রাব্য ও দৃশ্যাকারে পরিণত হইয়াছিল—তাহা কালের রহস্যময় তিমিরাবরণে অবগুণ্ঠিত। তবে নাটকের সংজ্ঞা প্রাচীন ভারত বুঝিতেন—

ভরতের শত পুত্রেরা ভারতী, সাত্বতী ও আরভটী-মূলক নাট্যশাস্ত্র প্রচার করেন; বৃহস্পতি কৈশিকী বৃত্তির প্রবর্তক; অপ্সরাদের সৃষ্টি

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধি-সমন্বিতম্।
সুখদুঃখ-সমুদ্ভূত-নানারস-নিরন্তরম্॥
প্রত্যক্ষ-নেতৃচরিতো রসভাব-সমুজ্জ্বলঃ।
ভবেদ্‌গূঢ়শব্দার্থঃ ক্ষুদ্রচূর্ণকসংযুতঃ॥"

নাটকের সংজ্ঞা

পঞ্চসন্ধি-সমন্বিত সুখদুঃখ-সমুদ্ভূত নানারসের অবিরাম প্রবাহ নাটক বলিয়া খ্যাত। রসভাব-সমুজ্জ্বল প্রত্যেক নায়কচরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া ইহার গতি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা ও গূঢ় অর্থ-বিশিষ্ট শব্দ-নৈপুণ্যও নাটকের অঙ্গ।

পঞ্চসন্ধি কি? মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ এবং উপসংহৃতি বা নির্বহণসন্ধি। নাটক যেমন পঞ্চসন্ধি-সমন্বিত—তাহার আখ্যানবস্তুরও তেমনি পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি আছে। সে পাঁচটি

নাটকের পঞ্চসন্ধি ও আখ্যানবস্তুর পঞ্চপ্রকৃতি

কি? বীজং বিন্দুঃ পতাকা চ প্রকরী কার্য্যমেব চ। অর্থাৎ বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য।

সন্ধি অর্থে মিলন অর্থাৎ যেখানে নাটকীয় আখ্যানবস্তু নাটকের লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিয়া চলে।

রসের অভিব্যক্তির জন্য পঞ্চসন্ধি ও পঞ্চপ্রকৃতির বিন্যাস

আখ্যানবস্তুর বিন্যাসের সহিত প্রতিপাদ্য বিষয় সম্মিলিতভাবে রাখিবার জন্যই এই মিলনের প্রয়োজন। এই সব অঙ্গের মূল লক্ষ্য রসের বিকাশ। সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা বলেন, "রসব্যক্তিমপেক্ষ্যৈষামঙ্গানাং সন্নিবেশনম্।" এই সকল অঙ্গের সন্নিবেশ রসের অভিব্যক্তির জন্য। কিন্তু রসের আতিশয্য বাঞ্ছনীয় নহে—ধনিকের মতে তাহা দোষযুক্ত। মূল আখ্যানবস্তু ও রস যাহাতে পরস্পর অক্ষুণ্ণ থাকে, নাটকরচয়িতার তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি থাকা দরকার।

আখ্যানবস্তুর পঞ্চপ্রকৃতির ব্যাখ্যা

আখ্যানবস্তুর যেখানে নাটকীয় ঘটনার সূচনা করে তাহাই বীজ। মূল প্রসঙ্গের সহিত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের যোগসূত্রের নাম বিন্দু। নাটকীয় আখ্যানবস্তুর ব্যাপক-চরিত্র পতাকা এবং স্থানগত সীমাবদ্ধ চরিত্র প্রকরী। ঈপ্সিত সাধনীয় বস্তুর সিদ্ধিতে যাহা সমাপ্ত হয়—তাহাই কার্য।

শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "শকুন্তলা ও নাট্যকলা"য় বলিয়াছেন, "এই পঞ্চসন্ধি নাটকীয় রস বা গল্প-বিকাশের পাঁচটি স্তর মাত্র।

সংস্কৃত নাটকের অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ

প্রথম স্তরে বীজবপন ও ঘটনার উৎপত্তি, দ্বিতীয়ে বিষয়ান্তর-সূচনা ও প্রতিকূল অবতারণা, তৃতীয়ে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ, চতুর্থে বিঘ্ন-সমাগম ও অতিক্রম, পঞ্চমে পরিণাম-ফল।" প্রাচীন

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে নাটককে পাঁচ হইতে দশ অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং নাট্যকার নিজের সুবিধানুযায়ী পঞ্চসন্ধির সংযোগ বিধান করিবেন। কিন্তু অঙ্কবিভাগে বিধিনিষেধও যথেষ্ট আছে। একটি অঙ্কে একদিনের অপেক্ষা অধিক সময়ব্যাপী ঘটনা থাকিবে না, নৈশ ঘটনার বিষয় না থাকাই কর্তব্য। দুইটি অঙ্কের মধ্যে এক বৎসরের বেশী ব্যবধান থাকিবে না। যদি বর্ণিত ঘটনায় দীর্ঘকাল ব্যবধানের কথা থাকে, তবে নাট্যকার ঐ দীর্ঘকালকে এক বর্ষ বা তদপেক্ষা ন্যূন সময়ের ন্যায় কল্পনা করিয়া লইবেন।

রস ও রসদ্বন্দ্বে নাটকের স্ফূর্তি

ভারতে নাটকের স্ফূর্তি—রসে ওরসদ্বন্দ্বে। রসবস্তুর নয়টি বিভাগ আছে—(১) আদি বা শৃঙ্গার (২) বীর (৩) করুণ (৪) রৌদ্র (৫) অদ্ভুত (৬) ভয়ানক (৭) বীভৎস (৮) হাস্য (৯) শান্ত। এই সকল রসই স্বতন্ত্র বর্ণবিশিষ্ট, কেহ শ্যাম, কেহ পীত, কেহ রক্ত, কেহ শ্বেত ইত্যাদি। আবার এক একটি রসের বিরোধী এক ও একাধিক রস আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আদিরসের বিরোধী বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—আবার বীর রসের বিরোধী ভয়ানক ও শান্ত। করুণ রসের বিরোধী আদি ও হাস্য। আমাদের প্রাচীন নাট্যকলায় ঘটনার ভিতর দিয়া রসদ্বন্দ্বে একটি বিশেষ লক্ষ্যীভূত রসের পূর্ণ বিকাশ থাকিত। যে মূল রসটি নাট্যকারের বিষয়বস্তুর প্রাণ সেই বর্ণবিশিষ্ট যবনিকা রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে আলম্বিত হইত।

এই সব নাটকীয় আকার গঠন ও বিধিনিষেধ সকলেই পূরাপূরি মানিয়া চলিতে পারেন নাই—তবে মূল প্রকৃতি সকলেই বজায়

রাখিয়া চলিয়াছেন। এক এক যুগে এক এক রসের প্রাধান্য। বিরোধী রসের দ্বন্দ্বে মূল রসের স্ফূর্তি হইয়াছে। বৈষ্ণবযুগের নাট্যসাহিত্যে এবং মহানাটক ও যাত্রাদিতে আকারগত পরিবর্তন এবং তাহার উন্নতি ও অবনতি বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

পুরাপুরি বিধিনিষেধ না মানিলেও মূলপ্রকৃতি বজায় আছে

কবি বা নাট্যকার কোনও বাঁধাধরা আইনের ভিতর তাঁহার কবিপ্রতিভা বিকাশ করেন না। কবি বাঁধা পড়েন তাঁহার আপনার আইনের কাছে। তাঁহার অন্তরে যে সুর থাকে—যে সুরের ছন্দে ছন্দে তালে তালে ভাবকে রূপ দিয়া তাহাকে বিচিত্র ঝঙ্কারে প্রকাশ করেন, সে সুরের নিকট কবি আপনিই বাঁধা পড়েন—কবি স্বয়ং সে শৃঙ্খলকে বরণ করিয়া নিগড়বদ্ধ হন। সে নিগড় সৌন্দর্যের নূপুর—বিভিন্ন রসের ভঙ্গীতে প্রাণের মাদকতায় কল্পনার নৃত্যে মধুর ধ্বনিতে তাহা বাজিতে থাকে। আলঙ্কারিকেরা কবির সেই মুক্ত অবিচ্ছিন্ন গতিকে পরিমাপ করিয়া একটা নিয়ম বাঁধিয়া তোলেন। তাই অন্তরের ভিতর যে সুর যে ভঙ্গী প্রতিভায় কিরণে ফুটিয়া উঠে তাহা নিবিড় অন্তরতম অনন্ত রস-সমুদ্রেরই তরঙ্গ-ভঙ্গ। কবির মন যখন তাহার উদ্বেল উত্তাল তরঙ্গে নাচিতে থাকে, তখন কত সুর কত রূপ কত অনুভূতিই কল্পনাস্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিকীর্ণ হয়। ইহাই কবির যাদুকরের দণ্ড—কবি-প্রতিভার সৃষ্টিচাতুর্য। বহির্জগতে নিরবধি কালের বক্ষে এই কবি-সৃষ্টির গতি অব্যাহত

কবি বা নাট্যকার কোনও বাঁধাধরা আইন মানিয়া চলেন না, শুধু নিজের আইনে বাঁধা থাকেন

কবির যাদুকরের দণ্ড ও কবি-সৃষ্টির গতি কালবক্ষে অব্যাহত

অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে। কোনও দেশ কাল পাত্র ইহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। অসীম অনন্ত শক্তিতে ইহা সদাই প্রাণবন্ত। পরিদৃশ্যমান জগতের মত যুগে যুগে ইহার বাহ্য আকারের রূপান্তর ঘটে—নবীন রূপে নবীন ভাবে নবীন ছন্দে সেই "রস" আত্মপ্রকাশ করে। এই রসই সকলের মূলে, সকলের প্রাণাধার—সকলের প্রাণশক্তি। এই রসই প্রকৃত জীবন। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ভারতের মনস্বীরা তাই রস-সৃষ্টি বা রসের বিকাশকেই জীবনের সকল কাজেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

যুগে যুগে বাহ্য আকারের রূপান্তর ঘটে

পাশ্চাত্ত্য দেশেও এই রসই ঘটনা-নিচয়ের প্রাণ—ঘাত-প্রতিঘাতে ইহার বিকাশ—প্রত্যেক গতিতে ইহা উচ্ছ্বসিত। কিন্তু বহির্জগৎ বিশ্লেষণকারী জ্ঞানপিপাসু পাশ্চাত্ত্য জাতির বৈজ্ঞানিকচিত্তে বাহিরের ঘটনাবলী ও তাহার ঘাতপ্রতিঘাত এবং গতিই মুখ্য হইয়া আছে। রস সেখানে গৌণ, মুখ্য নহে। তাঁহারা আকার গঠনের সৌষ্ঠবে এবং বাহ্য পারিপাট্যের সৌন্দর্যে আত্মহারা, মুক্ত ছন্দের লীলায়িত গতিভঙ্গীতে মনস্তত্ত্বের স্তরে স্তরে—লাবণ্য-মাধুরীকে টানিয়া আনিলে—যুক্তি বিজ্ঞান কলাকৌশলের পরিচ্ছদে তাহার মহনীয় সুষমা ফুটিয়া উঠে। সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বিকাশই পাশ্চাত্ত্যের লক্ষ্য।

পাশ্চাত্ত্যে রসই ঘটনার প্রাণ, কিন্তু রস গৌণ, ঘটনা মুখ্য

গ্রীক দর্শনের আদিগুরু প্লেটো যখন এইডসকে (Eidos) গণিত ও চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া দার্শনিক সংজ্ঞায় পরিণতি করেন, তখন শব্দটির অর্থ ছিল মানুষের অন্তরস্থিত আদর্শের বিবিধ ঘটনাসঞ্জাত অভিজ্ঞতালব্ধ বিচার-শূন্য বিশ্বাস এবং স্বাভাবিক

প্লেটোর Eidos

যুক্তি বিচারসিদ্ধান্তে মীমাংসিত জ্ঞান। এই আদর্শই অন্তর বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ (real essence) অর্থাৎ সার পদার্থ। প্লেটোর গুরু সক্রেটিস প্রচার করিয়াছিলেন যে সৌন্দর্য কোনও পদার্থ বা বস্তু নয়। সুন্দর বস্তুতে সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকিলেও সুন্দর বস্তুকেই সৌন্দর্য বলা যায় না। তিনি বুঝাইয়াছেন যে শিল্পীর অন্তরতম আদর্শই কল্যাণময় রূপ—সেই রূপ উচ্ছ্বসিত হয় তাঁর রচনায়। বস্তু-তত্ত্বজ্ঞের নিকট সেই পরম রূপ প্রকাশ পায় বর্ণ ও নামের ভিতর দিয়া—এই পরম রূপই আদর্শ রূপ। প্লেটো বলেন যে ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—শুধু মননের দ্বারা লভ্য। ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় মন যত ঊর্ধে উঠিবে ততই এই পরমরূপ মানস চক্ষে উদিত হইবে। ইহা "কালন আউটো কাথ আউটো" অর্থাৎ স্ব স্বরূপ সৌন্দর্য। ইহা শিবস্বরূপ, সত্যস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ। বিশ্বকর্মা এই পরম রূপের আদর্শেই এই বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মতকে কেহ কেহ বলেন idealism বা আদর্শ-বাদ, আবার কেহ কেহ বলেন conceptual realism বা ধারণামূলক বাস্তব-বাদ।

সক্রেটিসের মতে শিল্পীর আদর্শ ই কল্যাণময় রূপ ; রচনায় তাহা উচ্ছ্বসিত হয়

প্লেটোর পরমরূপ "কালন আউটো কাথ আউটো" (kalon auto kath auto)

ধারণামূলক বাস্তব-বাদ

আরিস্টোটল-ই বাস্তবিক পক্ষে আদর্শ-বাদের প্রচারক। তিনি বলেন প্লেটোর এই "এডস্" পরমরূপটি পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। আরিস্টোটলের অলঙ্কার গ্রন্থ—তাঁহার মূল সূত্রগুলি বহুকাল পর্যন্ত প্রতীচ্য জগতের সাহিত্য ও চিন্তাশক্তিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং এখনও পর্যন্ত করিতেছে। অলঙ্কার

আরিস্টোটলিও আদর্শ-বাদ

শাস্ত্রে তাঁহার স্থান সর্বোচ্চে। তিনি নাট্যশাস্ত্রের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য জগতে আরিষ্টোটলের সূত্রগুলি ভরত-নাট্যশাস্ত্রের মতই সমাদৃত এবং নাট্যসাহিত্যের নির্দেশক। আরিষ্টোটলের আবির্ভাবকালে গ্রীক নাট্যসাহিত্য উন্নতির চরম সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। গ্রীক নাট্যসাহিত্যে আদিগুরু Arian এবং Phrynichus-এর প্রবর্তিত পথে Æschylus, Sophocles এবং Euripides অনুগমন করিয়া বিয়োগান্ত নাটকগুলির আদর্শ রূপ এবং পরম সৌন্দর্য বিকাশ করিয়াছিলেন। বিশ্লেষণ-মূলক সমালোচনায় আরিষ্টোটল নাট্যসাহিত্যের সূত্রগুলি গ্রথিত করেন। তাঁহার প্রধান সূত্র দেশ কাল ও ঘটনার ঐক্য। তিনি বিয়োগান্ত নাটকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন—মিলনান্ত নাটকের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল না।

আরিষ্টোটলের নাট্য-শাস্ত্র

রোমদেশে হোরেসের নাট্যসূত্র

আরিষ্টোটল হইতে কয়েক শতাব্দী পরে রোম দেশে হোরেসের আবির্ভাব হয়। খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪ অব্দে আরিষ্টোটল জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রীঃ পূঃ ৬৫ কিংবা ৬৮ অব্দে হোরেস আবির্ভূত হন। আরিষ্টোটলের মত তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, অপরিমেয় জ্ঞান, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, সৌন্দর্যানুভূতি এবং হৃদয়ের উদারতা ও কল্পনার আবেগ ছিল না। তিনি শুধু ঘটনা বিচার করিয়া একটা মত প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। তিনি বলিলেন,—"কি কাব্যে কি নাটকে চরিত্রগুলি জাতিগত আদর্শের (type) অনুযায়ী হইবে এবং যাহা দৃশ্যের পশ্চাতে সংসাধিত হইতে পারে তাহা রঙ্গমঞ্চে দেখাইবার প্রয়োজন নাই। নাটকে পাঁচটি অঙ্ক-বিভাগ করিতেই হইবে—ইহার কম বা

বেশী করিলে চলিবে না।” কিছুদিন হোরেসের নিয়মানুসারে রোমক নাট্যসাহিত্য রচিত হইতে লাগিল। তাঁহার পূর্বে Eunius, Pacuvius, Accius, Seneca এবং Terence-এর নাটকগুলি ইউরোপে যশঃসৌরভ বিকিরণ করিয়াছিল।

মধ্যযুগে রোমক নাট্যসম্প্রদায় বিবিধ স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত—খ্রীষ্টান পাদরীরা তাঁহাদের আদর্শে খ্রীষ্টোৎসবে ধর্মমূলক নাটক-রচনার প্রবর্তন করিলেন। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে Prynne-এর Histrio-mastix-এ ঐ জাতীয় বহু নাটকের অংশ-বিশেষ সংকলিত হইয়াছে। Seneca ও Terence-এর নাট্যসাহিত্যের আদর্শে ইহাদের অধিকাংশই রচিত। এই সব নাটক কতকটা কাব্যের মত আবৃত্তি করা হইত।

মধ্যযুগে ভ্রমণকারী রোমক নাট্যসম্প্রদায় ও খ্রীষ্টান পাদরী

মধ্যযুগের লোকেরা মনে করিত নাটককে কাব্যের মত শুধু আবৃত্তি করিতে হয়—রচয়িতা কিংবা তাঁহার বন্ধুবান্ধব কোনও উচ্চ পীঠে দাঁড়াইয়া আবৃত্তি করিতেন। নাটক তখন আখ্যান-মূলক কবিতায় পরিণত হইয়াছিল। উচ্চ আদর্শ ও দৃঢ়সংকল্প চরিত্র-ঘটিত রচনা “ট্রাজেডি” এবং সাধারণ চরিত্র-মূলক রচনা “কমেডি” সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীয়ান কবি দান্তে বলিয়াছেন দুর্দশামূলক ঘটনায় আরম্ভ হইয়া আখ্যান-বস্তুর সুখময় পরিণতি ঘটিলে তাহা “কমেডি”—টেরেন্সের মিলনান্ত নাটকে যেমন দেখা যায়। দান্তে তাঁহার কাব্যে প্রথমে নরকের বীভৎস দৃশ্যের বর্ণনা করিয়া পরে আনন্দ-লোক স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থের নাম দিয়াছিলেন

মধ্যযুগে কাব্যের মত নাটকের আবৃত্তি

মধ্যযুগের ট্রাজেডি ও কমেডি

"La Divina Commedia"। এই মধ্যযুগের পরে পুনরুত্থান যুগের আগমন এবং ক্লাসিক সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়। যাহা কিছু পুরাতন যাহা কিছু গ্রীক ও ল্যাটিনে রচিত তাহাই আদর্শ। এমন কি ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে Vida তাঁহার "De arte poetica"-য় স্পষ্টই লিখিলেন, "প্রাচীনদের অনুসরণ কর," "নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করিও না", সর্বোপরি "Seneca-র মত পাঁচ অঙ্ক বিভাগ এবং দেশ, কাল ও কার্যের ঐক্য রাখিও।"

নব ক্লাসিকে সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়

কিন্তু নব ক্লাসিক-যুগে পুরাতন ক্লাসিক পরিপূর্ণভাবে আসিল না—আসিতে পারে না। কেননা মধ্যযুগের সঞ্চারিত ভাবরাশি সহ পবিত্রতামূলক রুচির প্রচারে (Puritanism) ক্লাসিক সাহিত্যে এক নূতন নীতিবাদ সংযুক্ত হইল। আরিস্টোটলের দার্শনিক সূত্রগুলি নবভাবে ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল।

ক্লাসিক সাহিত্যে Puritanism

এই নব ক্লাসিকের আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইল ইটালী ও ফ্রান্স। Molliere, Hedelin, Cornelie, Racina, Rapina, Boileau এবং Saint Evremond এই নব ক্লাসিক নাট্য তরঙ্গের শুভ্রশিরে সমাসীন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার তরঙ্গ ইংলণ্ডের তটে আঘাত করিল।

আন্দোলনের কেন্দ্র ফ্রান্স ও ইটালী

ইংলণ্ডে টমাস রাইমার হইলেন এই নব ক্লাসিক আন্দোলনের সর্বপ্রধান পুরোহিত। তিনি তাঁহার রচিত "The Tragedies of the last days considered" এবং "A short view of Tragedy" প্রভৃতি গ্রন্থে এই নূতন মতবাদ প্রচার করিলেন। সেক্সপীয়রের ইয়াগো চরিত্র রাইমারের নিকট অসম্ভব। কারণ তাঁহার মতে সৈনিক

ইংলণ্ডে টমাস রাইমার

মাত্রেই সৎ এবং এই জাতীয় লোকের নিকট মানুষ মাত্রেরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু ড্রাইডেন এই নব ক্লাসিকের গতিরোধ করিতে দাঁড়াইলেন।

বেকনের স্বাধীন যুক্তিবাদে স্বাধীন চিন্তার প্রতিষ্ঠা

ষোড়শ শতাব্দীতে বেকনের স্বাধীন যুক্তিবাদ এক নূতন বিপ্লবের সূত্রপাত করিয়াছিল। তাঁহার পূর্বতন দার্শনিকেরা আরিস্টোটলের আদর্শবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে সকল তত্ত্বব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে সূক্ষ্মতর আকারে আবিষ্কার করা এবং পবিত্রতা, অভ্যাস ও শিক্ষাসহায়ে মানবের মনোবৃত্তিগুলিকে উচ্চস্তরে আরূঢ় করাইয়া পরমশিব ও পরমসুন্দরের অভিমুখী করা। তাঁহারা মনে করিতেন যে পরিদৃশ্যমান জগৎকে এইভাবে নিরীক্ষণ ও সন্ধান করাই উদ্দেশ্য-লাভের সোপান। এইরূপ উচ্চতম আদর্শমূলক জ্ঞানরাজ্যে মনকে উন্নত করিতে পারিলেই ব্যক্তিগত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি হইবে এবং সামাজিক হিতকল্পে মানবের জীবন নিয়োজিত হইতে পারিবে। কিন্তু মনস্বী বেকনের দার্শনিক দৃষ্টি সম্পূর্ণ নূতন পথে পতিত হইল। তিনি প্রচার করিলেন যে মানবজাতির সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য সকল প্রকার বিচারমূলক যুক্তি ও শক্তিসমূহকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। আমাদের সর্বদা লক্ষ্য থাকা উচিত কিসে মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা ও দুর্দশার লাঘব হয়, কিসে ইহলোকে মনুষ্যজীবনে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় ও কিসে মানবের এই অসম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী জীবনে ভোগসুখের পরিসর বিস্তৃত করা যায় এবং সর্বোপরি প্রকৃতির উপর মানবের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে।

নব ক্লাসিকদলের পুনরুত্থান-যুগে ক্লাসিক সাহিত্য ও আদর্শের সন্ধানে যে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হইয়াছিল, তাহার ফলে সংস্কার-যুগের সৃষ্টি হয়। পোপের অধীনতা বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আদর্শ, ভাব এবং প্রাচীনতার মোহ অনেকটা কাটিয়া গেল। এই যুগেই Dryden তাঁহার সুবিখ্যাত "Essay of Dramatic Poesy"-তে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিলেন, "আরিস্টোটল বলিয়াছেন বলিয়াই যে মানিতে হইবে এমন কি কথা? Sophocles এবং Euripides হইতে আদর্শ লইয়া তিনি বিচার করিয়াছেন—তিনি আমাদের দেশের নাটকাবলী দেখেন নাই—তাহা হইলে তাঁহার মত পরিবর্তিত হইত।"

স্বাধীন চিন্তার আদর্শবাদের মোহ ত্যাগ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নব ক্লাসিক আদর্শকে ফ্রান্সে ভল্‌টেয়ার এবং ইংলণ্ডে অ্যাডিসন আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলেন, কিন্তু সর্বত্র তখন নূতন স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হইয়াছে—সেক্সপীয়র তখন সকলের আদরের জিনিস। লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চসমূহে সেক্সপীয়রের নাটকগুলি মহাসমারোহে অভিনীত হইতে লাগিল। এলিজাবেথ যুগের সেক্সপীয়র, বেন জনসন্, বোমণ্ট ফ্লেচার, মাসিঞ্জার প্রভৃতি নাট্যকারগণের নাটকাবলী সর্বত্র অভিনীত ও আলোচিত হইতে লাগিল; তাঁহারা প্রত্যেকেই গ্রীক ও রোমক নাট্যসূত্র উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, কিন্তু সমালোচকেরা তাহাতে নিন্দা না করিয়া "স্বাভাবিক" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে পুরাতন জিনিসের অপেক্ষা লোকে "স্বাভাবিকতা"কে শ্রেষ্ঠ স্থান দিত। ইংলণ্ডে এই স্বাভাবিকতাবাদ সাহিত্যে প্রত্যক্ষ ভাবে স্থান পাইল, কিন্তু

অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাভাবিক বাদ

তাহার সঙ্গে আসিল ভাবপ্রবণতা। আত্মসংবিৎ বা জাতীয় চেতনা হইতে ইহার উদ্ভব। ফ্রান্সে ডিডোরিও এই মতকে সাদরে বরণ করিলেন এবং লেসিং তাঁহার **Hamburgische Dramaturgie**তে সেক্সপীয়র ও আধুনিক নাটকগুলির সহিত আরিস্টোটলের নাট্যসূত্রের একটা যোগাযোগ করিতে প্রয়াসী হইলেন।

নব রোমান্টিক আন্দোলনে melodrama-র উৎপত্তি

এই সময়ে নব রোমান্টিক আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয়। ইহার ফলে **Melodrama**-র উৎপত্তি। রঙ্গালয়ে তখন হৃদ্‌কম্পনকারী দৃশ্য ও সংস্থানের সন্ধানে লোকে যাইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সেক্সপীয়রের নাটকগুলিই সর্বোপরি স্থান পাইল—সর্বত্রই তাহার আন্দোলন, আলোচনা ও অভিনয়। ভারতে বিশেষতঃ বাংলা-

ভারতে সেক্সপীয়রের প্রচার

দেশেও সেক্সপীয়রের নাটকাবলী শিক্ষিত ভারতবাসীর আদরের সামগ্রী—নাট্যকলার উচ্চতর আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইল। কবি হেমচন্দ্র সেক্সপীয়রকে লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছেন, "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।" কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিত বাঙ্গালী বুঝিল কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন নাট্যকারেরা নাট্য-প্রতিভায় কোন অংশে ন্যূন নহেন। বিশেষভাবে কালিদাস—কালিদাসের শকুন্তলা পড়িয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। কবিশ্রেষ্ঠ গ্যেটে শকুন্তলার স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করিলেন।

গিরিশচন্দ্র যখন নাট্যক্ষেত্রে আসিলেন তখন দেখিলেন ভারতে সে প্রাচীন যুগ নাই। সে যুগ নাই—যখন "অভিরূপ

ভূয়িষ্ঠা পরিষৎ" নটের প্রয়োগ-বিজ্ঞানকৌশল দেখিয়া মতামত প্রকাশ করিবেন কিংবা সে রাজপ্রাসাদ রাজসভাও নাই, সে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতাও নাই, সেই কাব্যরসিক পণ্ডিত-পরিষদ্‌ও নাই যখন নাটককার গর্বের সহিত বলিতে পারিতেন যে

গিরিশের সময় নাট্য-ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগের অভাব

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্‌।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

সকল পুরাতন কাব্য ভাল নয়—নূতন কাব্য বলিয়া তাহা নিন্দনীয় নয়। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া ভালমন্দ ঠিক করেন এবং অজ্ঞান ব্যক্তিরা পরের কথানুসারে বুদ্ধির চালনা করে।

দেশ-কাল-পাত্রানুসারে সময়ের পরিবর্তন ঘটে। প্রাচীন ভারতের সে সমাজ, সে স্বাধীনতা নাই—বৈষ্ণবযুগের সে ধর্মোন্মত্ততাও নাই, আছে শুধু প্রাচীন রসধারার শীর্ণ প্রবাহ। বাংলার জাতীয় জীবনে বিদেশীর সংস্পর্শে ঘোর দ্বন্দ্ব-সন্দেহে জাতি দোদুল্যমান। তাই ধীরে ধীরে গিরিশচন্দ্র সংকল্প করিলেন যে রঙ্গালয়কে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে স্থাপিত করিয়া নাটকে প্রাচীন রসধারার সহিত বর্ত্তমান ঘটনাবহুল জীবনের সমন্বয় ঘটাইবেন। গিরিশচন্দ্রের চরিত্রও দ্বন্দ্ব ভাবে গঠিত। তিনি একদিকে বাস্তববাদী অপরদিকে আদর্শবাদী—ইহাই তাঁহার চরিত্রের ও রচনার বিশেষত্ব। তিনি তাঁহার নাটকে যে সব চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—তাহা ঘসিয়া মাজিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া দেখান নাই—তাহা বাস্তব জীবনের জীবন্ত চরিত্র।

রঙ্গালয়কে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে স্থাপন করিতে গিরিশের সংকল্প

গিরিশের চরিত্রে আদর্শ ও বাস্তব-বাদের দ্বন্দ্ব

তাঁহার পূর্বগামী দীনবন্ধুর সহিত তিনি এই বিষয়ে তুলনীয়। দীনবন্ধু সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র প্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন। সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়া তিনি তাঁহাকে আদর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর আদর্শের এমনই বল যে, সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না; তোরাপের সৃষ্টিকালে, তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আদুরীর সৃষ্টিকালে, আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে তাহা বাদ দিতে পারিতেন না; নিমচাঁদ গড়িবার সঙ্গে নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অন্য কবি হইলে সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত;—বলিত 'তুমি আমাকে তোরাপের বা আদুরীর বা নিমচাঁদের স্বভাব-চরিত্র বুঝাইয়া দাও—কিন্তু ভাষা আমার পছন্দমত হইবে—ভাষা তোমার কাছে লইব না।' কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না, সহানুভূতির সঙ্গে কোনরূপ আপোষ করেন। সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, 'আমার হুকুম—সবটুকু লইতে হইবে—সায় ভাষা। দেখিতেছ না যে তোরাপের ভাষা ছাড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না; আদুরীর ভাষা ছাড়িলে, আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না। নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না? সবটুকু দিতে হবে।' তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা

নাটকীয় চরিত্রের অনুযায়ী ভাষা

আতুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।" লোকচরিত্রে সহানুভূতিই নাট্যকারের বিশেষ গুণ। গিরিশচন্দ্রের ইহা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল।

গিরিশচন্দ্র বাস্তববাদী—তাই তিনি "সপ্তমীতে বিসর্জন" "সভ্যতার পাণ্ডা" লিখিতে সঙ্কুচিত হন নাই—কিন্তু তাঁহার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে তাঁহাকে আদর্শবাদী বলিয়াই বোধ হয়। তিনি জীবনে "পরম সুন্দর", "পরম প্রেম" ও "পরম মঙ্গলে"র উপাসক ছিলেন। তাঁহার নাটকীয় চরিত্রে এই আদর্শ ও বাস্তববাদের সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণ দেখা যায়।

গিরিশ বাস্তব ও আদর্শবাদের সংমিশ্রণে গঠিত

হিন্দুর জীবনেও এই দুইটি মিশাইয়া জড়াইয়া আছে। আমরা একদিকে লেখাপড়া শিখিয়া অর্থার্জন করিয়া ছেলেপিলে মানুষ করি, স্বামি-স্ত্রীর যথারীতি কর্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করি, পাড়াপড়সীর সুখদুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করি, আবার ঘরে বিগ্রহের সেবার জন্য ফুল চয়ন করি, তুলসী-বিল্বপত্র সংগ্রহে রত থাকি, চন্দন ঘষি, ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে পূজা দেখি ও প্রসাদ পাই। একদিকে চাষা চাষ করে, মজুর গলদ্‌ঘর্ম হইয়া সারাদিন খাটিয়া দুই পয়সা রোজগার করে, আবার সন্ধ্যাকালে তুলসীতলায় মৃদঙ্গ-করতালি লইয়া হরিনামে উন্মত্ত হয়। গিরিশচন্দ্রের জীবনেও এই দুই ভাবের সংমিশ্রণ ছিল। তাই গিরিশচন্দ্র খাঁটি হিন্দু—খাঁটি বাঙালী চরিত্র আঁকিয়াছেন।

বাস্তব ও আদর্শবাদ উভয়ের সংমিশ্রণে হিন্দুর জীবন

পুরাণ-বর্ণিত লোকোত্তর মহাপুরুষ, বা অবতার-চরিত্র, দেবদেবী-চরিত্র যাহা তিনি আঁকিয়াছেন, তাহাতে

পৌরাণিক চরিত্রে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় বিকৃত রূপ ঘটান নাই

তাঁহার মনগড়া উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা ছিল না, পাশ্চাত্ত্যের ভাব-ধারায় তিনি তাহাদের বিকৃত রূপ ঘটান নাই, চরিত্রগুলিকে কৃত্রিমতার পোষাক পরাইয়া যন্ত্রবৎ চালিত করেন নাই। তবে কি অনুবৃত্তিতেই তাঁহার চাতুর্য ছিল? নাট্যকারের যে প্রধান গুণ—সৃষ্টি-কৌশল—তাহা কি তাঁহার ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। তাঁহার অঙ্কিত পৌরাণিক চরিত্রগুলি জীবন্ত, প্রাণবন্ত—রসমাধুর্যে পরিপুরিত। পরলোকগত মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় আমরা বলিব, "একখণ্ড কয়লার মধ্যে সূর্যের আলোক ত প্রবেশই করিতে পারে—কিন্তু একখণ্ড স্ফটিকে শুদ্ধ যে সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে এমন নয়, আবার স্ফাটিক্যগুণে সেই কিরণ সহস্র বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া সূর্যের মহিমা ও স্ফটিকের স্বচ্ছতা প্রচার করে। শ্রীযুত গিরিশবাবুর কল্পনা সেই স্ফটিকখণ্ড—এবং তাঁহার অভিমন্যু-বধ ও রাবণ-বধ প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতিফলিত রশ্মিপুঞ্জ।"

গিরিশ সম্বন্ধে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গিরিশচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে নাটক-রচনায় ব্রতী হন। ইংরাজী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার "আগমনী", "অকাল বোধন" ও "দোললীলা" রচিত হয়। এই তিনটিই গীতিবহুল ক্ষুদ্র গীতিনাট্য বা "নাট্যরাসক।" এই সঙ্গীতগুলির ভিতর গিরিশচন্দ্রের অসামান্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার "আগমনী"র গানগুলি ভিখারীরা রাজপথে ও ঘরে ঘরে গাহিয়া বেড়াইয়াছে এবং ঘরে ঘরে বাঙালী তাহা শুনিয়া আত্মহারা হইয়া সে গান শিখিয়াছে। তাঁহার "আগমনী"তে ঠিক নাটকীয় ভাষা ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা কতকটা

গিরিশের আগমনীতে সঙ্গীতের কৃতিত্ব

পূর্বগামী দীনবন্ধুর ভাষার মত। নমুনাস্বরূপ এখানে দুই ছত্র তুলিয়া দেখাইব। "দেখ, রজনী গভীরা, প্রকৃতি তিমির-বসনে আবৃতা, এ সময়ে সেই যোগিনী-পরিবেষ্টিতা ভয়ঙ্করী কৈলাসপুরীতে কেমন ক'রে গমন করি।" কিংবা "লতিকার ক্রোড় হ'তে প্রফুল্ল কুসুমটিকে ছিন্ন ক'রে ল'য়ে যায়, লতা নীরবে রোদন করে।" "আগমনী"তে উমার একটি মাত্র উক্তি যথার্থ নাটকীয় উক্তি—অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। যখন গিরিরাজ ভাবভরে গাহিতেছেন—

দীনবন্ধুর আদর্শে নাটকীয় ভাষা

"আমার উমা এল রে, দেখ গো রাণী নয়ন ভ'রে।
দশভুজ ধরি আহা মরি মরি
বিহরে সিংহ উপরে।"

মেনকা বলিতেছেন, "মহারাজ, উমা আমার কই? উমা আমার ত দশভুজা নয়—তবে কি আমার স্বপ্ন সত্য হ'ল?" উমা প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মা! মা! আমি ত দশভুজা নই, আমি তোমার উমা।" "আমি তোমার উমা"—এই কথায় গিরিশচন্দ্র মানবলীলার একটা অপূর্ব ভাব দেখাইয়াছেন—"আমি তোমার উমা"—এই দেবমানব-ভাবে বাঙালীর ঘরে ঘরে উমা স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। ইহা গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় তুলিস্পর্শ। তাঁহার "অকাল বোধন" নাট্যরাসকের অন্তর্গত —ইহাও আগমনীর মত গীতসমষ্টি। ইহার প্রায় ছয় মাস পরে "দোললীলা" অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে রচিত।

উমার মানবত্ব

অকাল বোধন ও দোললীলা

ইহাও গীতিনাট্য—হোলির গান। "আগমনী" ও "অকাল বোধন" অপেক্ষা ইহাতে নাটকীয় সংস্থান ও কথোপকথনের চেষ্টা আছে—তিনি বসন্তোৎসবের অগাধ রসের স্ফূর্তি দেখাইয়াছেন।

"দোললীলা"র পর গিরিশচন্দ্র প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন যে সুশিক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রী গঠিত না হইলে উচ্চাঙ্গের নাটক অভিনীত হওয়া অসম্ভব। তিনি একদিকে বঙ্কিমবাবুর পুস্তকগুলি নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়া রঙ্গমঞ্চে বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন—অপর দিকে সুচতুর মেধাবী অভিনেতা ও অভিনেত্রী বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে একাগ্রমনে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লোক-চরিত্র বুঝিতে তাঁহার যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল—অভিনেতা-অভিনেত্রী-নির্বাচনেও তাঁহার সেই রকম অসামান্য দক্ষতা দেখা যাইত। এখন হইতে গিরিশচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অন্তরের আদর্শমত রঙ্গালয় গড়িবার উদযোগ করিলেন।

গিরিশের অভিনেতা ও অভিনেত্রী-সম্প্রদায়-গঠন ও শিক্ষাদান

গিরিশচন্দ্রের মন একটি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস। নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যাভিনয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে যে ভাবে উৎপন্ন, পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে গিরিশের মনকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঠিক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তাঁহার মন সেইভাবে বিকাশ পাইয়াছে। প্রথমে সঙ্গীতের রসে তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় ও পুষ্টিলাভ করে। এই সঙ্গীত-রচনার শক্তি প্রকাশিত হয় যাত্রার পালা-রচনায়—যাত্রাভিনয়ে—হাফ আখড়াই এবং পাঁচালীর আসরে। সেই

গিরিশের মনে নাট্য-সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাস

শক্তি বর্ধিত হয় অভিনয়ের রসে—অভিনয়-নৈপুণ্যে। তাহার পর সঙ্ঘবদ্ধভাবে সম্প্রদায়-গঠন ও অভিনয়-শিক্ষাদান এবং নাটক-রচনা।

গিরিশের লোকচরিত্রে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রী বাছিয়া লইবার ক্ষমতা

লোকচরিত্রে তাঁহার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার নাটকের চরিত্রগুলি এবং তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আলোচনা করিলে তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম হয়। অভিনেতা ও অভিনেত্রী বাছিয়া লইবারও তাঁহার ক্ষমতা তেমনি অসাধারণ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ নাট্য-কবি কেদারনাথ চৌধুরীর সখের থিয়েটার হইতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ নট অমৃতলাল মিত্রকে বাছিয়া বাহির করেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে অমৃতলাল গুরুগম্ভীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রায় সকল নাটকেই নায়কের ভূমিকায় তাঁহার একাধিপত্য ছিল এবং তিনি তাঁহার সুমিষ্ট, গম্ভীর এবং উচ্চ কণ্ঠস্বর, মনোহর আবৃত্তি ও ভাবভঙ্গীতে দর্শকদিগকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া রাখিতেন। গিরিশচন্দ্র যখন তাঁহাকে প্রথম দেখিলেন তখনই বুঝিলেন যে শিক্ষা দিলে কালে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ নট হইবেন। গিরিশের সে আশা ফলবতী হইয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ নটগণের সমাবেশ ও গিরিশের নির্বাচন-শক্তি

সুপ্রসিদ্ধ নট মহেন্দ্রলাল বসু কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে "সধবার একাদশী" দেখিয়া অভিনয়ের দিকে আকৃষ্ট হন। "লীলাবতী" অভিনয়ে ইনি গিরিশচন্দ্রের নিকট ভূমিকা-প্রার্থী হইয়া আসেন। ইনিও অত্যন্ত প্রতিভাশালী অভিনেতা ছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে তিনি "গুরু" বলিয়া চিরদিন

সম্মান করিয়া আসিয়াছেন। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বা কাপ্তেন বেল হাস্যরসের সুন্দর অভিনেতা। গিরিশ বলেন, "অর্দ্ধেন্দু-বাবুর সহিত বেলবাবুর প্রভেদ এই, অর্দ্ধেন্দুবাবু দর্শকের নিকট অর্দ্ধেন্দুই থাকিতেন এবং দর্শকগণও অর্দ্ধেন্দুবাবুকেই দেখিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু বেলবাবুর অভিনয়ে দর্শকগণ অভিনীত চরিত্রকেই দেখিতেন—বেলবাবুকে দেখিতেন না।" "প্যান্টো-মাইম" অভিনয়ে কাপ্তেন বেল অদ্বিতীয় ছিলেন। 'ক্লাউন' সাজিবার তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। কিন্তু "বিল্বমঙ্গলে" "সাধক", "হারানিধিতে" "অঘোর", "সরলা"য় "গদাধরচন্দ্র" ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় এখন পর্যন্তও অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। যে সকল চরিত্রে শ্লেষ আছে সেগুলির অভিনয়ে অমৃতলাল বসুর অভিনয়-নৈপুণ্য অসাধারণ ছিল। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষকতায় ইঁহাদের অভিনয়-প্রতিভা অধিকতর দীপ্তিশালী হইয়াছে। অভিনেত্রীর মধ্যে বিনোদিনীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার অভিনয়-দর্শনে তৎকালে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সুশিক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রী না থাকিলে উচ্চাঙ্গের নাটকাভিনয় সম্ভবপর হয় না।

গিরিশচন্দ্র সাধারণ নাট্যালয়ের সংস্রবে আসিয়া সর্বপ্রথমে সুশিক্ষিত নটনটী প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুশিক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রী না থাকিলে উচ্চাঙ্গের নাটকাভিনয় সম্ভবপর হয় না। সর্বাগ্রে তিনি খ্যাতনামা সাহিত্যরথীদের পুস্তকগুলি নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে লাগিলেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার নিপুণ শিক্ষকতার দ্বারা নটনটী-সম্প্রদায় গঠিত করিতে লাগিলেন। এই সময়কার কথা স্মরণ করিয়াই অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্রের লিখিত "স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমাদের

সেই সুদূরগত প্রথম নাট্যজীবনের স্বার্থশূন্য Romantic প্রেমের দৃষ্টান্ত জগতে যে অধিক মিলিতে পারে এমন বোধ হয় না। গত বৃহস্পতিবারে আমার একটী প্রায় তিন বৎসরের দৌহিত্রী আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কন্যা আমার সূতিকাগারে পড়িয়া কাঁদিতেছে, আমার বড় কষ্ট; তবু আমি বুঝিতেছি যে, এ শোক সোডা ওয়াটারের তুল্য; কিন্তু বেল, মতি, মহেন্দ্রের শোক সীতাকুণ্ডের ন্যায় চিরদিন তপ্তভাবে ফুটিতে থাকিবে। কতবার ঝগড়া করিয়াছি—সেই ঝগড়ার মধ্যেও কি মধুর মিলনাকাঙ্ক্ষা ছিল!" তৎকালে প্রতিভাশালী নটনটীর নাট্যপ্রতিভা যে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভার প্রতিবিম্ব এ ক্ষেত্রে অমৃত বসু তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"সূর্যদেব আপনি সাবধানে অন্তরে রহিয়া চন্দ্রকে ফুটিতে দিয়াছেন; কিন্তু যে জানে, সে বুঝিতেছে যে, সূর্যের কিরণই চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া এত মনোহর হইয়াছে।" সুতরাং বলিতে হয় গিরিশের প্রতিভা-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া বাংলার নটনটীতে প্রতিফলিত হইয়া অভিনয়-জগৎকে স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল।

নাট্যজীবনের স্বার্থশূন্য Romantic প্রেম

গিরিশের প্রতিভা-রশ্মি বাংলার নটনটীর অভিনয়ে প্রতিফলিত

আমাদের দেশে নটব্যবসায়ীদের সমাজে সম্মান নাই। প্রাচীনকালে ভরত নটের সংজ্ঞা দিয়াছেন—

"নট ইতি ধাত্বর্থভূতং নাটয়তি লোকবৃত্তান্তং।
রসভাবসংযুক্তং যস্মাৎ তস্মাৎ নটো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ রসভাবসংযুক্ত লোকবৃত্তান্ত যাহারা অভিনয় করিয়া দেখায় তাহারাই নট। সেইজন্য নটের সংজ্ঞা—

ভারতে প্রাচীন যুগের নটনটী

অঙ্গবিক্ষেপ-বৈশিষ্ট্যং জনচিত্তানুরঞ্জনম্।
নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা॥

বিশিষ্ট অঙ্গবিক্ষেপে যাহারা জনচিত্তানুরঞ্জনকারী নৃত্য করে তাহারাই নট।

বৌদ্ধযুগে যেখানে অভিনয় হইত তাহাকে সমাজমণ্ডল বলিত এবং অভিনয়কে সমাজ বলিত। অশোকের প্রথম গিরি-অনুশাসনে লিখিত আছে—

প্রভু হিতব্যম্ ন চ সমাজো কটব্যো বহুকং
দোসং সমাজম্ হি পসতি দেবনং পিয়ো পিয়দসি রাজা

"অস্তি পিতু এ কচা সমাজা সাধুমতা দেবানং পিয়স্স।" কালিদাস তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে নাট্যাচার্য গণদাসের মুখে বলিয়াছেন, "কামং খলু সর্ব্বস্যাপি কুলবিদ্যা বহুমতা, ন পুনরস্মাকং নাট্যং প্রতি মিথ্যা গৌরবম্। তথাহি

দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ কান্তং ক্রতুং চাক্ষুষং।
রুদ্রেণেদমুমাকৃতব্যাতিকরে স্বাঙ্গে বিভক্তং দ্বিধা।
ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে।
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধকম্॥

সুতরাং এই সময়ে নাট্যাভিনয়ের বিশেষ সমাদর ও প্রচলন ছিল। এই অভিনয় পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট ছিল—গণদাস বলিতেছেন "ইদানীমেব পঞ্চাঙ্গাভিনয়মুপদিশ্য ময়া বিশ্রম্যতাম্" ইত্যাদি।

অভিনয়ই নাট্যশাস্ত্রের মূল প্রাণ—তাই কালিদাস পরিব্রাজিকা কৌশিকীর মারফত বলিয়াছেন, "প্রয়োগপ্রধানং হি নাট্যশাস্ত্রম্।" কিন্তু এই বিদ্যা যদি শুধু জীবিকা-সংস্থানের

জন্য হয় তবে ইহা নিন্দাযোগ্য। মালবিকাগ্নিমিত্রে নাট্যাচার্য গণদাস বলিতেছেন—

লব্ধাস্পদোঽস্মীতি বিবাদভীরো-
স্তিতিক্ষমাণস্য পরেণ নিন্দাম্।
যস্যাগমঃ কেবল-জীবিকায়ৈ
তং জ্ঞানপণ্যং বণিজং বদন্তি ॥

অর্থাৎ আমি যথেষ্ট পদপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি মনে করিয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভীরু, পরনিন্দা-উপেক্ষাকারী এবং যাহার শাস্ত্রজ্ঞান কেবল জীবিকার জন্য সে জ্ঞান-পণ্য-ব্যবসায়ী বণিক্। নটের বৃত্তি শেষে পণ্যজীবী বণিকের মতই হইয়াছিল, তাই সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কর্ণপুর তাঁহার "চৈতন্য-চন্দ্রোদয়" নাটকে বলিয়াছেন—

সপ্তদশ শতাব্দীতে নটের অবনতি

শৈলূষাণামিব নিপুণতাধিক্য-শিক্ষাবিশেষা
নানাকারা জঠর-পিঠরাবর্ত্ত-পূর্ত্তিপ্রকারাঃ

অর্থাৎ নটের নাট্যশিক্ষাপ্রণালী কেবল উদর-পরিপূর্তির জন্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নট-ব্যবসায়ীর সমাজে কোনও স্থান ছিল না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যবসায়ী সুশিক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রী-সম্প্রদায়-গঠন গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব কীর্তি। গিরিশ-চন্দ্র কি ভাবে অশিক্ষিত নিরক্ষর নট-নটীদের শিক্ষা দিতেন বিনোদিনী নাম্নী অভিনেত্রীর রচিত "আমার জীবন" পুস্তকে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস

সঙ্ঘবদ্ধভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রী-গঠন গিরিশের অপূর্ব কীর্তি

পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "গিরিশবাবু আমাকে পাঠ অভিনয় জন্য অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালী বড়ই সুন্দর ছিল। তিনি প্রথমে পাঠগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর পাঠ মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মত আমাদের বাড়ীতে বসিয়া অমৃত মিত্র, অমৃত বাবু (ভুনীবাবু) আরও অন্যান্য লোক মিলিয়া নানাবিধ বিলাতী অভিনেত্রীর, বড় বড় বিলাতী কবি—সেক্সপিয়ার, মিল্টন, বায়রন, পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখনও তাঁদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। নানাবিধ হাবভাবের কথা এক এক জন করিয়া শিখাইয়া দিতেন। ইহার আগে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা পড়াপাখীর চতুরতার ন্যায়, আমার নিজের বড় একটা অভিজ্ঞতা হয় নাই। কোন বিষয়ে তর্ক বা যুক্তি দ্বারা কিছু বলিতে বা বুঝিতে পারিতাম না। এই সময় হইতে নিজের অভিনয়ে নির্বাচিত ভূমিকা বুঝিয়া লইতে পারিতাম।

গিরিশের শিক্ষাদান প্রণালীর বর্ণনা

"গিরিশবাবু মহাশয় যে সকল বিলাতের বড় বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীর গল্প করিতেন, যে সকল বই পড়িয়া শুনাইতেন আমার তাহাই ভাল লাগিত। মিসেস সিডন্‌স্ থিয়েটারের কার্য ত্যাগ করিয়া দশ বৎসর বিবাহিত অবস্থায় অতিবাহিত করিবার পর পুনরায় যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার অভিনয়ে কোন্ সমালোচক কোন্ স্থানে কিরূপ দোষ ধরিয়াছিল, কোন্ অংশে তাঁহার উৎকর্ষ বা ত্রুটী ইত্যাদি পুস্তক পড়িয়া বুঝাইয়া দিতেন। কোন্ একট্রেস্ বিলাতে বনের মধ্যে

পাখীর আওয়াজের সহিত নিজের স্বর সাধিত তাহাও বলিতেন। এলেনটারি কিরূপ সাজসজ্জা করিত, ব্যাণ্ডম্যান কেমন সাজিত, ওফেলিয়া কেমন ফুলের পোষাক পরিত, বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' কোন্ পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত, 'রজনী' কোন্ ইংরাজী পুস্তকের ভাবসংগ্রহে রচিত—এই রকম—কত বলিব, গিরিশবাবু মহাশয়ের যত্নে ইংরাজী, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি বড় বড় 'অথরের' কত গল্প যে আমি শুনিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। শুধু শুনিতাম না, তাহা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া সতত সেই সকল চিন্তা করিতাম।"

নাট্যশালাকে স্থায়ী জাতীয় প্রতিষ্ঠানে গঠন

গিরিশচন্দ্রের যে মন এতদিন শিক্ষার্থী হইয়া সর্ববিধ অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ে রত ছিল—এখন সেই মন তাঁহার সেই অভিজ্ঞতালব্ধ ভাব ও আদর্শ তাঁহার ভাবী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে সঞ্চার ও প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যস্ত হইল। তিনি নাট্যশালাকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে যতদিন না ইহা রীতিমত ব্যবসায় হিসাবে গঠিত হইবে ততদিন ইহার স্থায়িত্বের আশা নাই। নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অমৃত বসু, অসাধারণ অধ্যবসায়ী ধর্মদাস সুর এবং অন্যান্য নাট্যরসিক মহানুভবেরা যথেষ্ট পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াও রঙ্গমঞ্চকে স্থায়িভাবে পরিণত করিতে পারেন নাই। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে একে একে ন্যাশন্যাল, গ্রেট ন্যাশন্যাল প্রভৃতি সাধারণ নাট্যশালা এবং কত ধনী ও মনস্বীদের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ উদ্যম, অধ্যবসায় ও কৃতিত্বসত্ত্বেও বিলুপ্ত হইয়াছে। অবশেষে হীরা-জহরতের ব্যবসায়ী ধনী প্রতাপচাঁদ জহুরী ব্যবসায়-হিসাবে রঙ্গালয়

পরিচালনা করিতে অগ্রসর হইলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার সঙ্কল্পিত রঙ্গালয়ে বেতনভুক্ অধ্যক্ষভাবে যোগদান করিতে দ্বিধা করিলেন না। ইহাতে তাঁহার সওদাগরী আফিসের দেড়শত টাকা বেতনের চাকুরী ত্যাগ করিতে হইল। প্রতাপ-চাঁদ তাঁহাকে মাসিক একশত টাকা বেতন দিতেন। এই প্রতাপচাঁদ জহুরীর নাট্যশালায় তিনি সর্বপ্রথমে ব্যবসায়ী নট ও নাট্যকার হইলেন।

গিরিশের নাটক-রচনা

এই সময় হইতে আমরা গিরিশচন্দ্রের জীবনকে প্রতি দশকে বিভক্ত করিয়া নাট্যকলায় তাঁহার মনোবিকাশ দেখিতে চেষ্টা করিব। "আগমনী", "অকাল বোধন" এবং "দোললীলা" রচিত হওয়ার প্রায় তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে "মায়া-তরু" নামে বাংলা ভাষায় গিরিশ প্রথম প্রতীক (symbolic) নাট্য রচনা করেন। এই গীতিনাট্য রচনার পর হইতে গিরিশচন্দ্র ধারাবাহিকভাবে নাটক রচনা করিয়াছেন। ১৮৮১ জানুয়ারী হইতে ১৮৯১ ডিসেম্বর, ১৮৯২ হইতে ১৯০২ এবং ১৯০৩ হইতে ১৯১২ পর্যন্ত এক একটি দশকের তালিকা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় গিরিশচন্দ্র কতগুলি নাটক, উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

গিরিশের প্রতি-দশকে গ্রন্থরচনার তালিকা

১৮৮১ হইতে ১৮৯১

১। মায়াতরু	৫। রাবণ-বধ
২। মোহিনী প্রতিমা	৬। সীতার বনবাস
৩। আলাদিন	৭। অভিমন্যু-বধ
৪। আনন্দরহো	৮। সীতার বিবাহ

৯। ব্রজবিহার
১০। রামের বনবাস
১১। সীতাহরণ
১২। ভোটমঙ্গল
১৩। মলিনমালা
১৪। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
১৫। দক্ষযজ্ঞ
১৬। ধ্রুবচরিত্র
১৭। নলদময়ন্তী
১৮। কমলে কামিনী
১৯। হীরার ফুল
২০। বৃষকেতু
২১। শ্রীবৎসচিন্তা
২২। চৈতন্যলীলা
২৩। প্রহ্লাদচরিত্র
২৪। নিমাই সন্ন্যাস
২৫। প্রভাস যজ্ঞ
২৬। বুদ্ধদেব চরিত
২৭। বিল্বমঙ্গল
২৮। বেল্লিক বাজার
২৯। রূপ-সনাতন
৩০। পূর্ণচন্দ্র
৩১। নসীরাম
৩২। বিষাদ
৩৩। প্রফুল্ল
৩৪। হারানিধি
৩৫। চণ্ড
৩৬। মলিনা-বিকাশ
৩৭। মহাপূজা

উপন্যাস—

চন্দ্রা

বিবিধ প্রবন্ধ—

(১) দীননাথ
(২) ফুলের হার
(৩) গরুড়
(৪) পাখী গাও
(৫) ঈশজ্ঞান
(৬) ভারতবর্ষের পথ
(৭) গ্রহফল
(৮) বিজ্ঞান ও কল্পনা

গল্প—

(১) হাবা
(২) নবধর্ম (নক্সা)
(৩) নসীরাম (নক্সা)
(৪) বাঢের বাজী

কবিতাবলী—

প্রথমভাগ

১৮৯২—১৯০২

১। ম্যাকবেথ
২। মুকুল মুঞ্জরা
৩। আবুহোসেন
৪। জনা

৫। সপ্তমীতে বিসর্জ্জন
৬। স্বপ্নের ফুল
৭। সভ্যতার পাণ্ডা
৮। ফণির মণি
৯। পাঁচ ক'নে
১০। কালাপাহাড়
১১। হীরক জুবিলী
১২। পারস্যপ্রসূন
১৩। মায়াবসান
১৪। দেলদার
১৫। পাণ্ডব-গৌরব
১৬। মণি-হরণ
১৭। নন্দদুলাল
১৮। অশ্রুধারা
১৯। মনের মতন
২০। অভিশাপ
২১। শাস্তি
২২। ভ্রান্তি
২৩। আয়না

নাট্য প্রবন্ধ—

(১) পুরুষ অংশে নারী
(২) অভিনেত্রী-সমালোচনা
(৩) বর্ত্তমান রঙ্গভূমি

(৪) পৌরাণিক নাটক

উপন্যাস—

ঝালোয়ার দুহিতা (অসমাপ্ত)

গল্প—

(১) গোব্‌রা
(২) বাঙ্গাল
(৩) কুলীন গিন্নী
(৪) ভূতির বিয়ে
(৫) সই
(৬) বড় বউ
(৭) কর্জ্জনার মাঠে

প্রবন্ধ—

(১) সাধন-গুরু
(২) কর্ম্ম
(৩) ইংরাজ রাজত্বের বাকী
(৪) পূর্ণিমা
(৫) রাজনৈতিক আলোক
(৬) সম্পাদক
(৭) ধর্ম্ম
(৮) গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
(৯) পলিসি
(১০) ধর্ম্মস্থাপক ও ধর্ম্মযাজক

১৯০৩—১৯১২

১। সৎনাম (বৈষ্ণবী)
২। হরগৌরী
৩। বলিদান
৪। রাণা প্রতাপ (অসমাপ্ত)

৫। সিরাজদ্দৌলা
৬। বাসর
৭। মীর কাসিম
৮। ব্যাম্নসা-কা-ত্যাম্নসা
৯। ছত্রপতি শিবাজী
১০। শাস্তি কি শান্তি
১১। শঙ্করাচার্য্য
১২। অশোক
১৩। তপোবন
১৪। গৃহলক্ষ্মী (অসমাপ্ত)
১৫। মিলন-কানন (অসমাপ্ত)
১৬। সাধের বউ (অসমাপ্ত)

পুস্তিকা—
স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর

উপন্যাস—লীলা

গল্প—
(১) পূজার তত্ত্ব
(২) প্রায়শ্চিত্ত
(৩) টাকের ঔষধ
(৪) পিতৃপ্রায়শ্চিত্ত
(৫) সাধের বউ
(৬) তত্ত্ববাদিনী (অসমাপ্ত)
(৭) বদীরাম

কবিতা-পুস্তক—
প্রতিধ্বনি

প্রবন্ধ—
(১) প্রলাপ না সত্য
(২) নিশ্চেষ্ট অবস্থা
(৩) ক। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ
খ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরসহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ
গ। বিবেকানন্দের সাধনফল
ঘ। বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ
(৪) রাম দাদা
(৫) স্বামী বিবেকানন্দ
(৬) পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ
(৭) "তাও বটে—তাও বটে"
(৮) ধ্রুবতারা
(৯) শান্তি
(১০) গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম
(১১) ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব
(১২) সমাজ-সংস্কার
(১৩) স্ত্রীশিক্ষা
(১৪) পঞ্চনট
(১৫) রঙ্গালয়ে 'নেপেন'
(১৬) বঙ্গ রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী
(১৭) ক। নবীন সেন
খ। নবীনচন্দ্র
(১৮) কবিবর রজনীকান্ত সেন
(১৯) নাট্যশিল্পী ধর্ম্মদাস
(২০) রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী
(২১) বিশ্বাস
(২২) শান্তি

গিরিশচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসরে ৩৭খানি নাটক রচনা করিয়াছেন ; তন্মধ্যে সাতখানি গীতিনাট্য, দুইটি প্রহসন, একটি রূপক এবং অবশিষ্ট সাতাইশ-খানি নাটক। তিনি যে সাতখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছেন—সকলেরই বিষয়বস্তু প্রেম। গিরিশ সুন্দরের এবং প্রেমের উপাসক ছিলেন—তাঁহার নিকট এই প্রেম কল্পলোকের আদর্শ।

গিরিশের "মায়া-তরু"তে প্রতীক নাটক রচনার উন্মেষ

তাই তাঁহার "মায়াতরু"তে এই প্রেম ও সৌন্দর্যের খেলা অপার্থিব গন্ধর্বলোকে দেখাইয়াছেন। মানুষ বাস্তবজগতে জন্মায় কিন্তু তাহার সত্তা জড় ও অপার্থিব বস্তুর সমবায়ে গঠিত। সুরত মর-লোকে রাজা চন্দ্রশেখরের ঔরসে গন্ধর্ব-রাজকন্যা উদাসিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রেম ও সৌন্দর্যের রাজ্যে—গন্ধর্বলোকে সে তাহার আদর্শ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সে জানে না কি চায়—তাই সে জানিতে চায় কি চায়। কিন্তু তাহাকে কে বলিয়া দিবে—সে কি চায় ? যে মহাশক্তি শিবসুন্দরের বক্ষে নৃত্য করিতেছেন—যে মহাশক্তি পরমাপ্রকৃতি—সুরত সেই দেবীর শরণাগত হইল। মহামায়ার করুণার মায়াতরুস্পর্শে সেই গোপন-আদর্শ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এই প্রেম কেহ সম্ভোগ করে আবার কেহ ফুলহাসির মত অন্তরালে তাহার আদর্শ দেখিয়া মর্মদাহে চির-বিরহব্যথা অন্তরে বরণ করিয়া লয়—একদিনের খেলা একদিনেই ফুরায়। গিরিশের কল্পনায় প্রতীক বা Symbolical নাটকের এই প্রথম উন্মেষ।

"মোহিনী প্রতিমা"য় অর্থশালী বণিকপুত্র হেমন্ত চিত্র আঁকিতে আঁকিতে হৃদয়-প্রতিমার সন্ধানে বেড়াইতেছেন।

বাছিয়া বাছিয়া নগরের সুন্দরী বারবনিতা লইয়া আসিয়া ছবি তোলেন কিন্তু তাঁহার অন্তরের সে আদর্শ পান না। হেমন্তের মর্মকথা বুঝিয়া সাহানা নাম্নী এক পতিতা নারীর হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে। এই প্রেমিক সন্ধানীর সংস্পর্শে তাহার "নারীত্ব" জাগিল—তাহার জীবনে রূপান্তর ঘটিল। "সাহানা"র প্রেমানুরক্ত যুবক মহীন্দ্র যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এ প্রবৃত্তি-পরিবর্ত্তনের কারণ কি বল্‌তে পার।" সাহানা তদুত্তরে বলিল, "আমি আপনার রূপের গৌরবে মনে করেছিলেম এই পথেই স্বর্গ—আমি জানতেম না, যারা রূপের পূজা করে, তাদের চক্ষে আমি ঘৃণ্য।" সে আরও বলিল, "যার জন্য আমি সর্ব্বত্যাগী হবো—তাকেও আমি চাই না।" সে একে একে তাহার প্রণয়াসক্তদের প্রদত্ত অর্থসম্পত্তি তাহাদের ফিরাইয়া দিল। সাহানা বুঝিয়াছে যে, "হৃদয়ের প্রতিমা হৃদয়ে থাকে বটে—কিন্তু যোগী সেই প্রতিমা যুগে যুগে ধ্যান করে।" যে রূপজীবী সাহানা নীহারের ছবি দেখিয়া ঈর্ষায় একদিন হেমন্তকে প্রতিশ্রুত করাইয়াছিল যে সে বিবাহ করিয়া তাহার স্ত্রীর আর মুখ দেখিবে না—এখন সেই অনুতপ্তা পতিতা নারী সাহানা নীহারের সহিত হেমন্তের মিলন ঘটাইতে ছুটিল। অভিমানিনী নীহার সাহানাকে দেখিয়া—তাহার কথা ও ব্যবহারে বুঝিল যে সে বাস্তবিকই তাহার ব্যথার ব্যথী একজন প্রকৃত দরদী। যখন কোনও স্ত্রীলোক সাহানার কথা তুলিয়া নীহারকে সংশয়চিত্তে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কখন' একথা বিশ্বাস কর, কয়লা কখন' হীরে হয়?" নীহার উত্তর করিল, "ভাই, মন কয়লা নয়—

গিরিশের "মোহিনী প্রতিমা"র পতিতা চরিত্র

হীরে, তবে কখন' কখন' ময়লা লেগে থাকে।" আবার সাহানা যখন নির্মলচরিত্র প্রেমিক হেমন্তকে বলিল, "তুমি আমায় হীন বিবেচনা করে ঘৃণা কর।" হেমন্ত তৎক্ষণাৎ বলিল, "আমি তোমায় কখন হীন বিবেচনা করি নাই; তবে তুমি আপনাকে চেন না, আমি আপনাকে চিনি—এখন যদি চিনে থাক তো বল্‌তে পারি না।" সাহানার চেষ্টায় ও উদযোগে প্রেমিকা নীহার পাষাণ-প্রতিমার সাজে প্রেমিক হেমন্তের সম্মুখে দাঁড়াইল—যখন অনুরাগের আরক্তরাগে পতিপত্নীর মিলন হইল—তখন সাহানা দর্পণে তাহাদের মুখভাব হেমন্তকে দেখাইয়া বলিল—"তোমাদের দু'জনের মুখের ভাব তোমার ছবিতে তুলো।" পতিতা সাহানা-চরিত্র বাস্তবিকই সে যুগে বাংলা সাহিত্যে নূতন ও অপূর্ব! কোন্ যুগেই বা নয়?

গিরিশের "মলিন-মালা"য় নসিকেয়া ও ইউলিসিসের ছায়া

গিরিশচন্দ্রের "মলিন-মালা"য় মহাকবি হোমরের নসিকেয়া ও ইউলিসিসের ছায়া অনেক পরিমাণে পড়িয়াছে। সেই সাগরকূল, সেই ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরোর্মিতে পোত নিমগ্ন, বিপন্ন লহরকুমারের রাজকুমারী-দ্বয়ের আতিথ্যগ্রহণ, লহরকুমারের প্রতি প্রেম প্রভৃতি দৃশ্য নসিকেয়া ও ইউলিসিসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে "মলিন-মালা"য় লহরকুমারের অন্তর্জ্বালা ও তাঁহার প্রতি দুই রাজকুমারীর আকর্ষণ এবং তরুণার আত্মত্যাগ করুণরসের রেখাপাত করিয়াছে। অন্তরের আদর্শের সন্ধানে লহরের অনন্তসমুদ্রবক্ষে নিরুদ্দেশ যাত্রা অপূর্ব! বিদায়ের সময়ে লহর সকলকে বলিতেছে, "কাঁদিয়া পেয়েছি সখা বিজনে!" এবং "সখা হৃদিকমলে"। সেই সখার উদ্দেশে কি আজ সে অনন্তের যাত্রী? গিরিশচন্দ্রের এই গীতি-

নাট্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা সীমাবদ্ধ-ভাষণে অসম্ভব। তাঁহার এই সব গীতিনাট্যের পরিকল্পনায় বোঝা যায় যে এই সময়ে তিনি পুরাপুরি আদর্শবাদী—প্লেটোর পরমরূপ পরমসুন্দর "এইডস্"ই তাঁহার আদর্শ, ধ্যান ও কল্পনা। এরিষ্টটলের মতে এই আদর্শ প্রত্যেকের ভিতরে আছে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে। গিরিশচন্দ্র তাঁহার আত্মকথায় বলিয়াছেন যে পরমহংসদেবের দর্শনলাভ করিবার চৌদ্দবৎসর পূর্ব হইতে তিনি ছিলেন জড়বাদী ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান; কিন্তু তাঁহার রসলিপ্সু কবি-মন পরমসুন্দর ও পরমপ্রেমের আদর্শে বিভোর ছিল—এই ধ্যান ও কল্পনাই ছিল একমাত্র তাঁহার জীবনগতির অগ্রগামী শক্তি।

গিরিশের আদর্শবাদ

গিরিশচন্দ্র আলাদিনে "কুহকী"র যাদুমন্ত্রে যে শব্দবিন্যাস করিয়াছেন—তাহারই পূর্ণ-বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় ম্যাকবেথের ডাইনীদের ভাষায়। এই যাদুমন্ত্রের রচনাকালে তাঁহার কল্পনায় শব্দশক্তির মোহিনী প্রভাব ও মন্ত্রশক্তিবলে বশীকরণরহস্য ভাসিয়া উঠিল—তাই "আনন্দ রহো" নাটক লিখিলেন। এই "আনন্দ রহো" শব্দে প্রবল প্রতাপশালী "আকবর" মোহগ্রস্ত হন, বাদশাহ আসন ত্যাগ করেন, বন্দী কারামুক্ত হয় ও মহাবীর মহারাণা প্রতাপ মূর্ছিত হইয়া পড়েন। এই "আনন্দ রহো" মন্ত্রে অস্ত্রধারীর অস্ত্র পড়িয়া যায়, লম্পট ভীত হয় এবং ব্যভিচারিণী আতঙ্কিত হইয়া পড়ে। যদিও গিরিশচন্দ্র ইহাকে পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তবুও ইহা খাঁটী ঐতিহাসিক নহে—ঐতিহাসিক মালমসলায় আদর্শ-

"আলাদিনে" কুহকীর মন্ত্রশক্তি

মন্ত্রশক্তির প্রভাব "আনন্দ রহো" নাটকে

মূলক রোমান্টিক নাটক। ইহাতে নানা মহৎ নাটকীয় চরিত্রের বীজ এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত থাকিলেও হেগেলের দার্শনিক সংজ্ঞায় বলিতে হয় ইহা অরিয়েন্টাল-গুণ-যুক্ত। স্বচ্ছ স্বাভাবিক সাবলীল গতি ইহাতে নাই—গল্পের দৃঢ় বন্ধন নাই—চরিত্রের বিকাশ নাই—রসমাধুর্যের লীলাভঙ্গী নাই।

গিরিশের উপর পূর্বকবিগণের রচনার প্রভাব

অথচ স্বদেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, জাতীয়তা এবং প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ইহাতে আছে। আর আছে গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় ভাষা, নাটকীয় কথোপকথন এবং নাটকীয় সংস্থান। তাঁহার পূর্বলিখিত গীতিনাট্যে তাঁহার পূর্বগামী কবিদিগের প্রভাব ছিল। তাঁহার মলিন-মালায় দেখিতে পাওয়া যায়—

"দিদি শুধাই তোমায়, দিদি শুধাই তোমায়
দিন দিন তোরে হেরি শীর্ণকায় ?
যদি ঠেকে থাকে দায়, বল না আমায়,
কয়দিন দেখি তোমা শূন্যমনা প্রায়।
আমি ভগিনী তোমার আমি ভগিনী তোমার—"

প্রভৃতিতে গুপ্ত কবির প্রভাব জাজ্বল্যমান।—"আনন্দ রহো"তে গিরিশচন্দ্রের খাঁটি মৌলিক প্রতিভায় নাট্যশক্তির প্রথম বিকাশ। কিন্তু এই নাট্যশক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে—তাঁহার প্রকৃত নাট্যপ্রতিভার দ্বার খুলিয়া গেল—তাঁহার প্রাণে বীণাপাণি এক নবীন সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া দিলেন। তাঁহার দৃষ্টি পড়িল কাব্যজগতের অভ্রভেদী হিমালয়ের দিকে—

গিরিশের মৌলিক প্রতিভা পৌরাণিক নাটকে বিকাশ

বিরাট্ কল্পনার মহোচ্চ রত্নমাণিক্যখচিত প্রাসাদ রামায়ণ মহাভারত পুরাণগ্রন্থের প্রতি। এই দুই মহাকাব্য ও পুরাণ প্রাচীন ভারতের অপূর্ব সংস্কৃতির উৎস—ব্যাস বাল্মীকির অমানব প্রতিভার অবদান—হিন্দু-জাতির সঞ্জীবনী প্রাণশক্তি। শৈশব কৈশোরে পুরাণপ্রসঙ্গে পালিত, যৌবনোদ্গমে কাশীরাম কৃত্তিবাসের পীযূষধারায় পুষ্ট গিরিশের রসলিপ্সু মন বিরাট্ কল্পনার আদর্শে জাগিয়া উঠিল। স্বয়ং বীণাপাণি তাঁহার করযুগলে বীণা তুলিয়া দিলেন—বাগ্দেবী তাঁহার কণ্ঠে বাণী দান করিলেন এবং মা ভারতী হৃদয়কমলে তাঁহার আসন পাতিলেন। গিরিশচন্দ্র একে একে পৌরাণিক নাটক লিখিতে লাগিলেন।

পৌরাণিক নাটকে জাতীয়ভাব

সংস্কারযুগে মধুসূদন নূতনভাবে পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছিলেন, অপূর্ব মেঘনাদ-বধ কাব্য রচনা করিয়াছেন, হেমচন্দ্র বৃত্রসংহার কাব্যে বীরত্বের ঝঙ্কার তুলিয়াছেন—কিন্তু সেগুলি পুরাণের আবরণে পাশ্চাত্ত্য গ্রীক সাহিত্যের ও গ্রীক মহাকবিদিগের বর্ণিত চিত্রগুলির ছায়া। তাঁহাদের চিত্রিত চরিত্রে মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর ভাষায় "হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট প্যান্টলুন দেখা দেয়।" সুকবি নাট্যকার মনোমোহন বসুর "রামাভিষেক" জনপ্রিয় হইয়াছিল—সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছে কিন্তু তাহা যাত্রার মত শুধু রসপূর্ণ নাটক। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের বিকাশ নাই—নাটকীয় সংস্থান এবং নাটকীয় ভাষা নাই। আছে করুণ রসের একতানতা—অনুপ্রাসযুক্ত গদ্যপদ্যর সুদীর্ঘ সরল বাক্যবিন্যাস। গিরিশচন্দ্র নাটকীয় ভাষার সুস্পষ্ট পথ দেখাইলেন—নাটকীয় চরিত্রের

ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও নাটকীয় সংস্থানের সন্নিবেশে, নাটক রচনার শৈলী ও গতিভঙ্গিতে এবং নাটকীয় কথোপকথনে। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার ফলে রস ও ঘটনাদ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে গিরিশের অঙ্ক বিভাগ

তাঁহার নাটকের অঙ্কভাগ পাশ্চাত্ত্য নাটকরীতির আদর্শে গঠিত। সংস্কৃত নাটকের পঞ্চসন্ধির মত পাশ্চাত্ত্য নাট্য-সাহিত্যেও পঞ্চসন্ধি আছে—যথা (১) *Protasis* অর্থাৎ নাটকীয় আখ্যানের আরম্ভ, (২) *Epitatis* বিরুদ্ধগতি, (৩) *Catastasis* পুষ্টি, (৪) *Peripateia* বিরাম এবং (৫) *Catastrophe* অর্থাৎ পরিসমাপ্তি। এইভাবে অঙ্ক বিভাগ করিয়া নাটকের আখ্যানবস্তুকে সাজাইতে হইবে। পাশ্চাত্ত্যেরা তাই তৃতীয় অঙ্ককে নাটকীয় ঘটনার চরম পরিণতি বলিয়া উল্লেখ করে। গিরিশচন্দ্র সেক্সপীয়রের রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্থান কাল এবং ঘটনার ঐক্য সব সময়ে মানিয়া চলেন নাই।

পৌরাণিক চরিত্রে গিরিশের মৌলিক কল্পনা

গিরিশচন্দ্র কবিগুরুদের অনুগামী হইয়াও নাটকে পৌরাণিক চরিত্রগুলির বিকাশ করিতে স্বীয় কল্পনায় অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। তাঁহার রংয়ের তুলিতে বিকৃত না হইয়া চিত্র আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতিও নাটকে ও কাব্যে তাহা করিয়াছেন—চরিত্র-গুলির সুষমা বিকাশ করিবার জন্য। পরলোকগত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে লিখিয়াছিলেন, "আদি-কবি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের

সৃষ্ট চরিত্রে যে প্রতিভা নূতনতার ও মৌলিকতার আরোপ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই, সে প্রতিভার শক্তি, সাহস ও সাফল্যের আলোচনা করিবার, পরিচয় দিবার শক্তি আমাদের নাই। গিরিশের অঙ্কিত পৌরাণিক চরিত্রগুলির সামান্য আলোচনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

গিরিশের "রাবণ" প্রেমিক

গিরিশচন্দ্রের রাবণচরিত্র শুধু নলকুবেরের শাপগ্রস্ত নয়, কিন্তু সীতার রূপমুগ্ধ প্রেমিক। সীতাহরণে রাবণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া ভগিনী সূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ দিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সীতাকে প্রথম দেখিয়াই বলিতেছেন—

বাণবিদ্ধ হেরিলাম সৈন্যগণে,
সত্য বটে সুসন্ধানী রাম;
কিন্তু অব্যর্থ সন্ধান—সীতার নয়ন-কোণে!
ওই রূপ মম উরুদেশে শুয়ে
যদি বামা কথা কয়
নাহি ব্যথা
এ জীবন অনায়াসে পারি দিতে,
তুচ্ছ মানি লঙ্কার বৈভব,
রমণী-দুর্লভ বুকে রাখি সদা দেখি!

সীতাকে ব্যোমপথে রথারোহণে রাবণ যখন সমুদ্রের উপর দিয়া লইয়া যাইতেছেন মূর্ছিতা জানকীকে তখন স্পর্শ করিতে তাঁহার সাহস হইতেছে না—

কঠিন এ বাহু,
ডরি পাছে ব্যথা লাগে গায়!

সীতার অচেতন দেহ দেখিয়া রাবণ বলিতেছে, "ঝাঁপ দিব এ পদ্ম শুকালে!" যখন সীতাকে লঙ্কায় অশোকবনে চেড়ীবেষ্টিতা করিয়া রাখিয়াছে তখনও রাবণ নিজের আয়ত্তাধীনে আনিয়া বল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত, কারণ—

প্রেমই রাবণকে বলপ্রয়োগে কুণ্ঠিত করিয়াছে

নহে রম্ভা বারাঙ্গনা
বলে দেহ করিব হরণ;
প্রাণ প্রয়োজন—প্রাণ দিয়ে চাহি প্রাণ!
এ কমল দলিতে চরণে—
নাহি জানি চাহে কেবা!

এই রূপজ প্রেমে ঈর্ষা আছে তাই সীতা "রাম"-নাম উচ্চারণ করিলে রাবণ সহিতে পারে না! সে বলে, "ওই নাম বজ্রের অধিক মোরে বাজে—" তপস্বী রামের কথা স্মরণ করিয়া রাবণ বলিতেছে—

রাবণের চরিত্রে সীতা-প্রেম

শত জন্ম তপস্বীর বেশে,
অনায়াসে ভ্রমি বনে—
সীতা যদি হয় মম!
এ বৈভব দিই বিসর্জ্জন,
অন্য নারী নাহি হেরি,—
সকলি অসার, সীতা যদি না হয় আমার!

গিরিশচন্দ্র রাবণকে দর্পী, দাম্ভিক, বীর ও প্রেমিক করিয়াছেন। নল-কুবেরের শাপে মৃত্যুভয়ে রাবণ বল-

প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইত না, যদি না এই প্রেম তাহার গতিরোধ করিত। গিরিশচন্দ্র তাই রাবণকে দিয়া বলাইয়াছেন, "হাসি পায় নল-কুবেরের শাপে।" সীতা যে শুদ্ধান্তচারিণী, পরম পবিত্রা ও রমণী-কুলের শিরোমণি—বীরশ্রেষ্ঠ রাবণ সে "রত্ন" প্রেমের দ্বারা লাভ করিতে চায়—বলের দ্বারা নহে। ভোগবিলাসে, ঐশ্বর্যদর্পে, বীরত্বে কিংবা শক্তি প্রভাবে কোনও বিষয়ে সে হীন নয়—ত্রিলোকের রাজেন্দ্রবৃন্দ তাহার পদানত, বীরবৃন্দ সন্ত্রস্ত—সহস্র সহস্র রমণী তাহার ভোগ্যা—কিছুরই অভাব নাই—কিন্তু রামময়-জীবিতা সীতাকে দেখিয়া রাবণের চিত্তে প্রেমের উদয় হইল—সে একনিষ্ঠ প্রেমের ছবি দেখিয়া বিহ্বল হইল। যে রাবণ স্পর্ধা করিয়াছিল—

বীরশ্রেষ্ঠ রাবণ সীতার নিকট প্রেমবিন্দুর ভিখারী

নাহি নব রাজ্য, নূতন ভুবন
দিগ্বিজয়ে যাব পুনঃ।

যে রাবণ সাব্যস্ত করিয়াছিল "বীরহীন এ সংসার!" যে রাবণ নাক-কান-কাটা সূর্পণখাকে দেখিয়া মনে করিয়াছিল বোধ হয় কোন মায়াবী নটী তাহার ভগিনীর বীভৎস আকার দেখাইয়া পুরস্কারের আশায় তাহার নৈপুণ্য দেখাইতে আসিয়াছে, যে রাবণ নাক-কান-কাটা সূর্পণখাকে দেখিয়া মায়াবী নটীর অভিনয়-নৈপুণ্য মনে করিয়া প্রীত-মনে নিজের অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরী খুলিয়া পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিল—যে রাবণ বীর গর্বে বলিয়াছিল—

রাবণ চরিত্রের দাম্ভিকতা ও দর্প

কহ কিবা নাম তব ?
আশ্চর্য্য নৈপুণ্য তোর !
পুরস্কার লহ এ অঙ্গুরী—
পাইলাম কুবের জিনিয়া।

যে রাবণ সূর্পণখার ক্রন্দনে বুঝিল যে ইহা কোনও মায়াবী নটীর ছল নহে কিন্তু শত্রু কর্তৃক লাঞ্ছিতা অপমানিতা স্বীয় ভগিনীই তাহার সম্মুখে! তখন বিস্ময়ে যে দর্পী দাম্ভিক রাবণ বলিতেছে—

সত্য সূর্পণখা!
কালচক্র—কাহার ফিরিল!
কোন কুল নির্ম্মূল উন্মুখ ?
কোন্ রাজ্য সাগর গ্রাসিবে ?
ছিল কেবা কোন রসাতলে
রাবণে নাহিক জানে ?

যে রাবণের প্রতি উক্তি দাম্ভিকতাপূর্ণ, সেই দর্পী ও দাম্ভিক রাবণ আজ রামগত-প্রাণা সীতার একনিষ্ঠ প্রেমের নিকট অপূর্ব সতীত্বের আত্ম-সমাহিত আদর্শের নিকট দুর্বল! ঘটনাচক্রে প্রবল পরাক্রান্ত মহাবীর রাবণ স্বীয় কুক্ষিমধ্যগতা রমণী-ললামভূতা বন্দিনী সীতার নিকট প্রেমবিন্দুর ভিখারী! গিরিশচন্দ্রের এই কল্পনা অতি মনোরম! "রাবণ-বধে" রূপমুগ্ধ রাবণ সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াও সীতার দ্বারে প্রেম-প্রার্থী! লক্ষ পুত্রশোকে কাতর ধ্বংসোন্মুখ শ্রীহীন লঙ্কাধিপতি মহাশক্তির

রূপমুগ্ধ রাবণের দৌর্বল্য

প্রভাবে প্রভাবান্বিত দুষ্ট দাম্ভিক রাবণ পতি-ধ্যানপরায়ণা সীতাকে যেন তাঁহার স্বামীরই কল্যাণের জন্য বুঝাইতেছে—

চন্দ্রাননি, এখন' ভজহ মোরে!
সতী নারী সাধে সদা পতির কল্যাণ!
না ভজিলে মোরে, পতিতপাবনী বরে—
পতি তব পড়িবে সমরে আজি!
কর আলিঙ্গন দান,
চাহ যদি পতির কল্যাণ!

ঠিক এই সময়ে "জয় রাম" ধ্বনি শুনিয়া বীরশ্রেষ্ঠ রাবণ ভোগ-ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া বীরত্বের আহ্বানে সমরক্ষেত্রে ধাবিত হইল। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় রাবণের সম্ভোগ-ইচ্ছাকে কেহ কেহ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করেন। আমরা এক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ব-বিশারদ নুট হাম্‌সেনের "Hunger" পুস্তকের ক্ষুধার্ত নায়কের কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতে বলি। এক্ষেত্রে রূপজপ্রেমে মুগ্ধ রাবণের সম্ভোগেচ্ছা আসিবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? যাহার জন্য রাজ্য, ধন, পুত্র, দেশ ও জাতি সব একে একে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে—যাহার জন্য তাহার দর্প, গর্ব, বীরত্ব ও অহঙ্কার সব চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে দেখিতে আসিবে ও তাহার প্রেমালিঙ্গন ভিক্ষা করিবে—ইহাই তো স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া রাবণের মনে তখনও মৃত্যুর ছায়া পতিত হয় নাই। তাহার মৃত্যু-বাণ তাহারই ঘরে—মহামায়ার কৃপায় তখন সে নবীন শক্তিতে অনুপ্রাণিত, সে তো মৃত্যুকে তখন আসন্ন

মৃত্যুর পূর্বে রাবণের সম্ভোগ-ইচ্ছা অস্বাভাবিক নহে

দেখিতেছে না—বিজয়োল্লাসের আশায় তখনও তাহার প্রাণ উৎফুল্ল। গিরিশচন্দ্র রাবণ-চরিত্রে মনস্তত্ত্বের অদ্ভুত ছবি আঁকিয়াছেন।

রামচরিত্রও তাঁহার অপূর্ব। ক্ষত্রিয়-কুলসূর্য, বীরকুলশ্রেষ্ঠ, সত্য-প্রতীক এই দেব-মানব রামচন্দ্রের আলেখ্য বাল্মীকির অমর তূলিকায় চির মহোজ্জ্বল। গিরিশচন্দ্র কোথাও তাহা ক্ষুণ্ণ করেন নাই। রামচন্দ্রের বালী-বধ ও সীতা-বর্জনে মহাকবি কৃত্তিবাসের কতকটা পদাঙ্কানুসরণ তিনি করিয়াছেন—ভবভূতির ছায়াও কিছু পতিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকে গিরিশ মানবের হৃদয়বৃত্তি ও বাস্তবের পট-ভূমিকায় তাহা অঙ্কিত করিয়াছেন। বালীকে বধ করিয়া অনুতপ্ত রামচন্দ্র বলিতেছেন যে, "শোকাকুল হৃদয়ে হিতাহিত বিচার না করিয়া মিত্র-সত্যে অঙ্গীকার করিয়াছি!"

গিরিশের পৌরাণিক নাটকে "রাম"-চরিত্র

রামচন্দ্রের বালী-বধ

বালী সীতাহারা রামচন্দ্রের অন্তর্বেদনা বুঝিয়া বলিলেন—

বুঝিলাম, সুগ্রীব সহায়ে
উদ্ধারিবে নারী তব,—
কিন্তু বহু শ্রমে, বহু দিনে জেন স্থির;
অনায়াসে আনিতাম সীতা
আমারে কহিলে প্রভু।

রামচন্দ্র তদুত্তরে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া বলিতেছেন, "অযশ রহিল মোর," "চোরা বাণে বালীরে ব'ধেছে রাম।" স্বাভাবিক মানবীয় মনোবৃত্তি ও মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়াই গিরিশ এখানে

"রাম-চরিত্র" অঙ্কন করিয়াছেন। "সীতার বনবাসে"ও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

"সীতার বনবাসে" রামচন্দ্র সীতাকে রাবণের আলেখ্যের পাশে নিদ্রিতা দেখিয়া সাধারণ মানুষের ন্যায় ঈর্যান্বিত ও সংশয়-মোহে আচ্ছন্ন।

মহাকবি কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে প্রথমে দুর্ম্মুখের মুখে ও পরে রাস্তাঘাটে সীতার অপবাদ শুনাইয়া আলেখ্যের পার্শ্বে সুপ্তা সীতাকে শায়িতা দেখাইলেন। কৃত্তিবাস বলিয়াছেন—

কৃত্তিবাসের রামায়ণে সীতার বনবাস

"সীতা-পাশে দেখি রাম লিখিত রাবণ।
সত্য অপযশ মম করে সর্ব্বজন॥
পড়িয়া আমার হাতে জন্ম গেল দুঃখে।
তবু উচ্চ বচন নাহিক সীতামুখে॥
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ।
সীতা ত্যাগী হব আমি আর নাহি সাধ॥"

গিরিশচন্দ্রের রামচন্দ্র এই স্থলে বলিয়াছেন—

রামচরিত্রে গিরিশের মৌলিক কল্পনা

মরি মরি, কনক-লতিকা
হৃদয়ের হার মম,
অভাগা রামের নিধি!
মরি মরি, শুয়েছ ধুলায়!
উঠ উঠ ফুল্ল কমলিনি
রাঘব-হৃদয়-মণি
উঠ উঠ আনন্দ আমার!
গাইছে সঙ্গিনী তব বিহঙ্গিনীগণে;

বহিব কলঙ্ক-ভার,
চন্দ্রানন হেরি' ভুলিব হৃদয়-জ্বালা,
আমোদিনি, মেল ফুল্ল আঁখি।

সুপ্তোত্থিতা সীতা যখন রামচন্দ্রকে প্রণয়-সম্ভাষণ করিয়া দাঁড়াইলেন তখন অঙ্কিত রাবণের আলেখ্যের প্রতি রামচন্দ্রের আকস্মিক দৃষ্টি পড়িল। অমনি তাঁহার মনে সীতার অপবাদ-স্মৃতির কথা উদিত হইল, সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল, ক্ষোভে, ঈর্ষায় ও ক্রোধে মনে মনে রাম বলিয়া উঠিলেন—

রাবণের চিত্রদর্শনে রামের ঈর্ষা

একি! রাবণের চিত্র হেরি!
ফলিল তারার অভিশাপ!
দুঃখানল, মন্দোদরি, নিভিল তোমার
কলঙ্কিনী জনক-নন্দিনী!

সীতা যখন তাঁহার বিরস বদন দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন রামচন্দ্র তখন তাঁহার হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া "প্রতীক্ষায় রয়েছে লক্ষ্মণ" বলিয়া চলিয়া গেলেন। শুধু যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন—

তপোবনে মুনি-কন্যাগণে
কবে যাবে করিতে প্রণাম?

লক্ষ্মণকে নিভৃত-কক্ষে ডাকিয়া রামচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা জানাইয়া বলিলেন—

রামের কঠোরতা ও নির্মমতা

শুন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ,—
দুষ্টা নারী সীতা,
চিত্রি রাবণের অবয়ব

হানিবাজ লাজে অশোক-কানন মাঝে—
স্বচক্ষে দেখেছি সীতা ঢালিয়াছে কায়
রাক্ষস ছবির 'পরে।
কাপুরুষ মম সম
কে কবে জন্মেছে রঘুকুলে ?
রামের সংশয় — পাপের সঞ্চার
নাহি জানি কি হেতু রমণী-বধে,
কলঙ্কিনী বধিলে কি দোষ ?

এখানে সংশয়চিত্ত রাম সীতাকে কলঙ্কিনী বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সংশয়মোহে আচ্ছন্ন রামচন্দ্র নারী-বধেও পাতক মনে করিতেছেন না। তাই লক্ষ্মণ যখন বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

নিদারুণ বাণী কেন শুনি তব মুখে ?
লক্ষ্মণের প্রতিবাদ — জনক-নন্দিনী জননী স্বরূপা মম।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া সংশয়-দৃঢ়চিত্তে বলিতেছেন—

জান না, জান না, বুঝ না কুলটা-রীতি !
রামের সংশয়ে দৃঢ়তা — দশে যাহা ঘোষে, মিথ্যা কভু নহে তাহা—
দশ-মুখে ধর্ম্ম মানি।

লক্ষ্মণ যখন শোকাকুল হইয়া সীতার বনবাস-কার্যে অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলেন তখন অপ্রকৃতিস্থ রামচন্দ্র অহল্যা, মন্দোদরী, ও তারার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন—

মোহিনী মায়ার ছলে
আছিনু আচ্ছন্ন ভাই,
তেঁই সাপিনীরে হৃদে দিনু স্থান।
নিজ শিব ভাঙ্গিনু চরণ-ঘায়!

কিন্তু এদিকে রামচন্দ্রের হৃদয় সীতাময়। পত্নীবৎসল প্রেমিক রামচন্দ্র সীতার জন্য বিলাপ করিতে করিতে যখন লক্ষ্মণকে বলিলেন—

সীতার জন্য সংশয়চিত্ত রামের বিলাপ

হৃদপিণ্ড ছেদি মহাশরে!
যাও, সীতা ল'য়ে বনে;—
কলঙ্ক-আগুনে বাঁচাও হে গুণনিধি,
ওহো—কাঁদে প্রাণ ভাইরে লক্ষ্মণ!

দৃঢ়চিত্ত লক্ষ্মণ যখন এই গর্হিত কার্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না তখন রামচন্দ্র কাতরভাবে বলিলেন—

বুঝিনু বুঝিনু ভাই তুমিও লক্ষ্মণ,
আজি ত্যজিলে পামরে ঘৃণায়
সেই হেতু না শুন বচন।

ভ্রাতৃবৎসল জ্যেষ্ঠানুরাগী অভিমানী লক্ষ্মণ তদুত্তরে বলিলেন—

লক্ষ্মণের আজ্ঞা-পালন

বজ্রপাতি লব বুকে তোমার বচন,
জ্যেষ্ঠ তুমি পিতৃসম মম,
কিন্তু এই খেদ মনে,
সেবিনু তোমায় প্রাণপণে—
ভাল কীর্ত্তি রাখিলে আমার!

পঞ্চ মাস গর্ভবতী সীতাকে শুদ্ধা অপাপবিদ্ধা জানিয়াও শুধু কলঙ্কের ভয়ে, শুধু বংশমর্যাদার ভয়ে—এত বড় একটা গর্হিত কার্য রামচন্দ্র করিয়াছেন গিরিশচন্দ্র তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। শ্বাপদ-সঙ্কুল ঘন-বন-সমাচ্ছন্ন নদীর কূলে সন্ধ্যা-কালে একাকিনী নিরপরাধিনী আজন্মশুদ্ধা গর্ভবতী পতিব্রতা রমণীকে বর্জন করিলে একজন সাধারণ মানুষকেও কেহ সমর্থন করিতে পারেন না—তাহাতে আবার সত্যসন্ধ অযোধ্যাপতি আদর্শ-চরিত্র রামচন্দ্রকে। শুধু প্রণয়ে সংশয় ও ঈর্ষা জন্মিলে চরিত্র বিকৃত হয়—মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া এইরূপ নির্মম কঠোর কাজ করিতে পারে। যদি শুধু লোকাপবাদ বা প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে বর্জন করিতে একান্ত প্রয়োজন হইত তবে সুদূর রাজ্যপ্রান্তে দ্বিতীয় প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা রামচন্দ্র অনায়াসে করিয়া দিতে পারিতেন—তাহাতে তাঁহার বংশমর্যাদা ও প্রজারঞ্জন এবং আত্মত্যাগ সব বজায় থাকিত। সেইজন্য মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া ও যুক্তিবলে গিরিশচন্দ্র তাঁহার পূর্বগামী মহাকবিদের পথ এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন নাই। তিনি আঁকিয়াছেন পত্নীপ্রেমে সংশয়াবিষ্ট মোহাচ্ছন্ন রামচন্দ্র। কিন্তু এই সংশয়াবেগ ক্ষণস্থায়ী—পরে অনুতপ্ত রাম অন্তর্বেদনায় চিরদিন ব্যথিত ছিলেন। লব-কুশকে দেখিয়া রামচন্দ্রের সন্তান-বাৎসল্য যখন উথলিয়া উঠিয়াছিল তখন লবকে দিয়া গিরিশ বলাইয়াছেন—

গিরিশের রাম-চরিত্রের বিচার

সন্তানের সাধ রাম যদি ছিল মনে,
গর্ভবতী সীতা কেন পাঠাইলে বনে?

শিশুদের দেখিয়া সীতাগত-প্রাণ রামচন্দ্রের সীতার স্মৃতি মনে উদিত হইতেছে আর—

পড়িল পড়িল মনে—
সীতার নয়ন দুটী।

রামচন্দ্রের জীবন তখন সীতাময়! মহর্ষি বাল্মীকির সহিত লব-কুশ অযোধ্যায় গিয়া রঘুপতিকে মহর্ষি-রচিত রামায়ণ-গান শুনাইতেছে—যখন তাহারা গীত গাহিতে গাহিতে গাহিল—

কাঁদ বীণা কাঁদরে,
গর্ভবতী সতী সীতা নারী-বর্জ্জন—

তখন রামচন্দ্র অধীর হইয়া বলিলেন—

মুনিবর, ক্ষমুন অধীনে,
নিবার' এ হৃদিভেদী গান!

তপস্বিনী জ্বলন্ত-পাবক-সমা শুদ্ধা পবিত্রা পতিগত-প্রাণা সীতা যখন রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইলেন তখন প্রজারঞ্জনার্থে ও লোকাপবাদভয়ে রামচন্দ্র তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিলেন না—রামচন্দ্র স্পষ্টই বলিলেন—

প্রিয়ে, চাহে প্রাণ বাহু প্রসারিয়া
লই হৃদে নয়নের নিধি,
হৃদি-বেগ করি সংবরণ!

হৃদয়ে জ্বলন্ত আগুন কিন্তু বাহিরে সৌম্য গম্ভীর মূর্তি—ইহাই রাম-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য!

যখন অযোধ্যা নগরে রাজা রামচন্দ্র প্রজাদের মনোরঞ্জনার্থে সীতাকে পরীক্ষা দিতে অনুরোধ করিলেন তখন অভিমানিনী সীতার ভাবটি গিরিশচন্দ্র অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

সীতার অভিমান

ন্যায়বান্ রাজা তুমি !
ধর দুটি দুখিনীর ধন—
কুশীলব, দুখিনী রে জননী তোদের !
সঁপে যাই—
দয়ার নিধান রবি-কুল-রবি করে।
হে প্রভু, জন্ম জন্মান্তরে—
যেন পাই তোমা সম স্বামী !
যেন, সীতা নাম কেহ নাহি ধরে ভবে !
ক'রেছিলে কাননে বর্জ্জন,
রেখেছি জীবন—প্রাণেশ্বর !
তোমার তনয়ে দিতে হে তোমার কোলে।
শুনেছি মেদিনি, জন্ম মম তব গর্ভে,
দে মা, অভাগীরে স্থান—
নাহি স্থান সীতার সংসারে !

এমন সুন্দর অভিমানচিত্র যে-কোনও সাহিত্যে দুর্লভ। সীতার এই কয়েক ছত্র স্নেহবৎসলা মাতৃমূর্তি ও তপস্বিনী পতিব্রতার চরম-আদর্শ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। গিরিশচন্দ্র সীতার চরিত্রে দেখাইয়াছেন আজন্ম তপস্বিনীমূর্তি, তাঁহার তপস্যাপুত প্রেম জগতের ধ্যানের বস্তু—নারীজাতির চরম আদর্শ—নারীর নারীত্বের ও মাতৃত্বের শাশ্বত-মূর্তি।

সীতারামের আদর্শ প্রেম এই মরজগতে দুর্লভ। বাস্তবিকই বিরহের অগ্ন্যুত্তাপে দগ্ধ না হইলে, কঠোর তপস্যায় ক্লিষ্ট হইয়া ত্যাগের পাবকশিখায় উজ্জ্বল না হইলে প্রেম পূর্ণ বিকসিত, মহিমদীপ্ত ও চিরস্থায়ী হয় না।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক চরিত্রগুলি একে একে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে গেলে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। বক্তৃতার ক্ষুদ্র পরিসরে তাহা দেখাইবার স্থান নয়। পৌরাণিক চরিত্র ব্যতীতও তাঁহার সৃষ্ট—শ্রীবৎস চিন্তায় "বাতুল" বাংলা নাট্য সাহিত্যে অতুলনীয়। সীতার বিবাহে "বিশ্বামিত্র" একটি রসচিত্র—কৃত্তিবাসের ছায়া! পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে "বৃহন্নলা" ও "উত্তরা" তাঁহার মৌলিক চিত্র—অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। দক্ষযজ্ঞের "দক্ষ" ও প্রহ্লাদ-চরিত্রে "হিরণ্য-কশিপু" গিরিশচন্দ্রের মৌলিক কল্পনা-মিশ্রিত অপূর্ব সৃষ্টি।

গিরিশের পৌরাণিক চরিত্র-চিত্র

গিরিশচন্দ্র পুরাণ-বর্ণিত চরিত্র যথাযথ রক্ষা করিয়া তাহা মানবীয় আকারে গঠন করিতে চেষ্টা করিতেন—মানবের সুখ, দুঃখ, প্রেম, ঈর্ষা ও যে দ্বন্দ্বরস মানব-চিত্তে ঘটিয়া থাকে তাহাই "দ্বাপর," "কলি," "শনি," "লক্ষ্মী," প্রভৃতি দেব-চরিত্রেও দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ যে পরম সুন্দর ও পরম প্রেম—তাহার মূর্তিমান্ বিগ্রহ পাইলেন শ্রীচৈতন্যে। গিরিশ তাই "চৈতন্য-লীলা" রচনা করিলেন। কবিকর্ণপূর তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকে রস-বিকাশের জন্য "ভক্তি" "বিবেক" "বৈরাগ্য" প্রভৃতি চরিত্র আনিয়াছেন—রসস্ফূর্তির জন্য গিরিশচন্দ্রও এই বিষয়ে

গিরিশের মানবীয় কল্পনা

গিরিশের চৈতন্য-লীলা

বৈষ্ণব নাটককারের অনুগামী হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের ও তাঁহার পার্ষদগণের আলেখ্য তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে আহরণ করিয়াছেন কিন্তু "জগাই-মাধাই"-চরিত্র তাঁহার বাস্তব জীবনের সহিত মিশ্রিত। তাই সেগুলি জীবন্ত—যেন যাদুকরের যাদুদণ্ড-স্পর্শে তাহারা অন্তঃপ্রকৃতির এক একটি দ্বার উদঘাটন করিয়া দেখাইতেছে। চরিত্রের রূপান্তর অঙ্কনে গিরিশচন্দ্র এইখানে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার বিকাশ করিয়াছেন। চরিত্রের রূপান্তর দেখানই নাট্যকারের নাট্য-কৌশল।

নাটকীয় চরিত্রের রূপান্তরে গিরিশের দক্ষতা

জগতের যে কোনও নাট্যকারের সহিত আমরা গর্বের সঙ্গে এই বিষয়ে গিরিশের তুলনা করিতে পারি। অত্যন্ত নীচ-সংসর্গী, নীচ কর্মে রত, দুর্দান্ত, দুর্দমনীয় চরিত্র, পরমাদর্শ ও পরমানন্দের স্বাদ পাইলে তাহার মনোভাব কিরূপ ভাষায় প্রকাশ হয় তাহা গিরিশচন্দ্র অলৌকিক শক্তি ও দক্ষতার সহিত চৈতন্য-লীলায় প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মাধাই। তুই অতো মাল্‌পো পেলি কোথা ?

জগাই। তোরে তো বল্লুম হাঁড়া চুরি করেছিলুম।

মাধাই। তাই বল্‌চি, হাঁড়া চুরি ক'র্‌লি কি ক'রে বল্‌ দেখি ?

জগাই। নাকে হাড়িকাঠ কেটে গিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকলুম আর কি! দোর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছি, ডুব্যাটা বৈরাগী ব'ল্‌লে "কোথা যাও ?" আমি হাঁ ক'রে বল্লুম—"কামড়াব"।

* * * * *

মাধাই। জগা, তুই নাচ্‌চিস কেন ?

জগাই। বৈরিগী হব। ব্যাটারা কিন্তু ভাই বেড়ে গায়—"হরিহে দেখা দাও।" মেধো! আমায় তেলক কেটে দিতে পারিস ? প্রেমসে কহো ভগী ময়রাণী! হরি হে দেখা দাও।

ইহার সাদা কথা—বৈরাগী হইয়া "প্রেম্‌সে কহো রাধারাণী হরি হে দেখা দাও"—ইহাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। অথচ তাহার ভাষা তাহাদের চরিত্রানুরূপ বাহির হইতেছে।

জগাই বৈষ্ণবদের সংকীর্তন দেখিয়া ভুলিতে পারিতেছে না, তাহার মনে রং ধরিয়াছে তাই আবার সে বলিতেছে—"চল্‌ না, কেত্তন শোনা যাক্‌ গে, ব্যাটারা বেড়ে বাজায় 'চাকুম চাকুম ভুশ্‌ ভুশ্‌ ভুশ্‌।'" মাধাই বলিতেছে—"তুই বড় গান শোন্‌নেওয়ালা।"

জগাই। ওরে বেশ এক রকম "রাধে রাধে" বলে। আমার ভাই রাধী নাপ্‌তিনীকে মনে পড়ে।

তাহার ভাবান্তর দেখিয়া মাধাই বলিতেছে—"তুই দেখ্‌ছি বৈরিগী হবি।"

চরিত্রের রূপান্তরের চিত্রে ইহা অপূর্ব! জগাইয়ের এই রূপান্তর সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে যেখানে মাধাই কলসীর কানা নিত্যানন্দের মাথায় ছুড়িয়া মারিয়াছে। অভিমানশূন্য প্রেমদাতা নিতাই—যখন তাহাদের অপরাধের জন্য পরম করুণাময়ের ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন তখন মাধাই পুনরায় মারিতে উদ্যত হইলে জগাই বাধা দিয়া বলিতেছে, "কখনই মার্‌তে দেব না!" নিতাইয়ের প্রেমের আহ্বান শুনিয়া জগাই বলিতেছে, "মেধো, হরি বল্‌, নইলে তোর সর্বনাশ হবে।"

গিরিশের রচিত পৌরাণিক নাটকগুলিতে বাংলাদেশে সংস্কার যুগের পর হিন্দুর পুনরুত্থান যুগের সহায় করিয়াছে—বাংলার গ্রামে গ্রামে আবালবৃদ্ধবনিতা পৌরাণিক চরিত্রগুলির সহিত পরিচিত হইয়াছে কিন্তু চৈতন্য-লীলায় বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল। আপামর সাধারণ চৈতন্য-লীলা দেখিয়া মুগ্ধ তো হইয়াছেই পরন্তু পরম প্রেমিক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, শাস্ত্রজ্ঞ ও ভক্ত-পণ্ডিত, এমন কি কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী সাধু মহাত্মারাও দেখিয়া নয়নজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়াছেন, ভাবে উন্মত্ত হইয়াছেন এবং প্রাণ খুলিয়া গিরিশকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-লীলা ঘরে ঘরে পঠিত হইত, তাহার গীতগুলি ভক্তিভরে কুলী, মজুর, কৃষকেরা পর্যন্ত গাহিত এবং এখনও গায়—বড় বড় ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে ও বৈঠক-খানায় উহা গীত হয়।

চৈতন্য-লীলায় বাংলায় তুমুল আন্দোলন

এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের মনেও রূপান্তর ঘটে। তাঁহার নিজের ভাষায় বলি—"ভাবিলাম জল, বায়ু, আলো, ইহ জীবনে যাহা প্রয়োজন—তাহা অজচ্ছল রহিয়াছে, তবে ধর্ম যাহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যা কথা; জড়বাদীরা বিদ্বান্—বিজ্ঞ, তাঁহারা যে কথা বলেন সেই কথাই ঠিক। ভাবিলাম, ধর্মের আন্দোলন বৃথা; এইরূপ তমাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দশবর্ষ অতিবাহিত হইল। পরে দুর্দিন আসিয়া ঠিক নিশ্চিন্ত হইতে দিল না।" এই সময়ে চৈতন্য-লীলা অভিনয় দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া—

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দর্শন ও গিরিশের মনের রূপান্তর

গিরিশচন্দ্রের সমুদয় সংশয় কাটিয়া গেল—নূতন ভাবধারায় তাঁহার জীবনে নূতন রং ধরিল। যাহা তাঁহার কল্পনার আদর্শ ছিল—যাহার বাস্তব রূপ তিনি শ্রীচৈতন্যের লীলায় মানসচক্ষে দেখিয়াছিলেন—তাহার সজীব পরিপূর্ণ রূপ গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণে প্রত্যক্ষ করিয়া অপার্থিব প্রেমের স্পর্শে আত্মহারা হইলেন। জগাই-মাধাইয়ের যে রূপান্তর তিনি ভাবে আঁকিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষরূপে দেখা দিল। ইংরাজী ১৮৮৪ সনের শেষভাগে গিরিশচন্দ্রের এই রূপান্তর ঘটে।

নাট্যকলায় তত্ত্ববিকাশ

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া গিরিশচন্দ্র এক নূতন জীবনের আস্বাদ পাইলেন। তাঁহার আদর্শ এবং ঈশ্বর এখন অভেদ। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত। যেন নূতন জীবন পাইয়াছি। পূর্বের সে ব্যক্তি আমি নই—হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য—ঈশ্বর আশ্রয়দাতা—এই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াসসাধ্য। এই ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিন-যামিনী যায়। শয়নে স্বপনেও এই ভাব,—পরম সাহস—পরমাত্মীয় পাইয়াছি—আমার সংসারে আর কোনও ভয় নাই। মহাভয়—মৃত্যুভয়—তাহাও দূর হইয়াছে।"

গিরিশের নূতন জীবনের আস্বাদ

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে গিরিশ এখন নিজের মান, যশ ও সমুদয় আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়া শুধু সাধারণের হিতকল্পে রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় এবং নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাও গিরিশচন্দ্রের মনের অসীম তেজ ও শক্তির পরিচায়ক।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে লোককল্যাণে গিরিশের নাটক-রচনা ও অভিনয়

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক লিখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে জাতির মর্মস্থান ধর্মে। প্রত্যেক জাতির একটা ভিন্ন ভিন্ন সুর আছে—সেই সুর তার প্রাণ। প্রাণ স্পর্শ না করিতে পারিলে তাহা জাতীয় নাটক হয় না। গিরিশচন্দ্র বলেন, "কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ও আছেন, তাঁহারা পরীক্ষার খাতিরে Gervinus, Schiller,

হিন্দু জাতির মর্মস্থান —ধর্ম

Gœthe প্রভৃতির নানা ভাষায় নাটক-সমালোচনা পড়িয়াছেন, কিন্তু সেই Schiller, Gœthe কৃত নাটকের উদার সমালোচনাতেও বুঝিতে বাকী আছে কি যে, জাতীয় উচ্চ নাটক জাতীয় হৃদয়ে সম্পূর্ণ অধিকার যাঁহার আছে—তিনিই লিখিতে সক্ষম।" সেক্সপীয়রের নামে ইংরাজ জাতির, মলিয়ারের নামে ফরাসী জাতির, সিলারের নামে জার্মান জাতির, ইব্‌সেনের নামে নরওইজান জাতির, মেটার্‌লিঙ্কের নামে দানিশ জাতির এবং কালিদাসের নামে হিন্দু জাতির যে প্রেরণা ও উন্মাদনা আসে ঠিক তাহা অপর জাতির নাট্যকার বা কবির নামে আসে না—শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনন্দ আসিতে পারে, কিন্তু জাতির মর্ম্মস্থান স্পর্শ করে না। পাশ্চাত্ত্যের কথা দূরে যাক ভারতবর্ষে ভিন্ন প্রদেশে যে সকল কবি জন্মিয়াছেন—তাঁহাদের কাব্যরস যেমন করিয়া কবির স্বপ্রদেশবাসীরা আস্বাদ করিতে মাতিয়া উঠেন—ভিন্ন প্রদেশের কবির কাব্যরসে কি তাঁহাদের সেরূপ উন্মত্ততা আসে? "তুলসীদাসে"র নামে হিন্দুস্থানী নরনারী, "জগন্নাথ দাসে"র নামে উৎকলবাসী, "শঙ্করদেবের" নামে আসামী এবং "নরসিং মেহেতা"র নামে গুজরাটবাসী যে আনন্দোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া পড়ে, সে আবেগ কি তাহারা আমাদের "চণ্ডীদাস" "কৃত্তিবাস" পড়িয়া পায়? আমরা বাঙ্গালী কি তাহাদের মত তেমনিই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ভিন্ন প্রদেশের সেই অমর কবিদের রসামৃত পান করিতে পারি? তাঁহাদের অপূর্ব কল্পনা—তাঁহাদের অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্য, তাঁহাদের অপূর্ব ভাবের তরঙ্গে আমরা মুগ্ধ হই, শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে আমাদের মস্তক নত হয়, আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয় সত্য, কিন্তু সেই উন্মাদকর অনুভূতি পাই না—শিরায় শিরায় আনন্দের

সে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহে না এবং সমগ্র জাতির সে প্রাণস্পন্দন হয় না। এই জন্য কবি ও নাট্যকার জাতীয় ইতিবৃত্ত ও আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া জাতীয় ভাবের ধারায় তাহা প্রকাশ করেন।

জাতীয় ইতিবৃত্তে নাটক-রচনা

গিরিশচন্দ্র হিন্দুর ধর্মভাবের ভিতর দিয়া—পুরাণ ও ধর্ম-সাহিত্যের ভিতর দিয়া—বাঙ্গালীর মর্মকথার ভিতর দিয়া—বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অতুলনীয় নাটকাবলী রচনা করিয়াছেন। এই তত্ত্বটি বুঝিয়া আমরা গিরিশচন্দ্রের মনের বিকাশ ও নাট্যকলার নৈপুণ্য বিচার করিব।

গিরিশচন্দ্র ইংরাজী ১৮৮১ হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত যে ৩৭ খানি নাটক রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে পৌরাণিক নাটক ছাড়া "চৈতন্য-লীলা" ও "বুদ্ধদেব-চরিত" নাটকে নাট্যকলার এক অভিনব আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। যদি কেহ এই দুইটি নাটককে ইংরাজীর Passion group-এর নাটক বলিয়া অভিহিত করিতেন তিনি তাহাতে প্রতিবাদ করিতেন। গিরিশচন্দ্রকে বলিতে শুনিয়াছি যে মহাপুরুষদের বাহ্য শান্তভাব দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের নিষ্ক্রিয় চরিত্রে কোন গতি নাই, কোনও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নাই, তাঁহাদের এক ধর্মের শান্তরস ছাড়া নাটকীয় বিষয়-বস্তু কিছু নাই—তাঁহারা ভ্রান্ত। যে মহা-পুরুষদের স্পর্শ, সঙ্গ এবং অপূর্ব আদর্শ-চরিত্র পারিপার্শ্বিক চরিত্রসমূহের গতি প্রদান করে, মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়া থাকে—আশ্চর্য ঘটনার সৃষ্টি ও বিপ্লব উত্থাপিত করে—তাহা যে উচ্চস্তরের নাটকের অপূর্ব কল্পনার বিষয়-বস্তু।

চৈতন্য-লীলা ও বুদ্ধদেব Passion group-এর নাটক নহে

পাশ্চাত্ত্যদেশে এই সব চরিত্র নাই বলিয়া তাঁহারা ইঁহাদের লইয়া নাটকের বিষয়-বস্তু করেন নাই—তাই বলিয়া কি আমরা সাহিত্যের এই উচ্চ কল্পনা হারাইব? শুধু মানবের ইন্দ্রিয়জ প্রেমই সাহিত্যের বস্তু আর অতীন্দ্রিয় রাজ্যের প্রেম সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া রহিবে? গিরিশ বলিতেন,—সাধারণতঃ নাটক ও উপন্যাসের বিষয়—নায়ক নায়িকাকে ভালবাসে বা প্রত্যাখ্যান করে—কিংবা প্রতিদান পায় না—নায়ক বা নায়িকার ভালবাসা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি বা রমণীতে অর্পিত অথবা নায়ক-নায়িকা ভালবাসার নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে বা পারে না। হত্যা, উদ্ধার, ভোগ ও বিরতি এই সব মালমসল্লা সুন্দরভাবে সাজাইলে তাহাই কি শুধু সাহিত্যের অপূর্ব সামগ্রী হইবে? আর যেখানে রাজপুত্র পরিপূর্ণ যৌবনে রাজপদ তুচ্ছ করিয়া পরম প্রেমময়ী যুবতী স্ত্রী ও সদ্যোজাত শিশুসন্তান ফেলিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে সত্য বস্তুর সন্ধান করিতে যাইতেছেন—তিনি আর নাটকের নায়ক হইতে পারেন না! যাঁহার অপূর্ব তপস্যা, অপূর্ব বৈরাগ্য, অপূর্ব প্রেম মানুষকে আত্মহারা করাইয়াছে—সংসারের স্নেহ প্রেম-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দলে দলে লোক যাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, হাজার হাজার বৎসর যাঁহাদের জীবন মানবজাতির মধ্যে প্রেরণা ও উন্মাদনা দিয়াছে—কত নাটকীয় ঘটনারাশির উদ্ভব করিয়াছে—তাঁহাদের চরিত্র কি সাহিত্যের বস্তু হইতে পারে না? তাঁহাদের চরিত্র নাটকের নায়ক হইতে পারে না? যে শ্রীচৈতন্য প্রেম ও ভাবের উজ্জ্বলতম আলেখ্য—যিনি

অতীন্দ্রিয় রাজ্যের প্রেম সাহিত্যের সার বস্তু

মহাপুরুষদের চরিত্র প্রকৃত নাটকীয় চরিত্রের আদর্শ

উচ্ছ্বসিত যৌবনের প্রারম্ভে বিদ্যা-গৌরবে ও রূপে নবদ্বীপের পূর্ণ-চন্দ্র ছিলেন, যিনি শচীমাতার একমাত্র অঞ্চলের নিধি—স্নেহের দুলাল, যিনি প্রেমময়ী যুবতী-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার হেমহার—যিনি সংসারের মান, যশ, স্ত্রী, মাতা—সব স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া নয়ন-জলে তাঁহার পরম প্রেমাস্পদের সন্ধানে যাইতেছেন—যিনি অপার্থিব প্রেমে গৃহভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিতেছেন—আত্ম-হারা হইয়া যমুনা-ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন—নিবিড় শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে সুমধুর হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া চলিতেছেন--যিনি নয়নজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া বলিতেছেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

হে জগদীশ! আমি ধন কামনা করি না, জন চাই না, সুন্দরী নারী প্রার্থনা করি না, কবিত্বশক্তিও চাই না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।"—তিনি কি নাটকের নায়ক হইতে পারেন না?

এইরূপ দ্বন্দ্বপূর্ণ ঘটনাবহুল আদর্শ-জীবন যদি নাট্য-সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও নায়ক-যোগ্য না হয় তবে আর কে হইবে?

দ্বন্দ্বে প্রতীকের সাহায্য

গিরিশচন্দ্র ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া নাটক রচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার "প্রহ্লাদ-চরিত্র", "নিমাই-সন্ন্যাস", "প্রভাস-যজ্ঞ", "বুদ্ধদেব", "বিল্বমঙ্গল", "রূপ-সনাতন", "পূর্ণচন্দ্র" ও "নসীরাম" ধর্মমূলক নাটক। ইংরাজীতে শুধু আবেগো-চ্ছ্বাসময় Passion group-এর নাটক নহে—নাটকীয় চরিত্রগুলি সজীব এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে—দ্বন্দ্ব-সংঘাতে

তাহাদের বিকাশ হইয়াছে। হৃদয়ের দ্বন্দ্ব দেখাইতে তিনি "বুদ্ধদেবে" প্রতীক চরিত্র অবলম্বন করিয়াছেন। "বুদ্ধদেবে"র "মার", "কুসংস্কার", "রাগ", "অরাতি", "কাম", ও "গোপার বেশধারিণী রতি" প্রভৃতি মনোবৃত্তির স্তরগুলিকে প্রতীক চরিত্রের রূপ দিয়া নাটকীয় সংস্থান, দ্বন্দ্ব ও গতি দেখাইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকসমূহে অনেক স্থলে প্রতীক চরিত্র আনিয়া রস ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রস্তাবনায় তিনি প্রাচীন প্রথামত মঙ্গলাচরণ ও নটনটীকে প্রবেশ না করাইয়া নাটকের তাৎপর্য কিংবা প্রারম্ভ বুঝাইতে নাটকীয় দৃশ্যে দেবদেবী বা দয়া প্রভৃতি গুণকে মানবাকারে উপস্থিত করাইয়া নাটকীয় কথোপকথনের ছলে বুঝাইয়াছেন। ইহা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকাদিতে কিংবা পাশ্চাত্ত্য নাটকেও নাই—এইরূপ প্রস্তাবনা গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ মৌলিক। কোথাও কোথাও "সূচনা ও পরিশিষ্টে"র দ্বন্দ্বে নাটকীয় ঘটনার অবতরণিকায় অতীত কাহিনী বিবৃত করিয়া নাটক আরম্ভ করিয়াছেন। নাটকে কোথাও ক্ষুদ্র কবিতাকারে প্রস্তাবনা আবার কোন কোন নাটকে কোনই প্রস্তাবনা, মঙ্গলাচরণ, অবতরণিকা প্রভৃতি কিছুই নাই। মূলকথা সুবিধা ও প্রয়োজন বুঝিয়া তিনি নাটকে উহা প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। কোনও দেশের সাহিত্যে ঠিক এইরূপ ধরনের *Prologue* নাই।

গিরিশের প্রস্তাবনা মৌলিক

গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল" নাট্য-সাহিত্যে এক অমূল্য রত্ন। ধূলা-কাদা-মাখা মানুষ স্তরে স্তরে কেমন শুভ্র কুসুমের মত নির্মল পবিত্র ও সুন্দর হইয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আনন্দলোকে

উত্থান করিতেছে—কেমন করিয়া রূপজ প্রেমের আকর্ষণে প্রেমোন্মত্ত মানুষ প্রাণ তুচ্ছ বোধে উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদীতে প্লবমান গলিত শবকে ভেলাজ্ঞানে অবলম্বন করে, কেমন করিয়া প্রেমিক নদী সাঁতরাইয়া রজ্জুভ্রমে সর্পকে আশ্রয়পূর্বক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রণয়িনীকে দর্শন করিতে ব্যাকুল হয়—গিরিশচন্দ্র অতুলনীয় তুলিকাস্পর্শে তাহা স্তরে স্তরে দেখাইয়াছেন। আবার মোহভঙ্গে এইরূপ প্রেমোন্মাদ পরম প্রেমাস্পদকে পাইবার জন্য এক মুহূর্তে সব ত্যাগ করিয়া যায়—আজন্ম সংস্কার কেমন করিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে, ঈপ্সিতের দর্শনের জন্য জড়জগতের সৌন্দর্যকে পরম বন্ধন জ্ঞানে কেমনভাবে সে দৃষ্টি নাশ করিতে স্বীয় চক্ষু উৎপাটিত করে এবং অন্তর্দৃষ্টিতে পরম প্রেমিক প্রেমাস্পদের সৌন্দর্যে আত্মহারা হয় তাহা গিরিশচন্দ্র মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া "বিল্বমঙ্গলে" প্রদর্শন করিয়াছেন। মনস্বী নাট্যশিল্পী আঁদ্রিভ যথার্থই বলিয়াছেন, "নাটকে ঘটনার গতিই একমাত্র সব নয় —ক্রিয়াহীন তপস্যার মধ্যেই নাটকীয় গতির আধিক্য দেখা যায়। বাহ্য ঘটনার অপেক্ষা সুষুপ্ত সুগভীর অনুভূতির মধ্যেই করুণরস অধিকতর বিদ্যমান।" বিল্বমঙ্গলের "পাগলিনী-" চরিত্র অতীন্দ্রিয় ভাবমিশ্রিত। চোর হউক, লম্পট হউক, দস্যু হউক—সকলের কাছে ভগবানের আহ্বান আসে। যখনই মানুষ কোনও অন্যায় দুষ্কার্যে রত হয়—যখনই মানুষ হতবুদ্ধি হইয়া নিরাশার ব্যাথায় কাতর হয়—তখন অনন্তের আহ্বান আসে। পাগলিনী সেই আহ্বানের প্রতীক-চরিত্র। ইহা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অনন্তের আহ্বান। গিরিশ সুকৌশল

বিল্বমঙ্গল নাটক

শিল্পীর মত তাহা আঁকিয়াছেন। প্রত্যেক চরিত্র মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে নিখুঁত, নাটকীয় ঘটনার অদ্ভুত গতিভঙ্গী—ভাববিকাশে জীবন্ত আলেখ্য। চিন্তামণি, থাকমণি, সাধক, চোর—সব এক একটি আস্ত চরিত্র।

বিল্বমঙ্গল ও অহল্যা-বাই

কেহ কেহ বলেন বণিক্ ও বণিক্‌পত্নীর দৃশ্য নারীজাতির হীনতাব্যঞ্জক। ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কিন্তু ভক্তমালে ও বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। গিরিশচন্দ্র পুরাতন কাহিনীকে বিকৃত করেন নাই—সর্বত্রই তাহা যথাযথ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যে দেশে স্ত্রীজাতি মৃত পতির সহিত সহমরণে মরিতে গিয়াছে—যে দেশে ধর্মের জন্য সংসার ও স্বামী ত্যাগ করিয়া পরম প্রেমে গাহিয়াছে—"মেরে তো গিরিধর গোপাল দোসরা না কোই"—যে দেশে সমুদ্রগর্ভে, নদীর তরঙ্গে মাতা আপনার নাড়ীছেঁড়াধন নিজ সন্তানকে নিক্ষেপ করিয়াছে—সে দেশে স্বামীর আদেশে স্বামীর তৃপ্তির জন্য দেহদানে অগ্রসর হইবে তাহা আর আশ্চর্য কি? আমরা আজ তাহা ঘৃণার চক্ষে দেখি, আজ নারী-প্রগতির দিনে ইহা নারীজাতির লাঞ্ছিত রূপের বীভৎস ছায়া, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দৃশ্যে বিল্ব-মঙ্গলের গভীর অনুতপ্ত হৃদয়ের বাণী ও হীনদৃষ্টির জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সেই বীভৎস দৃশ্যকে এক পরম সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে, বিল্বমঙ্গলের "মা" আহ্বানে নারীত্বের মাতৃ-মূর্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। অভিসারিকা অহল্যাবাইকে বিল্ব-মঙ্গল বলিতেছেন, "মা, তোমার স্বামীকে বল গে, আমি তোমার পাগল ছেলে; যাও মা, তোমার পতি-আজ্ঞা—আমার

কথা হেলন ক'ত্তে নেই।" অনুতপ্ত বিল্বমঙ্গল আত্মগ্লানিতে তাহার পর যে কঠোর কার্য করিলেন—তাহা শুধু বিস্ময়কর নহে—তাহা আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত। ভাষা—কত সংক্ষিপ্ত—কত অগ্নিবর্ষী।

মন, এখন' কি আঁখির মমতা কর ?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,—
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
"আমার" বলিয়ে, তুলে নেবে কোলে—
অন্য সব দেখিবে অসার।
যাও—যাও—নশ্বর নয়ন। (চক্ষু বিদ্ধ-করণ)
চল পদ, যথা ইচ্ছা হয়।

ক্রোচের মতে নাট্যকারের সৃষ্টিকামী মনই একমাত্র সত্য

সুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় সমালোচক ক্রোচে বলিয়াছেন নাট্যকারের পক্ষে প্রেক্ষাগৃহ, নাট্যমঞ্চ এবং দর্শকের জনতার কোন মূল্য নাই। তাঁহার সৃষ্টিকামী মনই একমাত্র সত্য—সেই ধ্বংসহীন মনের আবরণের ক্ষণিক উন্মোচনই যথার্থ নাটক-রচনা। বাস্তবিকই গিরিশচন্দ্রের "বিল্ব-মঙ্গল" তাঁহার অবিনশ্বর মনঃশক্তির—তাঁহার অপরিমেয় জ্ঞান ও অসীম অভিজ্ঞতার—তাঁহার অপূর্ব অবগুণ্ঠিত মনস্তত্ত্বজ্ঞতার ঈষৎ উন্মোচন। জগতের নাট্যসাহিত্যে তাহা একটি চিরস্থায়ী দান।

তিনি তাঁহার "রূপ-সনাতনে" "সনাতন"-চরিত্রে মনস্তত্ত্বের

দিক্ দিয়াই বৈষ্ণব কবিদের হইতে একটু ভিন্ন পথে গিয়াছেন। "চৈতন্য-চরিতামৃতে" লিখিত আছে—

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে রূপ-সনাতন

এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
শ্রীরূপ গোস্বামীর পত্রী আইল হেনকালে॥
পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দোপীর মহা ভাগ্যবান্।
কেতাব কোরান শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥
এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজ ধন দিয়া।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা॥
পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥

গিরিশের অঙ্কিত রূপ-সনাতন

গিরিশচন্দ্র দেখিলেন যে সনাতনের হরি-পাদপদ্ম-লুব্ধ মনে প্রবল বৈরাগ্যাধিকার করিয়াছে; যে সনাতন সংসারকে বিষবৎ মনে করিয়া রাজকর্মে বিরত ছিলেন এবং কারাগারের কঠোর দণ্ডও যাঁহাকে সত্য হইতে—তাঁহার আদর্শ হইতে—এক-বিন্দু পথচ্যুত করিতে পারে নাই সেই সনাতন স্তুতিবাক্যে ও প্রলোভনে কারারক্ষীকে প্রলুব্ধ করিয়া অসদুপায়ে নিজের কারামুক্তির জন্য চেষ্টা করিবেন—ইহা সংসারত্যাগ-কামী ভগবদ্‌পরায়ণ আদর্শ-চরিত্রের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি এইস্থানে নাটকীয় সুকৌশলে সনাতনের সাধ্বী স্ত্রী "অলকা" ও

কারারক্ষক "রামদিনের" মত প্রভুভক্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। রূপের পত্র সনাতনের বন্দি-জীবনের পূর্বে তাঁহার হস্তগত হয় এবং তাহাতেই তিনি রাজকার্যে ও সাংসারিক জীবন হইতে বিরত হন—পরে কারাগারে বদ্ধ হইলে তাঁহার এই ভাব পরিবর্তনের জন্য নবাবের কঠোর শাসনের আদেশ হয়। "অলকা" পুরুষের ছদ্মবেশে কনোজিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত সাজিয়া বিচারে "সনাতন"কে পরাজয়-পূর্বক তাঁহাকে রাজকার্যে প্রবৃত্ত ও সংসারী করিবেন এই প্রতিশ্রুতিতে নবাবের অনুমতি লইয়া কারাগারে প্রবেশ করেন। তীব্র জ্বলন্ত বৈরাগ্যের নিকট যুক্তিতর্ক সব ভাসিয়া গেল—শেষে অলকা পরিচয় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইলেন। ইহার পর রামদিন ও কারাধ্যক্ষ নসার খাঁর প্রতি নবাবের হুকুম হইল "জিঞ্জির লেয়াও—মাট্টিকা নিচু গারদমে রাখো যাঁহা কীড়া চল্‌তা—সুরয কা মুরত নেহি দেখ্‌নে পায়ে—এক মুঠি চানা আউর পানি দেও।" কারারক্ষক রামদিনকে তিনি বলিলেন, "রামদিন, আগর দুরস্ত হোয় তব্‌ নজরবন্দী রাখ্‌কে খবর ভেজো নেই তো গারদমে মরে!" অলকা ইহার পর একদিন রামদিনের নিকট জ্যোতিষিরূপে পুরুষবেশে দেখা করিলেন—পতির মুক্তির জন্য তাঁহার গায়ের অলঙ্কার লক্ষাধিক মূল্যের হীরা-জহরত দিতে চাহিয়া রামদিনকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন—আবেগে আর আত্মপরিচয় গোপন রাখিতে পারিলেন না—বলিয়া ফেলিলেন, "আমি কারারুদ্ধ উজীরের স্ত্রী—আমার স্বামীকে কারামুক্ত করিতে চাই।" রামদিন সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ্যাঁ! মা তুমি?" কিন্তু এইরূপ কার্যে অসম্মতি জানাইয়া বলিল, "এ আমার সাধ্যাতীত, নবাবের জোর হুকুম—আমার

গর্দানা যাবে।” কিন্তু অলকার কাতর প্রার্থনা অবশেষে এড়াইতে না পারিয়া সে বলিল, “মা, তুমি স্থির হও, অর্থ রাখ, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব, তোমার অর্থ তুমি রাখ, যদি অন্য কারুকে দিতে হয় দিও, ওতে আমার আবশ্যক নাই, উজীর সাহেব ধার্মিকপ্রধান, আমি হিন্দু—তাঁর সাহায্য ক'রব।” ইহাতে ব্যাকুলা সাধ্বী অলকা নিরস্ত না হইয়া কারারক্ষীকে অধিকতর প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টায় বলিলেন, “এ অর্থ তুমি নাও, আমার দাওয়ান বাহিরে আছে, যত অর্থ প্রয়োজন হয় দেবে। যাকে দিতে হয় দিও।” ধর্মভীরু রামদিন বলিল, “না, মা, পাপে মতি দিও না, যদি উজীর সাহেবকে মুক্ত করতে পারি, আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হব।” কিন্তু তাঁহারা যখন সনাতনকে কারামুক্ত করিতে গেলেন—সনাতন সব শুনিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন—

ত্যাগী সনাতনের বৈষ্ণব আদর্শ

নাহি জান বৈষ্ণবের রীতি!
হয় হৌক জীবন-সংশয়,
ছিল দেহ—গেল,
তাহে ক্ষোভ বৈষ্ণব না করে।
বৈষ্ণবের শমনের নাহি ডর—
ডরে মিথ্যা প্রবঞ্চনা।

প্রকৃত সাধু বৈষ্ণবের মতই বলিলেন—“প্রলোভনে বৈষ্ণব না টলে!” অলকার কাতর প্রার্থনায় সনাতন কর্ণপাত না করিয়া ববং তিরস্কার-পূর্বক বলিলেন—

যাও—যাও মিছে আর ক'রো নারে ছল,
একবার ভুলাইয়া প্রণয়-বচনে
মজায়েছ সংসার-সাগরে—
অলকার প্রতি সনাতন
পুনঃ ঘোর মিথ্যা-অন্ধকারে
মজাইতে সাধ তব,
যাও—যাও, আর কেন কর প্রতারণা ?

অবশেষে নিরুপায় রামদিন বলিল, "মহাশয়, আপনি বন্দী, আপনার স্বাধীন ইচ্ছা নাই, জানেন।" সনাতন তদুত্তরে বলিলেন, "যতদিন এ পাঞ্চভৌতিক দেহ-পিঞ্জরে বদ্ধ আছি ততদিন সকলেরই অধীন, কিন্তু ইচ্ছা আমার গৌরাঙ্গের রাঙা পায়ে লিপ্ত।"

রামদিন শৃঙ্খল মুক্ত করিলেও সনাতন বাহির হইলেন না। বৈষ্ণবকে—ভক্ত সাধুকে ভুলাইতে একটি মন্ত্র আছে—তাহা ভগবানের নাম ; ঈশান সেই উপায় অবলম্বন করিয়া "গৌরাঙ্গ" নাম করিতে লাগিল—সনাতন আত্মহারা ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সেই ভাববিহ্বল অবস্থায় প্রভুভক্ত পুরাতন ভৃত্য ঈশান যখন বলিল, "আমি গৌরাঙ্গের দাস, প্রভু আপনাকে ডেকেছেন, শীঘ্র আসুন" আত্মবিহ্বল সনাতন তখন ভাবাবেশে তাঁহার প্রাণের আদর্শ দেবতার সন্ধানে ছুটিয়া চলিলেন। সনাতনের এই চরিত্র—প্রকৃত বৈষ্ণব চরিত্র—বৈরাগ্যবান্ মহাত্মার ঘুষ দিয়া কারামুক্তি—মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া খাপ খায় না। গিরিশ সনাতন-চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল, নির্দোষ ও মধুর করিয়াছেন। অলকা, করুণা, বিশাখা প্রভৃতি

গৌরাঙ্গ-নামে-বিহ্বল সনাতনের কারাগৃহ ত্যাগ

স্ত্রী-চরিত্রগুলিও প্রেমোন্মত্তা বৈষ্ণব-রমণীর মনোহর ছবি। তাঁহারা রূপ, সনাতন ও বল্লভের যোগ্যা সহধর্মিণী।

"পূর্ণচন্দ্রে"র সুন্দরা-চরিত্র গিরিশচন্দ্রের অভিনব কল্পনা। সুন্দরা অবিবাহিতা, কুমারী, রাজকন্যা কিন্তু প্রগল্‌ভা—তাঁহার সখী সারীও সেইরূপ। ইহাতে দীনবন্ধুর "মালতী", "মল্লিকা" ও জলধরের "হোঁদল কুৎকুতের" অস্পষ্ট আভাস পড়িয়াছে। কিন্তু ইহারা উভয়ে ঋণী সেক্সপীয়রের নিকট—তাঁহার রচিত "The Merry Wives of Windsor" নাটকের নিকট। সেক্সপীয়রের "Sir John Falstaff" অননুকরণীয়—সাহিত্য-জগতের এক বিস্ময়কর অভিনব সৃষ্টি। অনেকেই ইহার অনুকরণ করিয়াছেন, ইহার ছায়াবলম্বন করিয়া দৃশ্য ও চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের নিকট ক্ষুদ্র জোনাকী পোকা—তুলনায় আসে না। তবে দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র একটা হাস্যরসের অভিনয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। দীনবন্ধুর নবীন-তপস্বিনীর জলধর এবং গিরিশচন্দ্রের মোহিনী-প্রতিমার জম্বুভয় ও পূর্ণচন্দ্রের দামোদর একজাতীয় চরিত্র।

সুন্দরা ও সারী-চরিত্রে মালতী-মল্লিকার ছায়া

সেক্সপীয়রের ফলস্টাফ-চরিত্রের নিকট দীনবন্ধুর ও গিরিশের ঋণ

সুন্দরার স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী ভাব ও তাহার প্রণয়ের ভান করিয়া বেড়ানো (flirtation) আমাদের এ দেশীয় নহে, তাহা সম্পূর্ণ পশ্চিমের ছায়া। সুন্দরা একটি প্রকাণ্ড রাজ্যের অধিশ্বরী কিন্তু সে যে কখনও রাজকার্যে বা প্রজার সুখদুঃখে কোনওরূপ সংশ্লিষ্টা আছে গিরিশচন্দ্র নাটকে তাহা একবারও

সুন্দরার চরিত্রে বিজাতীয় ছায়া

দেখান নাই। ইহা নাটকীয় সংস্থানের দোষ এবং নাটকীয় চরিত্রের একটা দুর্বলতা। শুধু রাজার আদুরে মেয়ে কুমারী রাজকন্যারূপে আঁকিলে সুন্দরার চরিত্রের সঙ্গতি কতকটা রক্ষা হইত। এই দোষের কথা ছাড়িয়া দিলে সুন্দরার চরিত্র গিরিশবাবুর শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক—তাহার প্রেম একটা উচ্চ ভাবে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাহার প্রেমের আদর্শ—যদি কাহারও চরণে সে আপনিই নত হইয়া পড়ে তবে সেই প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে সে পতিত্বে বরণ করিতে পারে। রাজ্য ছাড়িয়া নানাস্থানে দেশ-বিদেশে সে ঘুরিয়া বেড়ায়—তাহার ভাবী প্রেমাস্পদের সন্ধানের জন্য। কিন্তু হতাশ হইয়া সে মনে করে "দেখ্‌লেম, পৃথিবীতে পুরুষ নাই। যে বিদ্যাগর্বে গর্বিত আমার সঙ্গে বিচারে সে মূর্খের ন্যায় নির্বাক্ হ'ল। যে ধনগর্বে গর্বিত আমার ধনাগার দৃষ্টে চমকিত হ'ল, রূপগর্বিত আমার রূপদর্শনে দাস হয়েছে। পুরুষের প্রধান গর্ব তরবারি—রণস্থলে বিপক্ষরাজ আমার পতাকা দর্শনে তরবারি ত্যাগ করেছে।" কিন্তু সুন্দরা সন্ন্যাসী পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল—তাহার চরণে সে স্বতঃই নত হইল—মনে মনে তাহাকেই সে পতিত্বে বরণ করিল।

সুন্দরার অস্বাভাবিকতা

প্রেমার্থিনী সুন্দরা

কিন্তু সংসার-ভয়-পীড়িত কামকাঞ্চনত্যাগী কঠোর সন্ন্যাসী যুবক রাজপুত্র পূর্ণচন্দ্র তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। সে যে তাহার গুরুদেব গোরক্ষনাথের প্রিয়তম শিষ্য—গুরুর আজ্ঞা পালনই তাহার একমাত্র সাধনা। কিন্তু সুন্দরাও অপূর্ব সুন্দরী—

পূর্ণচন্দ্র ও সুন্দরা

সুন্দরা সুন্দরী—
বিধাতার নির্জ্জনে গঠন ;
কলেবরে ঋতুরাজ যেন বিরাজিত,
মদন ধরিয়া ধনু নয়নে প্রহরী,
হেরি কেশদাম—
অভিমানে ঝরে কাদম্বিনী,
বরণ-প্রভাবে চঞ্চলা দামিনী,
সহ সহচরী নিতম্বে প্রহরী রতি।

সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী সুন্দরা গোরক্ষনাথের নিকট অকপটে তাহার মনের কথা জানাইয়া পূর্ণচন্দ্রকে পতিরূপে চাহিল। শিষ্যকে পরীক্ষা করিতে তিনি সুন্দরার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। তাঁহার আদেশ হইল—

দিলাম তোমারে—তব যেবা অভিলাষ !
লয়ে যাও সন্ন্যাসীরে ;
যাও যোগী বামার সহিত
অঙ্গীকার রক্ষা কর মোর !

গুরুভক্ত পূর্ণচন্দ্র সুন্দরার অনুগমন করিতে করিতে বলিলেন, "অমৃত ত্যজিলি হায়, বিধি তোরে বাম।" কিন্তু সন্ন্যাসী আত্মচিন্তায় বিভোর, সে পরম সুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন—সুন্দরা তাহার অতুলনীয় রূপ ও প্রেমনিবেদিত হৃদয় দিয়াও প্রতিদান পাইল না। রূপজমোহে ও কাম-সম্ভোগের অশান্তিতে সে পুড়িতে লাগিল। রূপমুগ্ধ রাজপুত্রদের প্রতি সুন্দরার পূর্ব ব্যবহারগুলি স্মৃতিপটে উদিত হইল—

সুন্দরার অনুতাপ

যবে মম প্রণয় আশায়
ধরি পায়, রাজপুত্র করিত রোদন,
বিনয়-বচনে ঘৃণা হ'ত মনে
ভাবিতাম—একি হীন প্রাণ!

কিন্তু এখন "ফুলধনু প্রতিফল দিতেছে আমায়।" সে স্থির করিল—

এ জীবন রোদনে কাটাব।
দিছি স্থান যোগিবরে হৃদয়-আগারে,
তিনি মম স্বামী—
বঞ্চিব দিবস যামি তাঁর ধ্যানে আমি।

কিন্তু তাঁহার ব্যথিতা সহচরী ও সখী সারী সুন্দরার প্রতি পূর্ণচন্দ্রের প্রেম-বিমুখতা ও ঔদাসীন্য সহিতে পারিল না। সে সন্ধান করিয়া ঈর্ষাপরায়ণ গোরক্ষনাথ-শিষ্য সেবাদাসের নিকট হইতে যোগীর যোগ-ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে গোপনে ঔষধ সংগ্রহ করিল। সুন্দরাকে সেই ঔষধের কথা বলিলে সে দৃপ্তকণ্ঠে তাহার সখীকে বলিল—

সুন্দরা-চরিত্রে প্রেমের আদর্শ

দূরে করহ নিক্ষেপ;
ভেবেছ কি মনে
পশু সনে করিয়াছি প্রণয়-বাসনা?
চাহি প্রাণে প্রাণ বিনিময়!
নহে পশু-ক্রিয়া;
ভাব কি সজনি! মেষসম পতি করি সাধ?

ডোরে বাঁধা রবে, পাছে পাছে যাবে,
ফ্যাল ফ্যাল মুখ পানে চাবে
থাকিলে সে সাধ পূর্ণ হ'ত এত দিনে।
আসি কত জন পরিত বন্ধন—
নহে পত্নী—হতেম ঈশ্বরী।

সুন্দরা বড় যত্নে একটি ফুলের মালা গাঁথিয়া আনিয়াছে; তাহার একান্ত সাধ তাহার স্বীয় হৃদয়-দেবতাকে সেই হার পরাইবে। শিব-পূজা-রত পূর্ণচন্দ্র সেই হার দেখিয়া বলিলেন, "আহা অতীব সুন্দর মালা!" সুন্দরা তখন কাতর দৈন্যের সহিত তাহার প্রার্থনা জানাইল—

সুন্দরার প্রেম-নিবেদন

এক ভিক্ষা রাখ, যোগিবর!
যতনে কুসুম তুলি গেঁথেছি এ হার,
ধর উপহার, পর গলে,
তৃপ্ত কর তৃষিত নয়ন।

অতি অল্প কথায় শঙ্কিত চিত্তে সুন্দরা তাহার প্রাণের সাধ জানাইল। তদুত্তরে সন্ন্যাসী পূর্ণচন্দ্র বলিলেন—

পূর্ণচন্দ্রের আদর্শ ও সৌন্দর্যের ধারণা

জান না, জান না
কি শোভা পাইবে হার শঙ্করের গলে।
মাংস-পিণ্ডোপরে—
ফুলহারে কি শোভা হেরিবে?
শবোপরে ফুলের কি শোভা?

করে যাঁরে পবন ব্যজন,
যাঁর তরে তাতিছে তপন,
বনরাজি ধরে ফুল যাঁর পূজা হেতু,
যাঁর নাম ভবার্ণব-সেতু,
সেই অস্থিমালা গলে দেহ ফুলমালা।
না রহিবে বাসনা-জঞ্জাল,
নির্ম্মল অন্তরে—
ফুলহারে হের দিগম্বরে।

সুন্দরা আর ধৈর্যের বাঁধ রাখিতে পারিল না—সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবেগ-ব্যাকুলতায় জানাইল, "তুমিই আমার একমাত্র ঈশ্বর—ধ্যান জ্ঞান ও জীবন।" পূর্ণচন্দ্র তাহার উত্তরে বলিলেন—

সত্য যদি মনে মনে কিঙ্করী আমার,
ভিখারীর সনে যদি না কর কপট,
কেন তবে মজাইতে করেছ বাসনা?

পূর্ণচন্দ্রের প্রেমের উচ্চ আদর্শ

* * *

শুন সতি! সহধর্ম্মিণীর এই রীতি,
প্রাণপণে বাঞ্ছা করে পতির উন্নতি;
যোগভ্রষ্ট কেন মোরে করিবারে চাও?
বিদায় মাগিহে, ভিখারীরে ভিক্ষা দাও।

সুন্দরার শেষ-নিবেদন—"একবার আমাকে পত্নী বলিয়া ডাক, তাহা হইলে আমার জীবন সফল হইবে।" পূর্ণচন্দ্র সন্ন্যাসী—তাই তিনি বলিতেছেন, আমি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী,—কেন

এই অলীক সম্বন্ধ আনিতেছ? দৈহিক রমণ তো ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব!

আত্মায় আত্মায় আত্মিক রমণ!
সে রমণ না হয় ভঞ্জন,
গুরুপদে একত্রে মিলন,
আনন্দের লীলা অবিরাম!
সঁপ মন শঙ্কর-চরণে—
এক আত্মা হ'ব দুইজনে।
চিরদিন রবে
সে মিলনে বিচ্ছেদ না হবে।
করহ আত্মায় মন লয়
ভৌতিক সম্বন্ধ যত করি পরিহার!

আত্মায় আত্মায় মিলনই প্রেমের চরম নিরবচ্ছিন্ন মিলন

সুন্দরা পূর্ণচন্দ্রকে বাধা দিল না, শুধু জানাইল, "জন্মে জন্মে যেন তোমার কিঙ্করী হই।" বিদায় কালে বলিল—

যাও হে নির্দয়! যদি যাইতে বাসনা
তব পথে কণ্টক হব না।

বন্ধনমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের যাইবার সময় হৃদয়ের আবেগে প্রেমিকা সুন্দরা জানাইল—

ঈশ্বর না চাই—তোমা বিনা নাহি সাধ;
নমস্কার যোগী—ক্ষমা কর অপরাধ।

এখন হইতে সুন্দরাও তপস্বিনী সেবাব্রতধারিণী। সে এখন পূর্ণচন্দ্রের পাগলিনী মাতার শুশ্রূষাকারিণী—সেবিকা।

সুন্দরা এই মৌন তপস্যার ভিতর দিয়া তাহার প্রেমকে একটা নিবিড় আধ্যাত্মিকভাবে অনুরঞ্জিত করিল—ত্যাগের ভিতর দিয়া সেই প্রেমকে সম্ভোগ করিতে শিখিল—এই প্রেম ও পূর্ণচন্দ্রের বৈরাগ্য উমা-মহেশ্বরের ছায়া—তাই পট-পরিবর্তনে গিরিশচন্দ্র বুঝাইয়াছেন। হরগৌরীর আবির্ভাবে শিবাংশে পুরুষ ও উমা-মহেশ্বরীর অংশে নারী জাতির উদ্ভব। এই নর-নারীর তপস্যাদীপ্ত প্রেমে সেই শিবশক্তির সম্মিলন।

তপস্যার ও সেবার সুন্দরার প্রেমের বিকাশ

নরনারী উমা-মহেশ্বরের অংশ

গিরিশচন্দ্র "নসীরাম" নাটকে রূপজমোহ ও প্রেমের বিচিত্র রূপ দেখাইয়াছেন—তাঁহার "সোণামণি" চরিত্রে নারী-হৃদয়ের অদ্ভুত রহস্য দেখাইয়াছেন—আসুরিক ও দেবভাবের দ্বন্দ্ব—পশুপ্রকৃতি ও দেব-প্রকৃতির সংঘর্ষে দেব-প্রকৃতির জয়। "নসীরাম" দেব-মানবের একটি প্রতীক—শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর একটা আকার দিবার চেষ্টা। "এতদিন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ছিল—সে সম্বন্ধ কতদিন থাকে? এ প্রেমের সম্বন্ধ—প্রাণে প্রাণে গোলোক-বিহার।" আবার "কামে প্রেমে তফাৎ বোঝ্ : কাম স্বার্থপর—মনকে কুঁকড়ে দেয়—প্রেম জগদ্ব্যাপী—প্রাণ-মন জগদ্ব্যাপী হয়।" নসীরামের শেষ-কথা—"জগৎকে প্রেম দে—যে হীনের হীন তাকে প্রেম দে, রাইরাজার ঘরের প্রেম ফুরোবে না—যত পার বিলাও।" এই নসীরাম কামুক লম্পটের কাছে যাইতেছে, পতিতা-নারীর হৃদয়ে ভগবদ্‌ নামের বীজ রোপণ করিবার চেষ্টা করিতেছে—দ্বারে দ্বারে সকলের কাছে গিয়া সংসারের অসারতা ও নশ্বরত্ব বুঝাইতেছে,

নসীরাম নাটকে আসুরিক ও দেবভাবের দ্বন্দ্ব

এবং ভগবদ্‌ভক্তি ও ভগবন্নামের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু উচ্চতত্ত্বকথা থাকিলে কিংবা সাধু চরিত্রের শুধু মুগ্ধকারী বাণী থাকিলেই তাহা নাটক হয় না, নাটকীয় ঘটনা ও সংস্থান থাকা চাই। "বিরজা," "অনাথনাথ," "রাজা," "কাপালিক" ও "সোণামণি" এই নাটকের উপাদান। রাজপুত্র অনাথনাথের বিরজার প্রতি আকর্ষণ নাটকের সূচনা ও গতি, "রাজা" ও "কাপালিক"—অনাথনাথের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী, ধর্ষিতা রমণী "সোণামণি"র প্রতিহিংসা—নাটকীয় গতিকে বর্ধিত করিয়াছে এবং "নসীরাম" সকল নাটকীয় গতির কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া গতিকে ঊর্ধ্বমুখী করিতেছে। তাঁহার "কথাগুলি"—এক এক জনের হৃদয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিকাশ করিতেছে—বিভিন্ন রসকে করুণ-প্রবাহে শান্তিরসে পরিণত করিতেছে। বিভিন্ন রসকে—ভিন্ন ভিন্ন ধারাকে একমুখী স্রোতে প্রবাহিত করাতে নাটকে অদ্ভুত শিল্প-নিপুণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর "বিষাদে" গিরিশচন্দ্র "সরস্বতী"র অপূর্ব ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। "সরস্বতী" রাজরানী হইয়াও পতিপ্রেম-কাঙ্গালিনী—পতির দর্শনসুখে বঞ্চিতা। শুনিয়াছে তাহার স্বামী বেশ্যা-প্রেমে উন্মত্ত—তাই সরলা বালিকা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "মন্ত্রী, বেশ্যা কি বল্‌তে পার?" "আমি বেশ্যা হব।" মন্ত্রী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "একি কথা মা?" পরে যখন সে বুঝাইল বেশ্যারা ঘৃণা-লজ্জা-বর্জিতা শুধু অর্থপণে দেহ বিক্রয় করে এবং হাব-ভাব-কটাক্ষে কুরুচিসম্পন্ন পুরুষকে প্রলুব্ধ করে—জগতে তাহারা ঘৃণিতা। সংসারানভিজ্ঞা পতিব্রতা সরস্বতী তদুত্তরে বলিল, "মন্ত্রী, তুমি জান না, বেশ্যারা

সংসারানভিজ্ঞা বিষাদের পতিপ্রেম

অবশ্যই গুণসম্পন্না, আমি নির্গুণা, তাই আমায় উপেক্ষা করেন।" মন্ত্রী অবার বুঝাইয়া বলিল, "মা! তুমি সরলা তাই কুলটার রীতি জান না"—নারীর মত অবয়ব হইলেও তাহারা ঋক্ষ, ব্যাঘ্র পশুদের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। তাহারা পিশাচী, তাহাদের সংস্পর্শে মানুষের নরকে বাস হয়। তাহারা নারীর আকারে পিশাচী। তখন পতিপ্রেম-বিহ্বলা সরস্বতী বলিল—

যারে মম স্বামী সমাদরে—
তার সম পুণ্যবতী কে আছে জগতে?
আমি ঘৃণ্যা, কভু নহি দাসী যোগ্যা তাঁর!
* * * *
সত্য কহি দাসী হব তাঁর—
দিবানিশি সেবিব তাঁহার পদ।

সত্যই এই নিরপরাধিনী সাধ্বী সতী পুরুষের ছদ্মবেশে অলর্ক ও উজ্জ্বলার দাস-কার্যে নিযুক্ত হইল। নিজে তাহার নামের পরিচয় দিল "বিষাদ"। সেক্সপীয়রের "The Two Gentlemen of Verona" নাটকে প্রেমাস্পদ Proteus-এর জন্য Julia এই রকম পুরুষের ছদ্মবেশে Sebastian নাম ধারণ করিয়া দাস্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু "বিষাদে" জুলিয়ার এইটুকু ছায়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু মিল নাই। জুলিয়ার সহিত প্রোটিয়াসের মিলন ঘটিয়াছিল, কিন্তু বিষাদ অলর্কের জীবন-রক্ষার জন্য আত্মজীবন বলিদান করিয়াছে—তাহার সেই অন্তিম নিঃশ্বাসের সময় হতভাগ্য অলর্ক তাহার সত্য পরিচয় পাইয়াছিল। অলর্ককে প্রলুব্ধ করিতে নদী-বক্ষে

বিষাদ-চরিত্রে সেক্সপীয়রের জুলিয়ার ছায়া

ময়ূরপঙ্খী বজরায় পরম রূপবতী উজ্জ্বলার গীতলহরীতে অসামান্যা রূপসী ক্লিওপেট্রার কথা স্মরণ-পথে উদিত হয়। সেক্সপীয়রের Antony and Cleopatra নাটকের হুবহু ছবি লইয়া যে গিরিশচন্দ্র এই দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন তাহা Enobarbusএর নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি পড়িলেই বুঝা যাইবে ঃ

উজ্জ্বলা ও অলর্কে সেক্সপীয়রের আণ্টনি-ক্লিওপেট্রার ছায়া

"The barge she sat in, like a
burnished throne,
Burn'd on the water : the poop
was beaten gold ;
Purple the sails, and so
perfumed that
The winds were love-sick
with them ; th' oars were silver,
Which to the tune of flutes
kept stroke, and made
The water which they beat to
follow faster,
As amorous of their strokes.
For her own person,
It beggar'd all description :
she did lie
In her pavilion—cloth-of-gold
of tissue—
O'er-picturing that Venus
where we see
The fancy outwork Nature :
on each side her

Stood pretty dimpled boys, like
smiling Cupids,
With diverse-colour'd fans,
whose wind did seem
To glow the delicate cheeks
which they did cool,
And what they undid did."

বিষাদের মাধব্য-চরিত্রে বুঝা যায় সদুদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কুটিল পথে গমন করিলে কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হয়। কূটচক্রের পরিণামই বিষময়।

গিরিশচন্দ্রের মনে প্রথম সঙ্গীত—পরে সঙ্গীত-বহুল পালা-রচনা—পরে প্রয়োগ-বিজ্ঞান-কৌশল অভিনয়—পরে গীতি-বহুল নাট্য—পরে ওরিয়েণ্টাল অন্তর্ভুক্ত রোমান্টিক—পরে ক্লাসিক, তৎপরে Neo-classic, Neo-romantic নাটক-রচনা-পদ্ধতি, অবশেষে গার্হস্থ্য নাটকের কল্পনা উদিত হয়। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র নিপুণ নাট্যকার এবং তাঁহার সর্বপ্রথম বিয়োগান্ত গার্হস্থ্য নাটক "প্রফুল্ল"।

"প্রফুল্ল" নাটক গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্যে অপূর্ব দান। শুধু বাংলা সাহিত্যে নহে—জগতের সাহিত্যে—অদ্ভুত নাট্য-শিল্পের সমাবেশ। "যোগেশ" ও "রমেশ'—

নাট্যসাহিত্যে "প্রফুল্ল"

দুই জনই স্ত্রী-হত্যাকারী। ইহারা কেহই ইচ্ছা করিয়া স্ত্রী-হত্যা করে নাই। ঘটনাচক্রে দুই জনই স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ। "যোগেশ" বুভুক্ষু অনশনক্লিষ্ট "যাদবে"র হাত হইতে খাবার কিনিবার পয়সা ছিনাইয়া লইয়াছে, ক্ষুধার তাড়নায় সে মরুক কি বাঁচুক তাহাতে তাহার দৃষ্টি

নাই। রমেশও চিকিৎসার ভানে অনাহারে যাদবকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অদ্ভুত নাট্যশিল্প-কৌশলে একই কার্যে দর্শকদের মনে দুইটি ভিন্ন ভাবের উদয় হইতেছে। রমেশের কার্যে বিরক্তি এবং যোগেশের কার্যে সহানুভূতি-বশতঃ দুঃখ। একই বিয়োগান্ত নাটকে একইরূপ ঘটনার সংস্থানে বিভিন্ন ভাব ও রসের উদ্রেক জগতের আর কোনও নাট্য-সাহিত্যে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বিয়োগান্ত নাটকে গিরিশচন্দ্রের ইহা অপূর্ব দান। অথচ নাটকীয় ঘটনা এত স্বাভাবিক এবং সাবলীল গতিতে চলিতেছে যে, এই অপূর্ব শিল্প-রূপ কাহারও সহসা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। নাটকের ঘটনার গতি রমেশের কূটচক্রে চলিতেছে অথচ রমেশ নায়ক নহে—নায়কের যে সব গুণ প্রয়োজন তাহা রমেশের নাই। যোগেশের মধ্যে নায়কোচিত গুণ থাকিলেও সে নাটকের গতি নিয়ন্ত্রিত করে না—সে শুধু দ্রষ্টা, অথচ নাটকের সরল গতিরই ক্রিয়া তাহার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাই তাহাকেই নাটকের নায়ক বলিয়া অনেকের নিকট প্রতীয়মান হয়। নাটকের মূল চরিত্র প্রফুল্ল শতদল পদ্মকোরকের ন্যায় দলে দলে প্রস্ফুটিত হইতেছে। প্রথম আমরা প্রফুল্লকে দেখিতে পাই সরলা বালিকাবধূ, শাশুড়ীর আদরিণী শুশ্রূষাপরায়ণা ও স্নেহশীলা, সংশয়হীন-হৃদয়া—স্বামীর প্রতি তাহার গভীর প্রেম ব্যক্ত হইতেছে একটা সামান্য কথায়—"দুটো মাদুলী এনো, আমিও একটা চুপিচুপি প'রে থাকবো, যদি ওঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়।" ঘটনার

"প্রফুল্ল" নাটকে একই কার্যে বিভিন্ন চরিত্রের দ্বারা ভিন্ন ভাব ও রসের প্রকাশ জগতের নাট্য-সাহিত্যে গিরিশের দান

প্রফুল্ল-চরিত্রের বিকাশ

ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তর্দ্বন্দ্বে এই সরলা বালিকার সত্যপ্রিয়তা ও চরিত্রের দৃঢ়তা স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যখন রমেশ এই সরলা বালিকাকে নানা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া ভয় দেখাইয়া বুঝাইতেছে সুরেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে—মিথ্যা কথা বলিলে সুরেশের মেয়াদ হইবে না—তখন দেবরের জন্য ব্যাকুলা হইয়াও সে তাহার স্বামীকে বলিতেছে, "ওগো, তুমি আমার সব গহনা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ঠাকুরপোর জন্য আমার বড় প্রাণ কেমন ক'রছে।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিল, "আমি মিছে কথা বল্‌তে পার্‌বো না, ঠাকরুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়।" অতঃপর রমেশ এই ধর্মভীতা নারীকে ধর্মভয় দেখাইবার জন্য বলিল, "আমার কথা শুন্‌বি নি? আমি তোর স্বামী, মা তোকে শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস্‌, স্বামী গুরু লোক, স্বামীর কথা শুন্‌তে হয়।" তাহার উত্তরে উপায়হীনা বালিকা বলিল, "আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।" তাহাতে রমেশ বিরক্ত হইয়া তাহার উপর তর্জন-গর্জন করিল। তখন বালিকা মাত্র দুইটি কথায় উত্তর দিল, "আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।" কি সুন্দর সরল উক্তি!

প্রফুল্ল যখন জ্ঞানদার মুখে শুনিল, রমেশই তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়াছে, তখন এই সরলা রমণী বিস্মিতভাবে বলিল, "তোমাদের তাড়িয়ে দিলে? তবে যে ব'ল্লে তোমরা চ'লে এলে—ও কি সব মিছে কথা কয়? তবে আমি ওঁর কথা শুন্‌বো কেমন ক'রে? মা আমায় কি ব'লে দিয়েছেন, স্বামীর কথা কি ক'রে শুন্‌বো? মিথ্যা কথা কি ক'রে শুন্‌বো?" সত্যপ্রাণা নারীর হৃদয়ে সত্যের আঘাত লাগিল—তাই দারুণ

হৃদয়দ্বন্দ্বে নিরুপায় হইয়া সে বলিল, "দিদি; আমি খাব না, কিছু কর্‌বো না—আমি মর্‌বো।" জ্ঞানদা তাহার এই মরণ-সঙ্কল্প শুনিয়া ছোট যাকে বুঝাইলেন, তিনি এতক্ষণ তামাসা করিতেছিলেন। প্রফুল্ল বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বল।" এই স্বভাবনম্রা নারী সারা রাত্রি জাগিয়া পাগলিনী উমাসুন্দরীকে প্রহরীর ন্যায় সতর্ক দৃষ্টিতে রাখিতেছে, প্রয়োজনমত সেবা-শুশ্রূষা নিজ হাতে করিতেছে, আবার ব্যাকুল হইয়া জ্ঞানদার ভগ্ন গৃহকুটিরে গিয়া স্বামীর দুরভিসন্ধি জানাইয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া অর্থসাহায্য করিতেছে। প্রফুল্ল যখন মদন ঘোষের নিকট জনিতে পারিল—যাদব রমেশের হস্তে পতিত হইয়াছে এবং তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে তখন তাহার নারীত্বে মাতৃমূর্তির বিকাশ হইল—সে দৃঢ়তার সহিত মদন ঘোষকে বলিল, "আমি ছেলেকে বাঁচাব, মদন দাদা, শিগ্‌গির বল—কোথায়?" সরলা নির্ভীক হৃদয়ে ব্যাঘ্রবিবরে প্রবেশ করিল।

নাটকের চরম দৃশ্যে মৌন প্রফুল্ল মুখরা—তাহার অন্তরের ধর্মজ্যোতি ও পতিপ্রেম ফুটিয়া বাহির হইল—ক্রুদ্ধ রমেশকে সে বলিল, "আমার ভাল চাইনি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি! আমি এতদিন মার জন্য অস্থির ছিলেম—আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি।" প্রফুল্ল অন্তিমকালে বলিয়া গেল, "আমি জান্‌তেম না যে এ সংসারে এত প্রতারণা!" স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিতেছে, "দেখ, তুমি স্বামী। তোমার নিন্দা কর্‌বো না—জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে আপনার করনি।

প্রফুল্লের পতিপ্রেম ও আত্মত্যাগ

আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—'জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন।'" প্রফুল্লের এই আত্ম-বলিদান—পিশাচ হৃদয়হীন স্বামীর জন্য এই গভীর অনুভূতি এবং তাহার প্রতি অকপট উদার প্রেম, এমন কি মৃত্যুকালেও হত্যাকারী স্বামীর অপরাধ-ক্ষমার জন্য জগদীশ্বরের নিকট তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা—অনুপম। ইহা প্রেমের মহান পবিত্র আদর্শ—জগতের চির-বরণীয়। সত্যই প্রফুল্ল নাটক নাট্য-শিল্পের অত্যুজ্জ্বল রত্ন।

যোগেশ-চরিত্রে সুরা-পানের পরিণাম, ঈশ্বরে আস্থাহীন নৈতিক জীবনের দুর্বলতা ও অধঃপতনে ক্রমশঃ চরম সীমা দেখানো হইয়াছে

যোগেশ-চরিত্রে তিনটি জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথম—সুরাপানের ভীষণ পরিণাম, দ্বিতীয়—সংসারের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে শুধু নাম-যশঃ-প্রতিষ্ঠাকামী ঈশ্বরে আস্থাহীন কর্ম্মময় নৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড কত দুর্বল, তৃতীয়—দুর্বলতার প্রশ্রয় দিলে মানুষ দিন দিন অধঃপতনের চরম সীমায় কেমন করিয়া পতিত হয়। যথার্থ পাপকর্ম-নিরত পাপিষ্ঠদের অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল-চরিত্র মানবের পাপানুষ্ঠানকে মানুষ ক্ষমাপূর্বক সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। বিয়োগান্ত করুণ-সুর মানব-দুর্বলতার ভিতরেই ধ্বনিত হয়। ম্যাক্‌বেথের হত্যা-কার্য এবং ওথেলোর নারীহত্যা বিয়োগান্ত করুণ-সুরে সহানুভূতির ঝঙ্কার তুলিয়া থাকে। আমরা পাপিষ্ঠ ইয়াগোর প্রতি বিরক্ত হই—সেখানে সহানুভূতি জাগায় না।

নাটকের গতিক্রিয়ার নায়ক না হইয়াও যোগেশ নায়কের স্থান অধিকার করিয়াছে। সেক্সপীয়রের "King Lear" বা "Macbeth"-এর মত প্রফুল্ল নাটকের নায়ক এক জন নহে—দুই জন। এইরূপ দ্বিনায়কত্ব পাশ্চাত্ত্য নাটকে অভাব নাই।

ওথেলো নাটকে ওথেলো একমাত্র নায়ক নহে, ইয়াগোও অপর একজন নায়ক। ডেসডিমোনাকে হত্যা ছাড়া ওথেলোর আর কোনও উল্লেখ-যোগ্য ক্রিয়া নাই—ইয়াগো রমেশের মত নাটকের আগাগোড়া গতির নায়ক।

প্রফুল্ল নাটকে দ্বিনায়কত্ব (twin heroes)

Thomas Otway রচিত Venice Preserved এবং The Orphan নাটকেও আমরা দুইজন নায়ক দেখিতে পাই। Orphan নাটকে Polydoreই হউক বা Castalioই হউক কেহ একক করুণ-রসাত্মক সংস্থানের সৃষ্টি করিতে পারিত না। Venice Preservd নাটকে Jaffier-এর দুর্বলতার সহিত Pierreর নিষ্ঠুরতার যোগাযোগ না থাকিলে ভয়াবহ করুণ দৃশ্য ঘটিত না। দুর্বলচরিত্র যোগেশের সহিত দুর্দমনীয় বিষয়লোভী রমেশের সহযোগিতা না থাকিলে "প্রফুল্ল" নাটকের মর্মভেদী করুণ দৃশ্যের আবির্ভাব হইত না। গ্রন্থকার নাটকের আত্মত্যাগ-পরায়ণা দৃঢ়চেতা সরলা ধর্মপ্রাণা নায়িকার নামেই তাই প্রফুল্লের নামকরণ করিয়াছেন। "প্রফুল্লে"র মত নারীসুলভ-কোমলতাব্যঞ্জক অথচ দৃঢ়চরিত্র নায়িকা যে কোনও ভাষার নাট্যসাহিত্যে দুর্লভ।

প্রফুল্লের পরই গিরিশচন্দ্র মিলনান্ত "হারানিধি" নাটক রচনা করিয়াছেন। বিয়োগান্ত নাটকের মত ইহাতে ভাবরসের বিশালতা, মহত্ত্ব এবং গাম্ভীর্য আছে। এই জাতীয় নাটককে পাশ্চাত্ত্য দেশে Serious Comedy অর্থাৎ গাম্ভীর্যভাব-মূলক মিলনান্ত নাটক বলে। নীলমাধবের মাতৃসম্বোধনে পতিতা কাদম্বিনীর চরিত্রে মাতৃভাবের উদ্দীপন নাট্যশিল্পীর

হারানিধি গাম্ভীর্য-ভাবমূলক নাটক

অসামান্য তুলির স্পর্শ। "সুশীলা" বাস্তবের ছায়ায় আদর্শ-মূলক চিত্র। "অঘোরে"র ন্যায় চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নূতন এবং অপূর্ব। এই অঘোরই হারানিধি; "মোহিনী", "হরিশ", "নীলমাধব", "হেমাঙ্গিনী"—সকলেই এক একটা সজীব চিত্র। মিলনান্ত নাটকে হাস্যরসের প্রাচুর্য থাকা চাই—বিয়োগান্ত নাটকেও হাস্যরসের ঘটনা বা দৃশ্য থাকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য। হারানিধিতে দারোয়ান ধনীরাম, পাহারাওলা, মুটে, গাড়োয়ান, জমিদারের লোক ও অঘোর প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর হাস্যরস আছে। অঘোরের হাস্যরসের ভাষা একটু স্বতন্ত্র—ভজহরির একটু আমেজ তাহাতে পাওয়া যায়।

চণ্ড ও মলিনা-বিকাশ

ইহার পর গিরিশচন্দ্রের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক "চণ্ড"। রাজপুতদের বীরত্ব কাহিনী। অতঃপর তাঁহার গীতি-নাট্য "মলিনা-বিকাশে" বিশেষ নূতনত্ব কিছু নাই। এই দশ বৎসরে গিরিশ বাংলার রঙ্গভূমির একটা স্থায়ী রূপ দিয়াছেন, নাটক-রচনা-পদ্ধতির আদর্শ দেখাইয়াছেন, নাটকে নূতন ধরনের ভাষা ও ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-নরনারী সকলেই নূতন আনন্দরস সম্ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত গিরিশ "চন্দ্রা" নামে একখানি সুদীর্ঘ উপন্যাস, মাসিক পত্রিকায় নানা বিষয়িণী রচনা, এবং একটি ছোট গল্প ও দুইটি নক্সা প্রকাশ করিয়াছেন।

দশ বৎসরে বাংলার রঙ্গভূমির স্থায়ী রূপ

তাহার পর প্রায় তিন বর্ষ গিরিশ নীরব ছিলেন, কারণ এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্রের ও দ্বিতীয়

পত্নীর বিয়োগ হয়। তাহা ছাড়া গিরিশচন্দ্র স্বয়ং কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। ইহার পর গিরিশ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করান এবং সর্বপ্রথম সেক্সপীয়রের "ম্যাক্‌বেথ" অনুবাদ করিয়া অভিনয় করেন।

তাঁহার এই অনুবাদ অনুবাদ-সাহিত্যের অপূর্ব আদর্শ। ইহাতে গিরিশচন্দ্রের অতুলনীয় মনঃশক্তির ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশীয় ভাষা ও ভাবকে কিরূপে আয়ত্ত করিয়া তাহা মাতৃভাষায় প্রকাশ করা যায়—তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বাংলায় ম্যাক্‌বেথের অনুবাদ। পড়িলে মনে হয় ইহা যেন তাঁহার ঠিক মৌলিক রচনা, এমন কি ডাইনীদের কথা পর্যন্ত। কিন্তু মূলের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায় ইহা আক্ষরিক অনুবাদ—একটি কথাও বাদ পড়ে নাই। এই দশকে গিরিশবাবুর "মুকুলমুঞ্জরা", "জনা", "কালা-পাহাড়", "মায়াবসান", "পাণ্ডবগৌরব", "মনের মতন"—এই ছয়-খানি নাটক উল্লেখযোগ্য। প্রেমের প্রভাবে মূক যে বাচাল হয়, তাহা স্তরে স্তরে সুনিপুণ নাট্যশিল্পকৌশলে গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন।

গিরিশের ম্যাক্‌বেথ

মুকুলমুঞ্জরায় তারার হৃদয়দ্বন্দ্ব

মুকুলমুঞ্জরায় "বরুণচাঁদ", ও "ভজনরাম" হাস্যরসের উৎস। কাব্যসৌন্দর্যের মাধুর্য, নাটকীয় সংস্থান এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী সুনিবদ্ধ। ইহা রোমাণ্টিক-জাতীয় মিলনান্ত নাটক। তৃতীয় অঙ্কে তৃতীয় গর্ভাঙ্কে প্রেমিক প্রেমিকাদের হৃদিদ্বন্দ্বের বিকাশ। "তারা"র মনের ব্যথা এই কয় ছত্রে কেমন সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে।

"আমার সুখের হাটে—সুখের বেসাত, লাভে হারাই মূল।
ভুল পশরা মাথায় নিয়ে, আপন হ'ল ভুল॥

যত্নে-কেনা বিষের ডালি রাখি হৃদয়-মাঝে—
সাধ ক'রে তায় জানাই জ্বালা—বারণ করে লাজে ॥
বুঝে সুঝে প্রাণ বোঝে না, নয়ন-বারি সার।
যত্নে গাঁথি দিবানিশি নয়ন-জলে হার ॥"

প্রেমে রোদনই হৃদয়ের উচ্চশিক্ষা

ব্যথিত মুকুল বলিতেছে—"বুঝি রোদনই হৃদয়ের উচ্চশিক্ষা? প্রেমের সার রোদন—তাই প্রেম পরম বস্তু।"

মাইকেল-রচিত জনা-চরিত্রের আভাসে জনা-নাটক

"জনা"—পুত্রহারা উন্মাদিনী জননীর চিত্র—মাইকেল মধুসূদন বীরাঙ্গনা কাব্যে যে কয়েক ছত্রে "জনা" চরিত্রের ইঙ্গিত দিয়াছেন গিরিশচন্দ্রের "জনা" তাহারই পূর্ণতম বিকাশ। তেজস্বিনী পুত্রশোক-বিহ্বলা উন্মাদিনীর হৃদয়ের অগ্নিবর্ষী উচ্ছ্বাস। জনার আগ্নেয়-গিরির অগ্নিস্রাব জ্বালাময়ী ভাষায় নির্গত হইয়াছে। জগতের যে কোনও সাহিত্যের পাশে ইহা স্থান পাইতে পারে।

"জনা"র বিদূষক

জনার "বিদূষক"চরিত্র অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়। একজন মিষ্টান্নলোভী সরল ব্রাহ্মণ তাঁহার সরল ভক্তি-বিশ্বাসের বলেই কত উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারেন গিরিশচন্দ্র তাহা স্তরে স্তরে দেখাইয়াছেন। নাট্যশিল্প হিসাবে ইহার স্থান তত উচ্চ নহে, কারণ নাটকের মূল প্রাণ-ক্রিয়ার গতি অতি মন্থর ও অতি স্বল্প। কিন্তু ভাব ও ভক্তির প্রবাহে ইহা অপূর্ব!

"কালাপাহাড়" নাটক রোমান্টিক হইলেও ইহা নাট্য-সাহিত্যে অভিনব সুন্দর। কি "কালাপাহাড়", কি "চিন্তামণি",

কি "প্লেটো", কি "বীরেশ্বর", কি "চঞ্চলা", কি "দোলেনা", কি "ইমান"—নাটকীয় সব চরিত্রই সজীব, ভাব-ব্যঞ্জনায় শব্দ-ঝঙ্কারে নাটকীয় কথোপকথনে নাটকের গতিক্রিয়ায় ইহা প্রাণবন্ত। "নসীরামে" যাহা বীজাকারে ছিল, তাহারই পূর্ণতম বিকাশ "চিন্তামণি"চরিত্রে। প্রেমের কবি গিরিশচন্দ্র প্রেমের প্রভাবে ইচ্ছাশক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন চঞ্চলার চরিত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যে সার্বজনীন সার্বভৌমিক বাণী—তাহা অত্যন্ত নিপুণতার সহিত দিয়াছেন চিন্তামণির কথায়—বলিতে কি স্থানে স্থানে চিন্তামণি-চরিত্রে কতকটা পরমহংসদেবের ছায়া পড়িয়াছে। ঐতিহাসিক উপাদানে এই রোমান্টিক নাটকখানি লিখিত। ইহা বিয়োগান্ত নাটক হইলেও বিয়োগান্তের ভীষণ ভয়াবহ দৃশ্য অপেক্ষা ইহাতে ভাবের গাম্ভীর্য, গভীরতা, উচ্চতা এবং বিশালতা আছে—যাহা উচ্চ ধরনের বিয়োগান্ত নাটকের বৈশিষ্ট্য। রস হিসাবে ইহা এক অপূর্ব জিনিস। শান্ত ও করুণ রস দুইটি যেন পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে—বিয়োগান্ত নাটকে এইরূপ মিশ্রণ নাট্যসাহিত্যে দুর্লভ।

কালাপাহাড়ে চিন্তামণির মুখে—শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বভৌমিক বাণী

"মায়াবসান" নাটকে "কালীকিঙ্কর" ও "রঙ্গিণী" গিরিশচন্দ্রের ভাব-জগতের সৃষ্টি। গৃহত্যক্তা বৈষ্ণবীর কুমারী কন্যা কালীকিঙ্করের আশ্রয়ে পালিতা—কালীকিঙ্করের নিকট সুশিক্ষিতা এবং চিরকুমার বৃদ্ধ কালীকিঙ্করের মনোমত আদর্শে গঠিতা। অথচ এই বৃদ্ধের সঙ্গে রঙ্গিণীর একটা নিবিড় অচ্ছেদ্য প্রেমের

মায়াবসানে কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণীর প্রেম

বন্ধন আছে—যাহার সহিত ইন্দ্রিয়জ কোনও সম্বন্ধ নাই। রূপের মোহে বা সম্ভোগ-প্রবৃত্তির মূলে ইহার উৎপত্তি হয় নাই; স্নেহ-বাৎসল্যে শিক্ষার ব্যপদেশে ইহার সম্ভাবনা হইয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় প্রেম প্রতিপালক ও প্রতিপাল্যের অথবা গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধীয় শুধু স্নেহ বাৎসল্য ভক্তি নহে—নিষ্কাম মধুর ভাবেরই একটা স্তরবিকাশ। কালীকিঙ্করের বৈজ্ঞানিক গৃহে কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণীর কথোপকথনে উক্ত প্রেমের অঙ্কুর প্রকাশ পাইয়াছে।

ইচ্ছাশক্তিতে বিষের শক্তি ব্যর্থ

বিষাক্ত ঔষধ সেবনে কালীকিঙ্কর হতচৈতন্য হইলে রঙ্গিণী ব্যাকুলভাবে বলিতেছে, "ছোটবাবু, ছোটবাবু, তোমার পায় পড়ি, তুমি ম'রো না, আমি বড় কাঁদবো, আমি তোমায় না দেখ্‌তে পেলে বাঁচবো না।" কালীকিঙ্কর বাঁচিয়া গেল কিন্তু উন্মাদ হইয়া রহিল। এই উন্মত্তাবস্থায় রঙ্গিণীকে কালীকিঙ্কর বলিতেছে, "তুমি কি জান না, ধুতরার বীচি তাতে আর্শেনিক দেওয়া। এতে কি মানুষ বাঁচে! তবে তুমি আমার কাছে কি পড়েছ? কি শিখেছ? এতে কি মানুষ বাঁচে? অজ্ঞান হয়েছিলেম, দেখনি যম নিতে এসেছিল, তুমি মরতে মানা কর্‌লে, আমি একটু শুনতে পেলুম বল্‌লুম 'না—মর্‌বো না,' তোমার অনুরোধ রাখলুম।"

কালীকিঙ্করের আদর্শে রঙ্গিণী কিরূপ উচ্চভাবে শিক্ষিতা হইয়াছিল, হলধরের নিকট তাহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে বোঝা যায়। "ছোটবাবুর ঠেঙে শুনেছি, মিথ্যা বল্‌তে নেই। বিনা অপরাধে কেউ সাজা পাবে, এ আমি কখনও দেখ্‌বো না। ছোটবাবুর মানা—ছোটবাবু আমার ইষ্ট, আমি তাঁর কথা

কখনও ঠেল্‌বো না।" ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে রঙ্গিনী বলিতেছে, "আমি শিখেছি সত্য ভগবানের স্বরূপ, মিথ্যাবাদী ভগবানের বিরোধী। আমি শয়নে স্বপনে রাত্রিদিনে গুরুর উপদেশে তাঁরে সকল স্থানে বর্ত্তমান দেখি। সত্য বলা আমার বাল্যাবধি অভ্যাস।" কালী-কিঙ্করের কথা রঙ্গিণী ম্যাজিস্ট্রেটের মেমের কাছে বলিতেছে, "আমি ভালবাসা তাঁর নিকট শিক্ষা করেছি; আমার নীরস অন্তঃকরণ কে সরস ক'রেছে, কে ভালবাসার বীজ বপন ক'রেছে—তিনি। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নয়; তিনি ভিন্ন আমার কিছুই নয়; আমার মন নয়—তাঁর মন, তাঁর মন দিয়েই তাঁর মন সম্পূর্ণ বুঝেছি; আমার ভালবাসা—তাঁর ভালবাসার একটি ক্ষুদ্র বীজ মাত্র—সেই বীজ তাঁর যত্নে অঙ্কুরিত হ'য়ে হৃদয়ে অমৃত-ফল ফলেছে।"

প্রেমে সর্ব্বস্ব দান

যে মনে চৈতন্য-উদয় সে মনে জড়-বিষের শক্তি স্বল্পস্থায়ী

এইখানে কালীকিঙ্কর সম্বন্ধে রঙ্গিণী একটা বড় সত্য ঘোষণা করিয়াছে—"যে মনে চৈতন্য উদয় হয়েছে, সে মন জড়-বিষে কতক্ষণ আচ্ছন্ন রাখ্‌তে পারে?" ইহা হিন্দুর দার্শনিক সত্য এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে সাধকের প্রত্যক্ষ অনুভূতিসঞ্জাত সিদ্ধান্ত। পুরাণে ইহাকেই শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ বলিয়াছে। জড়শক্তি হইতে চৈতন্যশক্তি অধিকতর তেজসম্পন্ন ও বলশালী। প্রহ্লাদ এই চৈতন্য-শক্তির আশ্রয়ে ছিলেন বলিয়া হিরণ্যকশিপু জড়-শক্তির দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই—বিষও অমৃত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র কালীকিঙ্করের চরিত্রে দেখাইয়াছেন, যে মনে চৈতন্যশক্তির বিকাশ হইয়াছে সে মনে জড়শক্তির ক্রিয়া স্বল্পস্থায়ী।

উন্মাদ কালীকিঙ্করের মনে কখন কখন পূর্বস্মৃতি উদয় হইতেছে, তাই রঙ্গিণীকে বলিতেছে, "আমি কটা বল দেখি ?" "বল্‌তে পার্‌লে না ? আমি দুটো।" যে দৃশ্যে কালীকিঙ্করের উন্মাদাবস্থা কাটিয়া পূর্বস্মৃতি উদয় হইতেছে—তাহা অসাধারণ নিপুণতার সহিত গিরিশ অঙ্কিত করিয়াছেন। রঙ্গিণী কালী-কিঙ্করকে বলিতেছে, "তোমার যন্ত্রণার ভয়—তাই তুমি আরাম হচ্চ না, কিন্তু তোমার শিক্ষায়—আমার যন্ত্রণার ভয় নাই—যন্ত্রণাই আমার আনন্দ।"

উন্মত্ততা দূর হইবার পূর্বে দুইটা "আমি"

"কালী। ভাল হয়ে কি কর্‌বো ?

রঙ্গিণী। অনেক কাজ আছে, পৃথিবীর অনেক উপকার হবে।

কালী। তাতে আমার কি ?

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, এ কথার উত্তর তুমি আমায় শিখাওনি, পরোপকারে কি লাভ, তা তুমি আমায় শিক্ষা দাওনি। সত্য বল্‌তে, ধর্মপথে চল্‌তে, পরোপকার কর্‌তে তুমি বলেছ তাই করি। আর তুমি বলেছ যে লাভালাভ বিবেচনা করে সে ধর্মপথে চল্‌তে পারে না, সত্য বল্‌তে পারে না, পরোপকার কর্‌তে পারে না। আমি তাই শিখেছি—এর লাভালাভ আমি শিখিনি, লাভালাভ আমি জানিনে।

মনুষ্যজীবনে নিষ্কাম কর্ম

কালী। ভাল হব ?

রঙ্গিণী। হ্যাঁ।

কালী। তুমি সত্যি সত্যি বল—আমি ভাল হয়েছি।

রঙ্গিণী। আমি সত্য বল্‌ছি তুমি ভাল হয়েছ।

কালী। আমি ভাল হয়েছি, আর আমি পাগল নই।"

রঙ্গিণী আকস্মিক আনন্দে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

যখন কালীকিঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় যাদব ও মাধবকে ওয়ারেণ্টে পুলিস ধরিয়া লইয়া গেল, রুগ্‌ণা রঙ্গিণী তখন কালীকিঙ্করকে তাহা জানাইলে সে বলিল, "পাপের দণ্ড হয়েছে, তুমি কি করবে?

রঙ্গিণী। পাপের দণ্ড! মার্জনা নাই। তবে তো মানব-দেহ ধারণ মহা বিপদ্। যদি মার্জনা না থাকে, কোথায় যাব? কোথায় দাঁড়াব? আমি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখ্‌ছি এ জীবন কেবল কার্যপ্রবাহ—সকল কার্য্যই কলুষিত; এর যদি দণ্ড হয়, মার্জনা না থাকে তা হ'লে তো অনন্তকালেও নিস্তার নাই!"

রঙ্গিণীকে ব্যাকুল দেখিয়া কালীকিঙ্কর বলিল, "কে বল্‌লে মার্জনা নেই? ভগবান্ অপরাধভঞ্জন—তিনি মার্জনা করেন।"

তদুত্তরে রঙ্গিণী বলিতেছে, "তবে কি মার্জনা কেবল মানুষের নিষেধ? তা হ'লে মানুষ অপেক্ষা হিংস্রক জন্তু হওয়া ভাল; আমি কুকুরকেও মার্জনা ক'র্‌তে দেখেছি। যদি মানুষের মার্জনা নিষেধ হয় তা হ'লে এমন হীন জন্ম আর নাই।"

রঙ্গিণী কালীকিঙ্করকে তাহার অনুভূতির কথা বলিতেছে—"আজ দেখ্‌ছি সকল কার্যই কলুষিত—ঘোর অন্ধকার! কেবল দূরে একটি ক্ষীণ আলো—দয়া! সকলিই অন্ধকার! কেবল দয়ার উজ্জ্বল শিখা দেখ্‌তে পাচ্ছি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি—এই যে আমার সম্মুখে রাজপথ। সুন্দর স্বরে গান হ'চ্ছে 'মার্জনা'—'মার্জনা'! দেবদূতে গান ক'রছে মার্জনা—মার্জনা! সকলকে মার্জনা—শত্রুকেও মার্জ্জনা।

দয়া ও মার্জনা মনুষ্যত্বের মন্দির

দূরে মনুষ্যত্বের সুন্দর মন্দির, আমি চল্‌লেম।" কালীকিঙ্কর বুঝিল, "মার্জনাই—মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব।" ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রঙ্গিণীর কথায় কালীকিঙ্কর বলিল, "আমার শিক্ষাদাত্রী দেবী—আমার ধ্যানের মূর্তি।" চিরকুমার বৃদ্ধ কালীকিঙ্কর ও কন্যাপ্রতিম শিষ্যা চিরকুমারী রঙ্গিণীর উচ্চ আদর্শমূলক প্রেম গিরিশের অপূর্ব কল্পনা—জগতের সাহিত্যক্ষেত্রেও ইহা দুর্লভ।

সাতকড়ির রহস্যময় চরিত্র

বৈজ্ঞানিক কালীকিঙ্করের লিখিত নোটগুলি যখন রাত্রে সাতকড়ি চুরি করিতে যায় সজাগ কালীকিঙ্কর তাহাকে ধরিয়া ফেলে। কালীকিঙ্কর তাহাকে টাকা দিতে চাহিলে সে টাকা লইল না—তখন জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও?" চাটুয্যে বলিল, "ঐ কাগজগুলি।" কালীকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "তাতে তোমার লাভ?" চাটুয্যে বলিল, "আজ্ঞে আপনার টাকার দরদ নাই—স্ত্রীলোকের দরদ নাই, মান-সম্ভ্রমের খাতির করেন না", "দরদের ভিতর দেখ্‌ছি, আপনার বিদ্যার আর ঐ কাগজগুলির। কাগজগুলিতে বোধ হয় আপনি যা প'ড়েছেন দেখেছেন তাই টুকে রেখেছেন। ঐগুলি আপনার খুব দরদের। তাই ভেবেছিলাম—ঐগুলি নিয়ে পুড়িয়ে ফেল্‌বো।" বিস্মিত হইয়া কালীকিঙ্কর পুনরায় বলিল, "তোমার লাভ তো বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।"

পরের দুঃখে মানুষের আনন্দ

সাতকড়ি। আজ্ঞে, ছেলেবেলায় মাস্টার গল্প করেছিলেন—'কে একজন ফরাসী পণ্ডিত রুকো ফুকো তাঁর নাম, তাঁর মতে পরের দুঃখেই মানুষের আনন্দ।' আমি কথাটি শুনে আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পার্‌লেম। জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের হাত এড়াবার যো নাই। তারপর দেখ্‌লেম, আর একজন দুঃখ

পাচ্ছে—প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হলো—তাই দুঃখে সুখে এই আনন্দে বেড়াই।"

ইহাও কর্মের একটা দিক্—মনুষ্যজীবনকে বিচিত্র করিয়া রাখিয়াছে। কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণীর লোকহিতকর নিষ্কাম কর্মের পার্শ্বে সাতকড়ির অনিষ্টকর নিঃস্বার্থ কর্ম একটি অভিনব তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। সাতকড়ির স্বার্থশূন্য অনিষ্টকর কর্ম আনন্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে—কিন্তু যথার্থ নিষ্কাম কর্ম আনন্দের অপেক্ষা রাখে না। তাই গিরিশ রঙ্গিণীর মুখে বলাইয়াছেন, "যে লাভালাভ বিবেচনা করে সে ধর্মপথে চল্‌তে পারে না, সত্য বল্‌তে পারে না, পরোপকার কর্‌তে পারে না।" বর্তমান জগতে জড়বিজ্ঞানে সাতকড়ির আদর্শ অনিষ্টকর কর্মে প্রযুক্ত হইতেছে—তাই কালীকিঙ্করের মুখে গিরিশ বলাইয়াছেন যে বিজ্ঞানে মানব-দুঃখের নিষ্কৃতি হইবে না।

লোকের অনিষ্ট করাতেই যার আনন্দ—সেই সাতকড়ি চাটুয্যেকে কালীকিঙ্কর বলিতেছে, "তুমি সত্যই ভেবেছিলে, ঐ কাগজগুলি আমার অতি যত্নের সামগ্রী ছিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণ ক'রে দূরবীক্ষণে আকাশে তারার গতি লক্ষ্য ক'রেছি। অণুবীক্ষণে কীটাণুর ব্যাভার দেখেছি, বিজ্ঞান-চর্চায় জীবন উপেক্ষা ক'রে তাড়িত পরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নিজ দেহে দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করেছি। যা যা দেখেছি, যা যা ভেবেছি—সব ওতে টুকে রেখেছি—কেন জান? ভেবেছিলেম, এ প্রকাশ কর্‌লে মানুষের উপকার হবে; কিন্তু আজ বুঝেছি যে মানব-দুঃখের এক কণাও কম্‌বে না।"

বিজ্ঞানের জ্ঞানে মানবদুঃখের এককণাও কমে না

সাতকড়ি উহা শুনিয়া চলিয়া গেল—জানাইয়া গেল যে যখন উহাতে কালীকিঙ্করের কোন মমতা নাই তখন তাহারও কোন দরকার নাই। কালীকিঙ্কর মনের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল, "সুখদুঃখ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, বায়ু-সজ্ঘর্ষণে ঘোরতর ঘূর্ণবায়ু উপস্থিত হয়—দীপ-নির্বাণ সম্ভব। কিন্তু মৃত্যুতে কি জ্ঞানদীপ নির্বাণ হয়? জড়েরই ধ্বংস হয়, চৈতন্যের বিনাশ কোথায়?" অমনি তাহার মনে আভাস আসিল—আত্মত্যাগ! এই নূতন ভাব রঙ্গিণীকে শুনাইতে কালীকিঙ্কর ছুটিল।

ধ্বংসশীল জড় ও অবিনাশী চৈতন্য

কালীকিঙ্কর রঙ্গিণীকে বুঝাইতেছে, "এই আমার শেষ কথা। তুমি কথাটি বুঝ্‌লে আমার বন্ধন কাটে। শুনেছিলে কি? —আত্মত্যাগ! মনে ক'রেছিলাম একটা কথার কথা চলে আস্‌ছে—তা নয়; সত্যই আত্মত্যাগ আছে, মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আত্মা সঙ্গে যাবে; এইখানে আপনাকে বিলিয়ে দিলে তবে আত্মত্যাগ হবে।" আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইতে রঙ্গিণীকে কালীকিঙ্কর বলিল, "মুখে বল্‌তেম নিষ্কাম কর্ম, নিষ্কাম কর্ম। কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। সুখ-আশায় পরহিত ক'রেছি, আত্মোন্নতির জন্য পরহিত ক'রেছি—ফলকামনায় পরহিত ক'রেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পর-কার্যে রইলেম, রইলেম কি জগতে মিশ্‌লেম!" ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের শাশ্বত সত্য—বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণীর চরিত্রে ইহা যথার্থ বিকশিত করিতে পারেন নাই। গিরিশ অসামান্য কৌশলে কালীকিঙ্করের অনুভূতিতে ইহা সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন।

মৃত্যুতে আত্মত্যাগ নাই—নিষ্কাম কর্মে আত্মত্যাগ

ত্যাগের মিলনে আর বিচ্ছেদ নাই—তাই রঙ্গিণী বলিল, "সত্য—অবিচ্ছেদ্য মিলন—প্রতি পরমাণুতে মিলন—অনন্ত মিলন।"

গিরিশচন্দ্র এই দশকে নাটকীয় বাহ্যক্রিয়া অপেক্ষা অন্তর্মুখী ক্রিয়া ও অন্তর্মুখী দ্বন্দ্ব নাটকে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ ধী-গুণ, মনঃশক্তি ও নাট্যপ্রতিভা বিশেষ-ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। বাস্তব ও আদর্শ-বাদের সংমিশ্রণের অন্তর্দ্বন্দ্বকেই তাঁহার নাটকের গতিক্রিয়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মুকুলমুঞ্জরার মূক মুকুলে তাহার বীজ, কালাপাহাড় ও মায়াবসানে তাহার অঙ্কুর, এবং উত্তরকালে শঙ্করাচার্য, অশোক ও তপোবলে তাহার ধীরে ধীরে বিকাশ। মনস্বী পিরান্‌দোলা বলিয়াছেন, "যে ক্রিয়ার গতি লোকচক্ষুর অন্তরালে হইয়া থাকে তাহা অধিকতর শক্তিশালী।" ডেনমার্কের সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক জর্জ ব্র্যাণ্ডিস্, ইবসেনের নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ভাব (idea) এবং উহার মনস্তত্ত্বের ফলাফল বিষয়ে ইবসেনের প্রেম রহিয়াছে—ইবসেনের এই নির্বিষয়ক ভাবাদর্শের সহিত বার্‌গসোঁর মানব-প্রেমের কতকটা সাদৃশ্য আছে।" [Ibsen is in love with the idea and its psychological consequences ....corresponding to this love of the abstract idea in Ibsen, we have in Bergson the love of human kind."]

বাহ্যঘটনার ক্রিয়া অপেক্ষা অন্তর্মুখী ক্রিয়া নাটকে দেখাইবার চেষ্টা

গিরিশচন্দ্র তাঁহার দ্বিতীয় দশকে নূতন ধরনের নাটক কল্পনা করিয়াছিলেন। মেটার্‌লিঙ্ক বা রবীন্দ্রনাথ তখন কেহই

প্রতীক-নাট্য (symbolical drama) রচনা করেন নাই। "মায়াতরু"তে গিরিশচন্দ্রের যে শিল্পকল্পনা দেখা দিয়াছিল, তাহার বিকাশ হইয়াছে "স্বপ্নের ফুল" গীতিনাট্যে। পরমহংসদেবের বাণী ইহার বুনিয়াদ, "যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে—তারপর দুটো কাঁটাই যেমন ফেলে দেয়, তেমনি বিদ্যামায়া দ্বারা অবিদ্যামায়াকে তুল্‌তে হয়, তারপর বিদ্যা অবিদ্যা দুটোই ফেলে দিতে হয়।" এই নাটকের ঘটনা—সন্ধ্যা হইতে উষা পর্যন্ত—তাই নাটকের শেষে মনহারা বলিতেছে, "চল, ভোর হ'লো—অরুণোদয় হয়েছে, আর তো স্বপ্ন নাই।" মেটার্‌লিঙ্কের Blue Bird-এর শেষ কথাও তাই।

জগতের নাট্যসাহিত্যে গিরিশের 'স্বপ্নের ফুল' সর্বপ্রথম প্রতীক নাট্য

স্বপ্নের ফুলে গিরিশচন্দ্র প্রস্তাবনায় বলিয়াছেন—

সাধে কি নির্ব্বাণ মন করিরে প্রয়াস,
ভেবে দেখ যতদিন স্মৃতির বিকাশ—
জীবনে মরণ-ত্রাস,
চির আশ উপহাস,
সতত আশ্বাস ভাষ—সুখের প্রয়াস।
পিয়াসা না মিটে নিত্য নব অভিলাষ!
অধীর উন্মাদ তুমি ভ্রম নিরন্তর,
দুঃখকর সুখ-সাধে সদা জর-জর
রোদন জনম যবে
রোদন সাগর ভবে
হেলায় খেলায় নীর দুরন্ত লহর,
পলে পলে অগ্রসর কাল প্রাণহর!

কৌমার-যৌবন-জরা গাঁথা এ জীবন।
ধূলাখেলা, প্রেমতৃষা, কাঞ্চন-অর্জ্জন!
অসার প্রয়াস তার
সার মাত্র দুঃখভার
হও রে নির্ব্বাণ, যাব শান্তি-নিকেতন।

"দেলদার"ও এই জাতীয় গীতিনাট্য। গ্রীক Trilogyর অনুকরণে "নন্দদুলালের" সৃষ্টি। এই দশকে গিরিশচন্দ্রের মনে বিভিন্ন ধরনের নাটক-রচনার পদ্ধতি উদিত হয়—তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তাঁহার "সপ্তমীতে বিসর্জ্জন" বাস্তব জগতের জঘন্যতম অংশের সম্পূর্ণ বাস্তব ছবি—ইহাতে সমাজ-পরিত্যক্ত পতিত-পতিতার উৎকট বীভৎস মূর্তি প্রকটিত হইয়াছে—সাহিত্যে ইহার স্থান নাই। তবে সামাজিক সংস্কার-মূলক নাটকের ইহা একটি সমস্যা। "বড়দিনের বক্‌সিস", "সভ্যতার পাণ্ডা", "আয়না", "পাঁচকনে" ভিন্ন ধরনের প্রহসন—**Impressionism** এবং **Naturalism** ধরনে অনেকটা রচিত।

গিরিশের বহুমুখী নাটক-সৃষ্টি

প্রহসন-পঞ্চরংএর মধ্যে ইহাদিগকে পরিগণিত করিবার চেষ্টা করিলেও ইহাদের মধ্যে সে রকম হাস্যরসের লহর নাই। গিরিশচন্দ্রের মন স্বভাবতঃ উচ্চ-কল্পনা-প্রবণ; বিশেষতঃ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মনের স্বাভাবিক গতি হইয়াছিল অনন্তের সন্ধানে ও উদ্দেশে। মনের নিম্নস্তরে সরস হাস্যরসে তিনি অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতেন না—তাই নাটকে যে শুভ্র অনাবিল হাস্যরসের স্রোত পাওয়া যায় এই সব প্রহসন-

গিরিশের মন স্বভাবতঃ উচ্চ কল্পনা-প্রবণ

পঞ্চরংএ এক "বেল্লিক-বাজার" ছাড়া তাঁহার সে প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় না। তবে বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্যদেশে Impressionism ও Naturalismএর সহিত এইগুলির কতকটা সাদৃশ্য আছে। প্রহসন-পঞ্চরংএর বদলে ইহাদিগকে এই জাতীয় নাটক বলিলে বোধ হয় ভাল হয়। গিরিশচন্দ্র যখন এই ধরনের নাটক রচনা করেন তখন পাশ্চাত্ত্যদেশে Expressionism বা প্রকাশবাদমূলক নাটক কিংবা Naturalism বা প্রকৃতিবাদমূলক নাটক-সমূহের কল্পনা হয় নাই। গত জার্মান সমরের সময় ও তাহার পরে আশা-নিরাশার হিল্লোলে জার্মান নাট্যসাহিত্য বিশেষভাবে আন্দোলিত হইয়াছিল। বাস্তববাদ হইতে প্রকৃতিবাদমূলক নাটক পূর্বেই রচিত হইয়াছিল, যুদ্ধান্তে প্রকাশবাদ নাটক-সমূহের চলন খুব বেশী ছিল। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে ইহাদের ভাবগত পার্থক্য থাকিলেও আকারগত কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। অনাগত উন্নতির আগমন-আকাঙ্ক্ষার বাণীতে উচ্ছ্বসিত ও সামাজিক শ্রেণীগত অন্যায়ের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা-বিদ্বেষে তিক্ততা পাশ্চাত্ত্যদেশে এই জাতীয় নাটকের মূল ভিত্তি বা প্রেরণা। বর্তমান পাশ্চাত্ত্য আদর্শে সমাজ-গঠন চেষ্টা, কপট সংস্কারক ও সামাজিক বিপ্লবের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা এবং সনাতন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাই—গিরিশচন্দ্রের প্রেরণার মূল উৎস। উহাদের আকারগত সাদৃশ্য এই যে, ঠিক কোন বিশিষ্ট গল্পের ধারা নাই, চরিত্রগুলি কোন জাতীয় চিহ্নে

পঞ্চরংগুলি পঞ্চরং নহে, উহা কতকটা **Impressionism, Naturalism ও Expressionism** জাতীয় নাটকের ধরনে রচনা

উক্ত পাশ্চাত্ত্য জাতীয় নাটকের তুলনায় গিরিশ-নাটকের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

চিহ্নিত নয়—তাহারা এক একটা গোষ্ঠীর প্রতীক। তাহারা রূপকমাত্র। কাইজার ভেরফেল উনরু প্রভৃতি এই নব নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক।

গিরিশচন্দ্রের "সভ্যতার পাণ্ডা"র সভ্যতা, পুরাতন বর্ষ ও নববর্ষের প্রবেশ এবং কথোপকথন কিংবা বিবিধ বয়সের বরকন্যা, নব সভ্যতার প্রতিনিধিদের নিলাম, বৃষ, গাভী, গর্দভ ও বানর, বানরী প্রভৃতি এক এক শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। খ্রীষ্টমাস, ওল্ডইয়ার, নিউইয়ার, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, ও বসন্ত, নায়ক-নায়িকা বা রঙ্গদার রঙ্গদারগণের গীত এক একটি গোষ্ঠীর বাণী। ইহাকে পঞ্চরং বা প্রহসন নাম না দিয়া—প্রকাশবাদমূলক নাটক বলিলে উপযুক্ত হইত। গিরিশচন্দ্রের এই ধরনের নাটকগুলি মৌলিক কল্পনাসম্ভূত—সুতরাং বাংলায় এই ধরনের নাট্যসাহিত্যের তিনি স্রষ্টা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাংলার নাট্যসাহিত্যে এই জাতীয় নাটক তাঁহার বিশিষ্ট দান।

"ভ্রান্তি" নাটকে গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টি-কৌশল অসামান্য—বিশেষ ভাবে রঙ্গলাল ও গঙ্গা। এই নাটকে গিরিশ মানুষকে শ্রেষ্ঠ উপাস্য ও মানুষের সেবাই পরম সাধনা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহা কোম্‌তের Humanity নহে, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—"শেষে নর-লীলাতেই মন গুটিয়ে আসে"—ইহাই বিবেকানন্দের "সেবা-ধর্ম", "নারায়ণ-জ্ঞানে নর-সেবা বা শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা।" যে গিরিশচন্দ্রের মনে বাল্যে ও কৈশোরে পৌরাণিক ধর্মের বীজ উপ্ত হইয়াছিল—মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, ডারউইন প্রভৃতির রচিত দার্শনিক গ্রন্থ-সমূহ এবং পাশ্চাত্ত্য

'ভ্রান্তি' নাটকে মানবতা বা নব মানব-ধর্ম প্রচার

বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া সেই মনে নাস্তিকতার আগাছা জন্মিয়াছিল—আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে সেই মন নাস্তিকতাকে উৎপাটিত করিয়া "বিল্বমঙ্গল" "বুদ্ধদেব" ও "পাণ্ডবগৌরব" নাটকাদিতে আদর্শ-মানবতার কল্পনা করিয়াছিল। গিরিশ-চন্দ্রের যে মন "নসীরাম" "কালাপাহাড়" এবং "মায়াবসানে" সংসারকে মায়া বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া, অনন্তে মিশিয়া অনন্ত অবিচ্ছেদ্য মিলনের ধ্যান পরিকল্পনা করিয়াছিল, "ভ্রান্তি" নাটকে গিরিশচন্দ্রের সেই মন মানব-সেবার বিরাট্ মানবধর্মের আদর্শে বিভোর! "ভ্রান্তি"তে রঙ্গলাল বলিতেছে, "অমন পাথুরে মাকে মানি-না-মানি, তাতে বড় এসে যায় না; দেখ না, এক পোড়ার মুখ নীচে পড়ে আছেন, না হয় জিব বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বলি—থাক মা, বিল্বপত্রের গাদায়, টিকিদাস ভট্টাচায্যির মুখে চিড়িং চাড়াং চিড়িং চাড়াং শোনো।"

যখন গঙ্গা প্রশ্ন করিল, "কে তোমার দেবতা, শুনি।" রঙ্গলাল বলিল, "মানুষ আমার দেবতা। যারে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান বলে ভগবানের অংশ। শাস্ত্র নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আছে, এ কথার তর্ক-বিতর্ক নাই। আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ; যার সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, যার সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না—ভাল ক'রেছি কি মন্দ ক'রেছি। যে দেবতার পূজায় কোনও শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই।"

মানুষ-দেবতা

অন্যত্র সে বলিতেছে, "আমি যেন দু' একটা ভুকো মানুষকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাঁপছে তাকে একখানা কম্বল দিতে পারি, তা হলেই আমি চরিতার্থ হব।"

এই মানব-সেবা ও মানব-প্রেমের কাছে রঙ্গলালের আর সব তুচ্ছ। তাই সে বলিতেছে, "খুব ক্ষিদে পেয়েছে, চারটি খেতে দিও, খুব তেষ্ঠা পেয়েছে একটু জল দিও— খেয়ে ব্যাটারা 'আঃ' করবে, শুনে যে তোমার সুখ হবে কোন ব্যাটার চোদ্দপুরুষের কল্পনায় স্বর্গ-সৃষ্টি ক'রে—এত সুখ সৃষ্টি ক'র্‌তে পারে নাই। জোর স্বর্গসুখ ক'রেছে কি জান? অপ্সরীর সঙ্গে প্রেমালাপ হ'লো, পারিজাতের মালা গলায় দিলে, খাঁটি না খেয়ে—একটু সুধা খেলে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ফুরুলো! পারিজাতের মালা বাসি হ'লো আর অমৃতের নেশায় খোঁয়ারী এ'লো। এ আমোদ, না ছাই?"

গিরিশের মানবধর্ম কোমতের Humanity বা ইংরাজি Philanthropy নহে

গিরিশচন্দ্রের এই নরসেবার আদর্শ লোকহিতায়—দয়াসম্ভূত নহে—ইংরাজী ফিলান্থ্রফী নহে—ইহা বিরাট্ প্রেমে বিরাটের সেবা। রঙ্গলাল বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি-খাঁকে বলিতেছে, "আমি যদি আমার জন্য বাঁচতেম, তা হ'লে তোমারই মত—আমার প্রাণে—দরদ হোতো—মর্‌তে চাইতেম না। কিন্তু আমার মনে হয় কি জান? যে মরবার সময় পর্যন্ত যদি হাত উঠে তা হ'লে একটা পরের কাজ করে যাব।" আবার বলিতেছে, "মানুষকে ভালবাস, মানুষ বড় দুঃখী।"

ভ্রান্তি পুরাদস্তুর নাটক

রঙ্গলালের উদ্ধৃত বাক্য শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে ভ্রান্তি শুধু এইরূপ বক্তৃতামূলক নাটক। ইহা অতি উচ্চাঙ্গের নাটক—নাটকের ঘাত প্রতিঘাত, নাটকীয় সংস্থান ও নাটকীয় ক্রিয়া স্বচ্ছন্দে চলিতেছে—প্রত্যেক চরিত্রই জীবন্ত—নাটকীয় শিল্প-সুষমায় সৌষ্ঠবসম্পন্ন।

গিরিশচন্দ্রের নাটক-সমালোচনা এই বক্তৃতার বিষয় নয়—নাটকীয় চরিত্রে এবং নাট্যকলায় তাঁহার মনের বিকাশ দেখানোই আমার লক্ষ্য—আমার বিষয়বস্তু।

গিরিশের ঐতিহাসিক নাটক

ইহার পর গিরিশচন্দ্র নাট্যকার জীবনের তৃতীয় দশকে (১৯০৩-১২) পর্যন্ত ১২খানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সৎনাম, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী ও অশোক এই পাঁচখানি ঐতিহাসিক, দুইখানি সামাজিক, একখানি দেব-নাটক, একখানি কিংবদন্তীমূলক একটি প্রহসন এবং একখানি পৌরাণিক। ইহা ছাড়া অসমাপ্ত তিনখানি নাটক রাণা প্রতাপ, মিলনকানন এবং গৃহলক্ষ্মী। শেষোক্ত নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ বসু সম্পূর্ণ করিলে তাহা রঙ্গমঞ্চে সগৌরবে অভিনীত হইয়াছিল।

অশোক ব্যতীত অপর চারিখানি ঐতিহাসিক নাটক জাতীয়—ভাবদ্যোতক। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় গিরিশ এইগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তিনখানি ঐতিহাসিক নাটকই সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিম অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের আবিষ্কৃত নূতন ঐতিহাসিক তথ্য অবলম্বন করিয়া লিখিত। তবে গিরিশচন্দ্র এই সংক্রান্ত সমুদয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও নিবন্ধ পাঠ করিয়া বিচার-পূর্বক মতামতগুলি গ্রহণ ও বর্জন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই সকল নাটকে গিরিশচন্দ্রের নূতন নূতন অপূর্ব চরিত্রের সৃষ্টি আছে—মূল নায়কদের চরিত্রও তাঁহার কল্পনারশ্মিতে সমুজ্জ্বল। গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলা নাটকে ঐতিহাসিক তথ্যে

অতি সতর্ক। বঙ্কিমচন্দ্র "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে তকি খাঁকে কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতকরূপে বাঙালীর নিকট পরিচিত করাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত ভ্রম সংশোধন করিয়া বীর তকি খাঁকে আঁকিয়াছিলেন। তকি খাঁর অসামান্য বীরত্ব কাটোয়ার যুদ্ধে প্রকাশ পাইয়াছিল—ইতিহাস তাহার সাক্ষী। "করিম চাচা"—এক অভিনব বিস্ময়কর চরিত্র। সমুদয় ঐতিহাসিক ঘটনা ও নাটকীয় চরিত্রগুলির গতি করিম চাচায় যেন প্রতি-বিম্বিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। করিম চাচার আক্ষেপ যেন আমাদের কর্ণে আজিও প্রতিধ্বনিত হইতেছে—"বঙ্গভূমিরূপ সাধের উদ্যানে স্বার্থকুসুম ফুটেই রয়েছে—ছোট বড় সব স্ব স্ব প্রধান—সুসৌরভে এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। এ বাংলায় যিনি শান্তি স্থাপন করবেন তিনি বিধাতা পুরুষ। বাংলা ফিরে গড়্‌তে হবে, পুরাণো বাংলায় চল্‌বে না।" "মিরকাশিম" নাটকে "বেগম" ও "তারা" তেজস্বিনী নারীচরিত্র। "ছত্রপতি শিবাজী"তে "পুতলাবাই" গিরিশচন্দ্রের ধ্যানগঠিত সতী-নারী-মূর্ত্তি—ইহা খাঁটি আদর্শ-জগতের সৃষ্টি। এই সব ঐতিহাসিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের প্রবল স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। স্বদেশী যুগে বাংলার জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ করিতে গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি প্রবল আন্দোলন ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু "বৈষ্ণবী" নাটক—গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব কল্পনা। "গুলসানা" চরিত্রে সেক্সপীয়রের Antonio

বঙ্কিমের অঙ্কিত তকি খাঁ ঐতিহাসিক সত্য নহে। গিরিশের তকি খাঁ ঐতিহাসিক ভাবে অধিকতর উজ্জ্বল

করিম চাচার আক্ষেপে বাংলার রাজনৈতিক চরিত্র

বৈষ্ণব নাটক

Cleopatraর কিছু ছায়া পড়িয়াছে, তবুও ইহা মৌলিক সৌন্দর্যে অপূর্ব।

এই দশকে গিরিশচন্দ্র দুই খানি সামাজিক নাটক লিখিয়াছিলেন—দুই খানিই সমাজের সমস্যামূলক। একটি বরপণ অপরটি বিধবা-বিবাহবিষয়ক। সমাজ-সমস্যামূলক নাটক কাব্যাংশে প্রায়ই নিকৃষ্ট হয়, কেননা কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য-সৃষ্টি। কিন্তু গিরিশচন্দ্র "বলিদান" ও "শাস্তি কি শান্তি"তে সৌন্দর্যমূলক চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন—মাধুর্যময় ও রস-লোকের অপূর্ব চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। "বলিদানে" তাঁহার জোবি ও "শাস্তি কি শান্তি"তে হরমণি ও পাগলবেশী সদাশিব চায়েন—নাট্যসাহিত্যে তাঁহার চিরস্থায়ী দান। সমস্যামূলক নাটক হইলেই যে তাহা কাব্যাংশে নিকৃষ্ট হইবে তাহা সর্বত্র সত্য নহে। বাংলা ভাষায় দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" ইঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবির তুলিকায় নাট্যকারের কল্পনা ও রসসৃষ্টির উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা নির্ভর করে। আজকাল পাশ্চাত্ত্য জগতেও সমস্যামূলক নাটকই চলিতেছে। নারীর অধিকার লইয়া ইবসেনের Doll's House, কুমারীর সতীত্ব লইয়া বার্গসঁর Gauntlet, সামাজিক শ্রেণীবিভাগ লইয়া রবার্টসনের Caste, সামাজিক ব্যাপারে পল্লীর সমস্যা লইয়া বার্নর্ড শ-র Widowers' Houses, রাজনীতির মূলীভূত বিষয় লইয়া তাঁহার Apple Cart, এমন কি সেক্সপীয়রের Measure for Measure প্রকৃতিবিরুদ্ধ মানব-গঠিত বিধির সমস্যা লইয়া রচিত হইয়াছে। সুতরাং সমস্যামূলক নাটক যে কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইতে পারে না এ কথার বিশেষ মূল্য

বলিদান ও শাস্তি কি শান্তি

সমস্যামূলক নাটকেও সাহিত্যের চিরন্তন রূপ

নাই। বিশেষ বেকনের যুক্তিবাদের পর হেগেলের ন্যায়শাস্ত্রের ভিত্তির উপর **Karl Marx**এর **Thesis, Antithesis** এবং **Synthesis** সমগ্র সমস্যাকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় যুগে যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সাহিত্যক্ষেত্রে নব নব আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্র নিপুণ ভাবে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে সকলের সমক্ষে সেই সমস্যা উপস্থিত করিয়াছেন। "বলিদানে"র কিরণময়ী, হিরণ্ময়ী এবং জ্যোতির্ময়ী সামাজিক সমস্যার তিনটি রূপ এবং "শাস্তি কি শান্তি"তে ভুবনমোহিনী, প্রমদা ও নির্মলা সমস্যারই তিনটি বিশিষ্ট আকার। এই সব নাটক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিলে গিরিশচন্দ্রের একটা সার্বভৌমিক দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সার্বভৌমিক দৃষ্টি ও সহানুভূতিতেই তাঁহার করুণাময় ও প্রসন্নকুমার সহৃদয়-সংবেদ্য—করুণ রসের অশ্রুধারার শুভ্র প্রবাহে সিক্ত এবং সংকীর্ণতার গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশালতা ও গাম্ভীর্যের অপূর্ব শ্রীতে চির উজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহার

গিরিশের সামাজিক সমস্যামূলক নাটকে সার্বভৌমিক দৃষ্টি

দুলাল মনস্তত্ত্ব ও কল্পনার সংমিশ্রণে উদ্ভূত। রূপচাঁদের মত পাপাচারী এবং কুটিল পিতা হইলে সন্তানের দেহ ও মনের উপর তাহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে—উত্তরাধিকারসূত্রে মনোবৃত্তিসমূহ কেমন দোষযুক্ত হয়—মস্তিষ্ক ও হৃদয় কত দুর্বল ও অপরিপক্ক হইয়া থাকে—তাহা দুলাল-চরিত্রে সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার সারল্য—অপরিপক্ক হৃদয়ের ছায়া—

দুলালচাঁদ মনস্তত্ত্বের অদ্ভুত বিশ্লেষণ

দুলালের ভাষা দুর্বল-মস্তিষ্ক ও অপরিপক্ক হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাষা

কেন না কূটচক্রের উদ্ভাবনে তাহার নিজের কোনও ক্ষমতা ছিল না। সকল বিষয়ে এই খর্বতা বুঝাইবার জন্য গিরিশচন্দ্র দুলালকে কুব্জ, অমার্জিত ও অসংস্কৃতভাষী করিয়াছেন। তাহার পঙ্গু মনে সুরুচিসঙ্গত মার্জিত ভাষায় কথা কহিবার শক্তি নাই। যে সম্মোহিনী তূলিকায় প্রেমের স্পর্শে গিরিশচন্দ্র মূক মুকুলের কণ্ঠে ভাষা ফুটাইয়াছেন—সেই যাদুময়ী তূলিকার

প্রেমের পরশে দুলালচাঁদের আত্মত্যাগ ও উদারতা

উজ্জ্বল-রেখায় জোবির উপদেশে এই অপরিপক্ক কুব্জদেহে ও পঙ্গুমনে প্রেমের আলোকে সুমহান্ আত্মত্যাগ এবং অপুষ্ট হৃদয়ে আকাশবৎ উদারতা ও প্রসারতা দেখা দিয়াছিল। বাস্তবিকই রসসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের ইহা অভিনব সৃষ্টি।

গিরিশ বাংলাদেশে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ, প্রয়োগকুশল অভিনয়ের পরিকল্পনা, সুশিক্ষিত শিল্পনিপুণ অভিনেতা ও অভিনেত্রী-

গৈরিশী ছন্দ

সম্প্রদায়-গঠনপ্রণালী, নাট্যশিল্পের উচ্চ আদর্শ, অপূর্ব নাটকীয় সঙ্গীত, নাটকীয় ভাষা, নাটকীয় ছন্দ এবং উচ্চ শ্রেণীর বিচিত্র নাটকাবলী—বাঙ্গালী জাতিকে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত মুক্ত ছন্দ অভিনয়সৌকর্যে ও নাটকরচনায় পরম উপযোগী। এই ছন্দ

প্রাদেশিক নাটকে গৈরিশী ছন্দ

সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—"গিরিশ-বাবুর এইরূপ মুক্তছন্দ আমরা পছন্দ করি।" বাদ-প্রতিবাদ তর্কবিতর্ক সত্ত্বেও ইহা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুকৃত হইতেছে। অসমীয়া সাহিত্যে-"বেউলা" নাটক হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

বাই দেউ, অতি অসহন কথা!
মিছা মোৰ জন্মলাভ,
মিছাতেই হলোঁ মই দেবতা জীয়কী।
সামান্য মানুষ হই—
অত গৰ্ব, অত অহঙ্কাৰ
চন্দ্ৰধৰ বণিক পুত্ৰৰ।

কিংবা

কেনে সউ ৰঙা বেলি,
উজ্জ্বলাই পশ্চিম আকাশ
পোহৰাই দিনমান বিশাল বিশ্বক
ভাগৰত লাল কাল হই,
পুৰণিৰ আশ্ৰয় বিচাৰি
মেলি দিছে অগ্নিময় আঙঠাৰ ৰথ।
লাহে লাহে সন্ধিয়া দেবী যে
তৰাবছা ফুলাম আকাশ
মূৰত ওৰণি টানি,
দয়ামেয়ে যাচি দিয়া চন্দনৰ ফোট—
চন্দ্ৰমাক কপালত পিন্ধি
এখুজি দুখুজি কই
প্ৰবেশিছে বিশ্ব-নাট মন্দিৰত॥

ওড়িয়া সাহিত্যে বর্তমান শ্রেষ্ঠ ওড়িয়া নাটকরচয়িতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কোণার্ক নাটকে এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক রঙ্গমঞ্চে ও নাটকাবলীতে গিরিশচন্দ্রের

প্রভাব অনুভূত হয়। এমন কি বাংলা ও বিভিন্ন প্রাদেশিক যাত্রাদিতেও গৈরিশী ছন্দ ও গীতের অনুকরণ-চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

গিরিশের সঙ্গীত-প্রতিভা

সঙ্গীত-রচনায় গিরিশচন্দ্র একজন উৎকৃষ্ট শিল্পী ছিলেন। বলিতে কি সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার সর্বপ্রথম প্রতিভার উন্মেষ হয়। রসের ও সৌন্দর্যের সমভাবে বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার গীতাবলীতে। বৈষ্ণব পদাবলীর পর রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীত বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কুটীরে কুটীরে গীত হয়। রামপ্রসাদের গান শুধু ভক্তিরসের উৎস নহে—তাহাতে বাংলার আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ও সাধনার রূপ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই রাম-প্রসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন সর্বশেষে নিধুবাবু ও দাশরথি বাংলা সঙ্গীতে নূতন নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। নিধুবাবুর গীতে প্রেমের মাধুর্য ঝরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সে প্রেম মানব-অন্তরের অবিচ্ছন্ন প্রবাহ। সে প্রেম ভগবদ্‌ভাবের অনাবিল উৎস নহে। মানুষের হৃদয়ে যে স্রোত প্রবাহিত হয়—মানবের সুখ-দুঃখ বিরহ-বেদনা মিলন-আকাঙ্ক্ষা যাহার সঙ্গে মিশিয়া আছে—নিধুবাবু তাহা নিপুণভাবে বলিয়া গিয়াছেন। প্রেম কি—তাহার উৎপত্তি কোথায় এই সব দার্শনিক বিচার তাহাতে নাই। সরল সত্য কথায় তিনি বলিয়াছেন যে

মনেরে না বুঝাইয়ে নয়নেরে দোষ' কেন ?
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মনোমিলন ?

আঁখিতে যে যত হেরে সকলিই কি মনে ধরে,
মনের মত হ'লে পরে সেই হয় হৃদিরঞ্জন ॥

নিধুবাবুরই প্রতিধ্বনি উঠিল কবিগানে। রাধাকৃষ্ণ লইয়া কবির পালাগানে যে গীত রচিত হইল—তাহা মানবীয় ভাবে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের পদাবলীতে মানুষকে দেবতার উচ্চ আসনে বসাইয়া প্রেমের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। যদিও সেই গানের ভিতর মানবীয় অনুরাগের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার গন্তব্য স্থান অনন্তের অন্তহীন পথে। সে পথে যেমন বিরহ আছে তেমন মিলনও আছে। তাই রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন না করাইয়া, মিলনের আনন্দে না মাতিয়া সে গান স্থগিত হয় না। দাশরথিও সেই পথ ধরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নাটকীয় সংস্থান নাটকীয় চরিত্র এবং নাটকীয় হাবভাবে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। নাটকের গতিক্রিয়া নাটকীয় চরিত্রের ভাবচিত্র তাঁহার সঙ্গীতে বিকশিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ তাঁহার মৌলিক প্রতিভাসম্ভূত। ভূতপ্রেত, ঝড়বৃষ্টি, ষড়্ঋতু, ঊষা-প্রদোষ, উজ্জ্বল সূর্যালোক, নিবিড় অন্ধকার—প্রকৃতির যাবতীয় লীলাছবি তাঁহার সঙ্গীতে ভাসিয়া উঠিয়াছে। ডাকিনী, যোগিনী ও পিশাচ-পিশাচীর প্রকৃতি তাঁহার গানের ভাষায় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, তাঁহার সঙ্গীতগুলি যেন একটি সজীব চরিত্রের ছবি।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রেমের কবি। প্রেমসঙ্গীত তাঁহার হৃদয়ের প্রেরণার উৎস। প্রেমের অনন্ত বিকাশ, অনন্ত ভাব, অনন্ত রূপান্তর এবং তাহার ঊর্ধ্বগতি গিরিশচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রেমসঙ্গীতগুলি একত্র করিয়া বিচার

করিলে দেখা যায়—তিনি প্রেমের বীজ অঙ্কুর বৃক্ষ লতা পাতা প্রকাণ্ড বিশাল মহীরুহ পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। নাটকের শুধু রস উৎপাদন করিতেই তিনি গীত-রচনা করেন নাই—চরিত্রানুযায়ী ভাবের রূপ দিয়াছেন প্রত্যেক সঙ্গীতে। পুরাতন গীতি-রচয়িতাদের ভাষা ও আকার তিনি অনেক স্থলে বজায় রাখিয়া তাঁহার মৌলিক প্রতিভায় তিনি সঙ্গীতগুলিতে কবিত্ব-সৌন্দর্য ও মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন স্তরের ভাব সঞ্চার করিয়াছিলেন। সুরের মিশ্রণে একটা নূতন সম্মোহন আনিয়াছিলেন এবং সাধারণ্যে সেগুলি 'থিয়েটারী' সঙ্গীত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলি গভীর ভাবে রঞ্জিত ছিল। তাঁহার যেমন শ্যামা-সঙ্গীত তেমনিই শিব-সঙ্গীত, তেমনিই কৃষ্ণ-সঙ্গীত, আবার তেমনিই রাম-গীতি। কোথাও কোথাও হিন্দুস্থানী ভজনের অনুরূপ সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তিনি বেদান্তের কঠোর তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, আবার আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রত্যেক পদক্ষেপ তাঁহার গীতে পরিস্ফুট। প্রত্যেক সঙ্গীতটি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান এই অভিভাষণের ক্ষুদ্র পরিধিতে সম্ভবপর নহে। গিরিশচন্দ্রের গীতি বাংলার আপামর সাধারণের উপভোগ্য। সহস্র প্রতিবাদ ও উপেক্ষা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রের রচিত সঙ্গীতগুলি জনসাধারণের প্রিয়। তাঁহার গীতগুলিতে দুই-চার কথার স্বল্প পরিসরমধ্যে একটা ভাবের ছবি ব্যক্ত হইয়াছে। কবিতার আকারে তিনি গান বাঁধেন নাই। কবিতা—কবিতা এবং গান—গান। কবিতা গীত হইতে পারে, গীত হইলেই লোকে মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার ছন্দ ও দীর্ঘ অবয়ব যথার্থ কুলের পরিচয় দেয়। গিরিশচন্দ্রের

গানগুলি কবিতা ছিল না। তাঁহার রচিত গান চিরপ্রচলিত গানেরই অনুরূপ। গোপনতা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল—তাই ভাব গোপন করিয়া তিনি গানে কিছু বলেন নাই। তাঁহার গানের ভাষা ছিল সরল স্বচ্ছ ভাবপ্রবাহে উদ্বেলিত। বঙ্কিমের সীতারাম উপন্যাস নাটকে গ্রথিত করিয়া কি সুন্দর প্রাঞ্জলভাবে জয়ন্তীর মুখে বৈরাগ্যমণ্ডিত বেদান্তের উচ্চতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে সঙ্গীতটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

উদার অম্বর, শূন্য সাগর, শূন্যে মিলাও প্রাণ।
শূন্যে শূন্যে ফোটে কত শত ভুবন,
তারকা-চন্দ্রমা কত শত তপন,
শূন্যে ফোটে অভিমান॥
অহম্ অহম্ ইতি শূন্যে বিভাসিত
শূন্যে বিকশিত মনোবুদ্ধিচিত,
মদ-মাৎসর্য্য, ভোক্তা-ভোজ্য শূন্য সকলি এ ভান॥

কোনও কষ্টকল্পনা নাই, ভাষার জটিলতা নাই এবং ভাবের দুর্বোধ্যতা নাই—অথচ স্পষ্ট সুন্দর স্বাভাবিক সৌন্দর্য-মণ্ডিত। ইহা গান—সরলভাবে রচিত অথচ ভাবের গাম্ভীর্যে ভরপুর।

গিরিশচন্দ্রের করমেতিবাইতে কতকটা এই ভাবের অনুরূপ ফকীরদের ভজনগীতি আছে—

সূরয চন্দ্রমা কাঁহা ছিপায়া কাঁহা ছিপায়া তারা।
দুনিয়া দেখো কাঁহা মিলায়া, মন কাঁহা তোমারা॥

আসমান্ সে আসমান্ মিলায়া—ছায়া—ছায়া—ছায়া।
কাহা ফিন আসমান্ মিলায়া পাত্তা কুছ নেই পায়া॥
সম্‌ঝো তব্ যব্ সমজ্ আওরে ভাই
কুছ নেই কুছ নেই কেয়া—
দেল্ না বোলে, বাৎ না চলে সমজ কোই কুছ লিয়া,
ফাঁক হ্যায় সব কুছ, ভর্তি সব কুছ পূরা পূরা পূরা।

গিরিশচন্দ্রের শব্দ ও ভাবচাতুর্য নিম্নলিখিত সঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো,
নাহি হেরি কুসুম-মঞ্জরী লো।
চিত চঞ্চল ধাইছে সরোবরে,
গুন্ গুন্ স্বরে—মনোব্যথা কহে সকাতরে,
শূন্য সরো-নীর নেহারি লো!

গিরিশচন্দ্রের গীতগুলি তুলিয়া বিশ্লেষণ করিলে বিরাট্ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্যের প্লাবনে গিরিশ পুরাতনকে বজায় রাখিয়া সঙ্গীতে একটা নূতন রূপলেখা আঁকিয়া গিয়াছেন। সব গীতগুলি যে নির্দোষ তাহা নহে। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলির মধ্যে এমন অনেক গান আছে যাহা অতি সাধারণ—বিশেষ কোনও সৌন্দর্য নাই—আবার অনেক গীত আছে যাহা হইতে বেলা যূঁই চাঁপার গন্ধ ভর্‌ভর করিয়া উঠিয়াছে। অধুনা ইংরাজী সাহিত্যভাবাপন্ন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে দেখা যায় যে গিরিশচন্দ্রের গীতগুলি কাহারও কাহারও যেন মনোমত নয়। কারণ তাহার জন্য দায়ী তাঁহাদের রুচি।

যদিও তাঁহার গানগুলি নাটকীয় বিষয়বস্তু লইয়া অধিকাংশ স্থলে রচিত হইয়াছে তবুও তাহা হৃদয়ের মর্মস্থান হইতে উত্থিত হইয়াছে। এমন অনেক গান আছে যাহা সাধকদের নিকট প্রিয়—অথচ বর্তমান রুচির কষ্টি পাথরে সাহিত্যে তাহার বিশেষ স্থান নাই, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাহা খুব প্রিয়। গিরিশ সঙ্গীতরচনায় পশ্চিমের দিক হইতে প্রভাবান্বিত হন নাই—তিনি দেশের প্রাণকেই চাহিয়াছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার পরিচয় আপনিই প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলাভাষায় গিরিশের সঙ্গীতগুলি অপূর্ব দান। ভাবী যুগ তাহা নিশ্চয়ই একদিন বরণ করিয়া রস গ্রহণ করিবে।

নাটকে গদ্যপদ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের মতামত

গিরিশচন্দ্র নাটকে কোথাও গদ্য এবং কোথাও গদ্যপদ্য উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন নাটকের ভাষা শুধু গদ্য-ময় হওয়া উচিত—পদ্য অস্বাভাবিক। ইহাও পশ্চিমের প্রতিধ্বনি। এই বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ মনস্বী নাট্যসমালোচক মিস্‌টার নিকোল বলেন—"..........it may be observed that verse in many cases acts as a kind of anæsthetic on our senses. The sharp edge of the pain is removed in the plays of Æschylus and Shakespeare, and though it becomes more poignant in some ways, yet it is reft of its crudeness and sordidness by the beauty of the language. The effect of verse is obviously lacking in the realistic prose plays which appeared in such numbers during the nineteenth

century. We may not condemn those prose dramas many of them among the masterpieces of the world's art but perhaps the ultimate value and even necessity of verse in high tragedy is indicated by them. Not only do they seem to lack something which is present in the blank verse dramas and in the lyrical tragedies of past ages, but in themselves they appear continually to be straining semi-poetic utterance." গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বোঝা যায় আমরা ছন্দ ও সুরে কথা কই এবং ভাব লক্ষ্য রাখিয়া রচনা করিলে ভাষা উপযুক্ত স্থানে গদ্য বা পদ্যাকারে প্রকাশ পায়। কাব্যকলায় কেহই পরিত্যাজ্য নহে। পদ্য বর্জ্জিত হইলে আমরা "কালিদাসে"র অপূর্ব কাব্য-সম্পদ, "ভবভূতি"র কাব্যসুধা ও সেক্‌পীয়রের কাব্যমাধুরী—তাঁহাদের রচিত নাটকাবলীতে পাইতাম না। রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" এবং "রাজা ও রাণী" কাব্যসুষমামণ্ডিত নাটক-গুলিই বা কোথায় থাকিত? নাটকে পদ্য না থাকিলে আমরা গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির কাব্যসৌন্দর্য কি অনুভব করিতে পারিতাম?"

বিদূষক ও পতিতা চরিত্র

গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীতে বিদূষক ও পতিতা-চরিত্র—নাট্যসাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। তাঁহার বিদূষক শুধু রসিক মণ্ডালোভী ব্রাহ্মণ-বয়স্য নয়, তাহারা নাটকের গতিক্রিয়া ও ঘটনানিচয়ের সাহায্যকারী। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষক এই

শ্রেণীর অন্তর্গত, সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে তাহার আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বিদূষক নানা-ভাব-সমন্বিত,—বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া নাটকীয় ভাবরসের ক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান গতিতে চলিয়াছে। নাটকের ভাবানুযায়ী ইহাদের চরিত্র বৈচিত্র্যমণ্ডিত—নানা রসে সঞ্জীবিত। নলদময়ন্তীর বিদূষক প্রভুভক্ত—প্রভুর উদ্দেশে গৃহত্যাগী, কৌশলী, বুদ্ধিমান্ এবং নায়ক-নায়িকার মিলনকারী। জনার বিদূষক মণ্ডালোভী সরল কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ ও প্রভুভক্ত কিন্তু সর্বোপরি তাহার অদ্ভুত সরল বিশ্বাস। কৃষ্ণ নামে সরল বিশ্বাস ও ভক্তিগুণে তাহার চরিত্রে মাধুর্য ঝরিয়া পড়িতেছে। তপোবলে বিদূষক সদানন্দ প্রভুর প্রাণরক্ষার্থে স্বীয় জীবন বলি দিতে উদ্যত—যদিও সে মিষ্টান্নলোভী ও উদরপরায়ণ। গিরিশ তাঁহার অতুলনীয় তূলিকাস্পর্শে প্রতি অঙ্কে ক্রমোন্নতির স্তরে স্তরে—মনের বিকাশ দেখাইয়াছেন। তাঁহার সাহানা, তাঁহার লহনা, থাকমণি—চিন্তামণি, সোণামণি, উজ্জ্বলা, সোহাগি—তাঁহার কাদম্বিনী, অম্বিকা, গঙ্গা ও মোহিনী—সকলই বিচিত্র ও সজীব—সকলেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতির রসে অভিষিক্ত। হীন পতিতাদের মধ্যেও নারীত্ব, মাতৃত্বের বিকাশ, তপস্যা, ত্যাগ ও সংযম এবং পৈশাচিক হৃদয়ের অভ্যন্তরে কোমলতার উৎস দেখাইয়াছেন। তাহাদের চরিত্রে উচ্চ ভাবের মহোজ্জ্বল রেখা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন! তাঁর ক্রমবর্ধমান মনের পরিণতির সঙ্গে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলিও পরম্পরাক্রমে কল্পলোকের সৌন্দর্য-সুষমায় উদ্ভাসিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন গিরিশচন্দ্র তাঁহার রচিত নাটকে দীর্ঘ বক্তৃতার ছন্দ রাখিয়াছেন—তাহা স্বাভাবিক নয়। দীর্ঘ

কথোপকথন হইলেই যদি নাটক না হয় তবে মধ্যযুগের এমন কি কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়র, ও গ্রীক নাটক-রচয়িতৃগণের নাটকগুলিও বাদ পড়িয়া যায়। বিশেষতঃ বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি, ভাবপ্রবণ জাতি বলিয়াই আমরা কথাবার্তায় উচ্ছ্বাসময়, আবেগপূর্ণ এবং অল্প কথা ফালাও করিয়া বলি। সামান্য কথাও আমরা বেশী কথায় বুঝিতে চাই এবং দীর্ঘ আবেগময় বক্তৃতাও শুনিতে ভালবাসি। গিরিশচন্দ্র তোমার আমার এবং অপর সকলের মতই বুঝিতেন যে নাটকের ভাষা আধুনিক যুগের পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যের মত অল্প ভাষায় প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। গিরিশচন্দ্র বলেন যে দর্শকেরা দীর্ঘ বক্তৃতা চায়।

দীর্ঘ বক্তৃতা দর্শকের বোধগম্য জন্য

দীর্ঘ বক্তৃতা ছাড়া তাহারা নাটকীয় রচনা ও ক্রিয়ার গতি বুঝিতে পারে না। গিরিশচন্দ্র ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন—

দর্শকসম্বন্ধে গিরিশের প্রত্যক্ষ প্রমাণ

"আমার 'রাবণ-বধ' দর্শকের প্রিয় হইয়াছিল। এই রাবণ-বধে যখন রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে বলেন, তখন সীতাদেবী লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন,—'কেনরে লক্ষ্মণ তুমি না সম্ভাষ মোরে?' লক্ষ্মণ উত্তর দিল—'জ্যেষ্ঠ অনুগামী মাতঃ!' স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল লক্ষ্মণের অংশ লইয়াছিলেন। হৃদয়ভেদী স্বরে পঙ্ক্তিটি উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু দর্শক তাহা ধরিতে পারিল না। পর রাত্রে মহেন্দ্রলালের অনুরোধে কয়েক ছত্র স্বগতঃ উক্তি যোগ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম—"কেন মাগো! সুমিত্রা জননী দিয়েছিলে গর্ভে স্থান" ইত্যাদি যেমন লক্ষ্মণের মুখে নিঃসৃত হইল, অমনি করতালিতে রঙ্গালয় কাঁপিয়া উঠিল।" আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ

নাট্যকার বার্নার্ড শ (Bernard Shaw) বলিয়াছেন যে দর্শকদের বুদ্ধিশক্তির সামর্থ্য বুঝিয়া নাটক লিখিতে হয় (by the capacity of spectators for understanding what they see and hear) এবং এই জন্যই গিরিশচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া বলিতেন —"সুশিক্ষিত দর্শকদের সংখ্যা বেশী হইলে নাটক ও নাট্যশালার আরও উন্নতি করা যাইত।"

বার্নার্ড শ নাটক-রচনায় দর্শকদিগের প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখেন

লোকের যত্ন, আগ্রহ বা উপেক্ষায় তিনি উৎফুল্ল হইতেন না বা দমিয়া যাইতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল সত্য চিরদিন অমর। যদি রচনার মধ্যে কিছু সত্য থাকে তবে সেই সত্য সহস্র বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া তাহার অমরত্ব বজায় রাখিবে এবং রচনায় যদি সত্য কিছু না থাকে তবে হাজার চেষ্টা করিলেও ও বাহ্য আড়ম্বর থাকিলেও তাহার জীবন স্বল্পস্থায়ী। কালই তাহার প্রধান বিচারক।

লোকপ্রশংসা বা নিন্দায় গিরিশ উদাসীন

গিরিশের বিরাট মন ছিল প্রবল শক্তিশালী ও বিচিত্র মৌলিক ভাবাপন্ন। মান অপমান যশ অপযশ কোন কিছু দৃক্‌-পাত না করিয়া তিনি সত্যকেই আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি যেমনই অপূর্ব তেমনিই বিচিত্র। তাহারা যেন "জ্যান্ত আস্ত মানুষ।" তাহাদের ভাষা দেখিয়া বোঝা যায় যে কোন্ লোকটা কোন্ শ্রেণীর। তাহার কুল গোত্র সব পরিচয় যেন তাহার চরিত্র হইতে আপনি ধরা পড়ে। এত বিভিন্ন ভাবের

গিরিশের বিরাট মনে বহুমুখী গতি ও বিচিত্র গভীর ভাব

বৈচিত্র্যময় চরিত্র জগতের কয়জন আঁকিয়াছেন? নিরপেক্ষ চিত্তে তুলনা করিলে বোঝা যায় যে গিরিশের মন কত বিরাট ও বিশাল ছিল, কত গভীর ও বহুমুখী বিচিত্রভাবাপন্ন ছিল, কত সুন্দর ও লাবণ্যপূর্ণ ছিল—তাহার পরিচয় তাঁহার রচিত নাটকাবলীতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

সৃষ্টিনিপুণ গিরিশের কর্মপ্রধান মন ও কার্য

এই বিরাট সৃষ্টিনিপুণ মন আবার কত বড় কর্মপ্রধান ছিল—তাহার সাক্ষী বাংলার রঙ্গালয়সমূহ এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ। বড় বড় সংস্কারকেরা সমাজের যে অংশে যাইতে সাহসী হন নাই—অথচ যাহারা সমগ্র জাতির দেহে ও সমাজে অঙ্গাঙ্গিভাবে রহিয়াছে—যাহারা অবিচ্ছিন্ন ও ক্রিয়াশীল, সেখানে একাকী গিরিশ উচ্চ ভাব, উচ্চ লক্ষ্য, উচ্চ আদর্শ লইয়া তাহাদের শিক্ষাকার্যে ও নাট্যশালার প্রতিষ্ঠানে তাহাদের সংস্কারকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী গিরিশের মৃত্যুর পর প্রকাশ্য সভায় ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বাংলার ইতিহাসে গিরিশের এই অপূর্ব সংস্কার-কার্য উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিবে।

গিরিশ সমাজের নির্ভীক সংস্কারক

বর্তমান সভ্য জগতে রঙ্গালয় সর্বপ্রধান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ইহা শিল্পকলার উচ্চতম ভাবের প্রচার-কেন্দ্র। বাংলাদেশে তিনি সেই জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শুধু প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই—তাহাকে সবল ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিবার ভার ও তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব—তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উপর

গিরিশ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাঁহার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভার দিয়াছেন

ন্যস্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কালের গতি নিরবধি, উন্নতিও অনন্তাভিমুখী—অমর গিরিশচন্দ্রের ভাবপ্রবাহ তাহাতে মিশিয়া থাকিবে এবং রসলোক হইতে যে অমৃত-রসধারা তিনি আনয়ন করিয়াছেন—রসপিপাসু নরনারী তাহা চিরদিন পান করিয়া তৃপ্ত ও ধন্য হইবে।

রসলোক হইতে গিরিশের অমৃত-রসধারা কালপ্রবাহে অমর

পরিশিষ্ট

(বঙ্গশ্রী, আশ্বিন, ১৩৪৮ সালে লিখিত)

বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র

বর্তমান প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রের তুলনামূলক নহে। একজন বাংলার সাহিত্যগুরু, সাহিত্যসম্রাট্, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির আসনে আসীন, অপর বাংলার নাট্যগুরু, নাট্যসম্রাট্, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও তত্ত্বদর্শী ভক্ত—ইঁহাদের তুলনামূলক সমালোচনা চলিতে পারে না বলিয়া আমার বিশ্বাস, সে ধৃষ্টতা আমার নাই। তবে দুইজনের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে একটা আদর্শের ঐক্য আছে, তাহারই আলোচনা করতে আমি প্রয়াস করিব।

দুইজনেরই উরোপীয় সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল—ইউরোপীয় সাহিত্যের আলোকে এবং ছাঁচে ইঁহারা উভয়ে বিষয়বস্তুকে সাজাইতেন। কিন্তু উভয়েই ভারতীয় ধর্মের আদর্শকে পুরোভাগে রাখিতেন। গিরিশচন্দ্রের প্রধানতঃ অবলম্বন ছিল —মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল মহাভারতোক্ত গীতা ও যোগধর্ম। বঙ্কিমের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই অলৌকিক যোগ-বিভূতিসম্পন্ন সন্ন্যাসী ও দার্শনিক ডাকাত বা বিদ্রোহী চরিত্র দেখা যায়। দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে তিনি গীতার তত্ত্ব, নিষ্কাম কর্মযোগ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, জ্ঞান বিচারের দ্বারা তিনি হিন্দুধর্মকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, পুরাণাদি ও মহাভারত হইতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে নবালোকসম্পাত

করিয়াছেন এবং আধুনিক প্রতীচ্যের যুক্তিতর্ক ও অনুসন্ধিৎসার প্রণালীতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে পরিস্ফুট ভাবে অঙ্কিত করিয়া মহামহিম গৌরবোজ্জ্বল আদর্শরূপে সাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র পুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণ এবং ভক্তমাল হইতে যে উপাদানসমূহ লইয়াছেন—তাহাতে পাশ্চাত্ত্য নাটকীয় ছাঁচে প্রাচীন আদর্শকে উজ্জ্বলভাবে দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন। নাট্যকার তাহাতে কোন নূতন তত্ত্ব বা কোন অনুসন্ধিৎসার রেখাপাত করেন নাই বা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি প্রাচীন ভাবটি পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই জনসাধারণ গিরিশচন্দ্রের চরিত্রগুলির সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিত। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদরের এবং আলোচ্যবস্তু। জনসাধারণ এবং প্রাচীনপন্থারা উহা সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত না। যাঁহারা ভক্ত এবং ভাবের উপাসক, তাঁহারা আজ পর্যন্ত বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে তাঁহাদের উপাস্যের সহিত মিলাইতে পারেন নাই। তবু উভয়ের লক্ষ্য ছিল, অতীত হিন্দু আদর্শকে বর্তমান যুগের চিন্তাধারার প্রণালীতে প্রচার করিতে। এই আদর্শ এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য ছিল—তবে একজন ছিলেন জ্ঞানী ও সূক্ষ্ম বিচার সম্পন্ন এবং অন্যজন ছিলেন ভক্ত ও ভাবুক। সাহিত্যসৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রেরণা উভয়ে পাইয়াছিলেন—ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায়। স্যার ওয়াল্টার স্কট, লর্ড লিটন, ডিকেন্স প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের প্রণালী বঙ্কিমকে উপন্যাস রচনায় প্রেরণা দান করিয়াছিল এবং সেক্সপীয়ার প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের রচিত নাটকাবলীর রচনাভঙ্গী গিরিশচন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়া প্রেরণা দিয়াছিল তাঁহার নাটক রচনায়।

উভয়ের রচনাতেই এতদ্দেশীয় চরিত্রসৃষ্টি ও কথোপকথনে বিলাতী পাশ্চাত্ত্যের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই ছায়া তাঁহাদের অগৌরব নহে। ইহা কাহারও ধার করা ভাব বা অনুকরণ নহে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যরসে পুষ্ট মনের ইহা স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ। বঙ্কিম, শান্তিকে ঘোড়া চড়াইতে বা একাকিনী শত্রুশিবিরে পাঠাইতে দ্বিধা করেন নাই এবং দেবীচৌধুরাণী বা প্রফুল্লকে ভবানী পাঠক ব্যায়াম করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহা দোষের নহে, অতীতে যদিও বাংলাদেশে ইহা স্ত্রীজাতির পক্ষে নিন্দনীয় ছিল, তবু কবিরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা. আজ ইহা অসম্ভব নয়। বঙ্কিম স্বদেশপ্রেমের যে ভাবী উজ্জ্বল ছবি দেখিয়াছিলেন—তাহাই আঁকিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে এইরূপ অসমসাহসিক স্ত্রী চরিত্র আঁকিতে দ্বিধা করেন নাই। ইহাদের উভয়ের মধ্যেই ছিল একটা স্বদেশ-প্রেমের গাঢ় অনুভূতি। সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম ও ছত্রপতি শিবাজী গিরিশের স্বদেশপ্রেমের আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস। দুঃখের বিষয়, এই পুস্তকগুলি সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে গিরিশ-ভক্তেরা এবং জনসাধারণ নীরব। শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" সাহিত্যে বাজেয়াপ্তির কবল হইতে তাহার দাবী লইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে সকলেই নীরব। অথচ স্বদেশীযুগে এই পুস্তকগুলি দেশবাসীদিগকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বোধিত করিয়াছে। বঙ্কিমের "আনন্দমঠে"র তুলনা নাই—ইহা স্বদেশপ্রেমের গোমুখী নির্ঝর—হিমালয়ের ভাগীরথীপ্রবাহ। জাতীয় জীবনের হৃদয়-সমুদ্রে মিশিয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে নিরবচ্ছিন্ন ভাব-তরঙ্গে গম্ভীর ধ্বনিতে ভারতের বেলাভূমিতে আছড়াইয়া পড়িতেছে। রাজসিংহ

উপন্যাসে বঙ্কিম যেমন রাজপুতানার ইতিহাসে টড্ প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিকদের নিরপেক্ষ তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্র তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক "চণ্ডে" টড্ প্রভৃতি হইতে তেমনই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম প্রভৃতিতে সেই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিম ও গিরিশ রঙ্গমঞ্চেই সমসূত্রে জনসাধারণের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি গিরিশ নাটকাকারে সাজাইয়া সর্বপ্রথমে জনসাধারণকে নিজ অভিনয়-নৈপুণ্য এবং শিক্ষার কৌশলে এই নূতন রসামৃত পান করাইয়াছেন। উপন্যাস—উপন্যাস—নাটকীয় গুণ থাকিলেও ইহা নাটক নহে। গিরিশ তাঁহার অপূর্ব নাট্যকলা-কৌশলে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির জীবন্ত আলেখ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন। বঙ্কিমের উপন্যাস বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। বাংলার শিক্ষিত নরনারী ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেন বঙ্কিম সম্পাদিত "বঙ্গদর্শনের" পরবর্তী সংখ্যা কবে বাহির হইবে। কিন্তু ইহার রসাস্বাদন করিতেন মুষ্টিমেয় নরনারী। আধুনিক যুগের তুলনায় ইহা নগণ্য। যদি পাশ্চাত্ত্য প্রদেশ হইত, তবে সংস্করণের পর সংস্করণ বঙ্কিমের লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ বিক্রয় হইত। সস্তা মূল্যে গ্রন্থাবলীর আকারে বিক্রয় করিবার জন্য এত বিজ্ঞাপন দিবার আবশ্যক হইত না। শিক্ষিত বাঙালী আজও অর্থব্যয় করিয়া সদ্‌গ্রন্থ কিনিয়া পড়িতে কুণ্ঠিত। কিন্তু গিরিশ, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীকে নাটকাকারে অভিনয় করিয়া বাঙ্গলার সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন। নাট্যালয়ের পাদপীঠে বঙ্কিম ও গিরিশের প্রতিভা সম্মিলিত ভাবে যে সাহিত্যরস পরিবেশন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রণেতা (স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়) শ্রীম পরিশিষ্টে লিখিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে তিনি ও গিরিশ বঙ্কিমের নিকট গিয়াছিলেন। ইহা পড়িয়া আমি শ্রীম'র নিকট গিয়া তাঁহার নিকট আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করি। তিনি বলিলেন যে, "গিরিশবাবুর সহিত বঙ্কিমের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়া ঠাকুর আমাকে তাঁহার সঙ্গে বঙ্কিমের নিকটে যাইতে বলিলেন। বঙ্কিম অধরবাবুর বাড়িতে ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবেন। তিনি কবে তথায় যাইবেন, ইহা জানিবার জন্য আমাদিগকে বঙ্কিমবাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমরা তাঁর কলিকাতার বাড়িতে গেলাম। সংবাদ পাইয়া তিনি আসিয়া গিরিশবাবুকে সমাদর করিয়া বসাইলেন এবং তাঁহারা দুইজনে পরস্পরের বই সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। আমি একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম।" আমি শ্রীম'কে এইখানে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাকে বঙ্কিমবাবু বসিবার জন্য সমাদর করিলেন না?" তিনি বলিলেন, "গিরিশবাবু ও বঙ্কিমবাবু দুইজনের মধ্যে প্রায় ৮৷১০ বৎসরের ব্যবধান। দুইজনে Literary men (সাহিত্যিক); দুইজনে তাহা লইয়া কথাবার্তায় মাতিয়াছিলেন। আমি এঁদের চেয়ে অনেক ছোট। আমার বয়স তখন ২৯৷৩০ হবে, এঁদের কাছে নেহাৎ ছোকরা। আমিও একমনে দুইজনের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। তাঁদের দু'জনের আলাপ শেষ হ'লে আমি ঠাকুরের কথা উত্থাপন করলাম। গিরিশ বাবু তখন বলিলেন, "আপনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি আমাদের আপনার কাছে জানতে পাঠালেন যে, আপনার সেখানে যাবার কবে সুবিধা হবে।" বঙ্কিম বাবু

উত্তর করিলেন, "আমার যাবার খুব ইচ্ছা আছে, সেদিন অধর-বাবুর বাড়িতে দেখে অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল। তাঁকে শুধু দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখবার ইচ্ছে আছে তা নয়—এখানে একবার আনবার মনে মনে আমার আগ্রহ আছে। তবে বড় কাজ-কর্মের ভিড়, কবে সময় করে যেতে পারব, তা ঠিক আপনাদের আজ জানাতে পারছি না। সুবিধা হলেই আমি (গিরিশ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) আপনাকে জানাব।" কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের ইহার কোনটাই কার্যে পরিণত হয় নাই। তাঁহারা বঙ্কিমবাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীম' কথিত উপরোক্ত ঘটনায় বোঝা যায়, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে খুব সদ্ভাব ও প্রীতিই ছিল।

যাহা হউক, বাংলাদেশে বঙ্কিম ও গিরিশপ্রতিভার মিলন-ক্ষেত্র হইয়াছিল বাংলার রঙ্গমঞ্চে। বঙ্কিমের সম্মুখেই গিরিশ তাঁহার নাটকগুলি অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছেন। সাহিত্যগুরু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের নিকট নটগুরু নাট্যকার গিরিশচন্দ্র স্বীয় নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন উপন্যাসগুলির নাটকীয় রূপান্তরে। উভয় জীবনের ইহাই সাহিত্যিক যোগসূত্র। উভয়ের জীবন হইতে এই অধ্যায়টি বাদ দিলে তাঁহাদের জীবনেতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। বাংলায় গিরিশ ছিলেন—বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রচারক ও রস-পরিবেশক, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

BIBLIOGRAPHY

1. Theory of Drama by A. Nicoll, M. A., Professor, London University.
2. The Development of the Theatre by A. Nicoll, M.A., Professor, London University.
3. British Drama by A. Nicoll, M.A., Professor, London University.
4. European Theories of the Drama by Barret H. Clark.
5. Hamburgesche Dramaturgie by Lessing.
6. Early Annals of the English in Bengal.
7. Criticism on Moliere by Ogier.
8. Essays by Hedelin.
9. Essays by Thomas Rymer.
10. Essays of Dramatic Poesy by Dryden.
11. History of the Protuguese in Bengal by J. J. A. Campos.
12. Hedges' Diary, Vol. I.
13. The Comedies of Plautue.
14. The Comedies of Terence.
15. Criticisms by Horace.
16. Essays of G. Brandes by Archer.
17. The Russian Theatre by Slayer.
18. Do by R. Fullop-Millet Gregor.
19. Moliere's Works by Heath.
20. Problem Plays by Brieux.
21. History of Restoration Drama by Nicoll.
22. Restoration Tragedy by Bonamy Dobre.
23. Restoration Comedy by Banamy Dobre.
24. The Social Code of Restoration Comedy by K. C. Lynch.

25. **Comedy and Conscience after the Restoration by I. W. Krutch.**
26. Congreve's Dramatic Works (World's Classics).
27. Restoratian Comedies and Shakeapeare's Adaptations by Montague Sumer.
28. Shakespeare from Betterton to Irving by G. C. D. Odell.
29. Venice Preserved dy Otway.
30. Problems of Poetic Drama by T. S. Elliot.
31. A course of Lectures on Dramatio Art and Literature by Schlegel.
32. The Athenian Drama by G. C. W. Warr.
33. Dithyramb, Tragedy and Comedy by J, Pickard.
34. History of Theatrical Art by K. Mantinz.
35. The Greek Theatre by R. Fiickinger.
36. The Attick Theatre by A. E. Haigh.
37. Stage Antiquities of the Greeks and Romans by T. S. Allan.
38. History of Literary Criticism by Saintsbury.
39. Critical Essays of the Seventeenth Century by Spingarn.
40. History of Literary Criticism in the Renaissance by Spingarn.
41. Elizabetean Critical Essays by Gregory Smith.
42. Eighteenth Century Essays on Shakespeare by Nicol Smith.
43. Shakespeare Criticism by Nicol Smith.
44. Poetics by S. H. Butcher.
45. Aristotle on the Art of Poetry by Bywater.
46. The Aristotelian Catharsis by A. H. Gilbert.
47. The Meaning of Katharsis by J. H. Myers.
48. Plato and Platonism by Pater.
49. Plato's View of Poetry by W. C. Green.
50. The Epistle to the Pisos by Horace.

51. Dramatic Essays by Hudson.
52. Lecturess on the English Comic Writers by Hazlitt.
53. Coleridge's Lectures on Shakespeare.
54. The English Humourists by Thackeray.
55. The Idea of Comedy by Meredith.
56. Henri Bergson's Le Rire by Brereton and Rothwell.
57. Sigmund Trend's Der Witz Seine Bezieting Sum Unbewrelsten (English Transiation by A. A. Brill).
58. The Idea of Tragedy by W. L. Courtney.
59. Tragedy by Thorndike.
60. Types of Tragic Drama by C. E. Vaughan.
61. Tragedy by W. M. Dixon.
62. Tragedy by F. L. Lucas.
63. Dramatic Works by Æschylus (translated by Swanvick).
64. Sophocles' Dramas (translated by Sir R. C. Jacob)
65. Technique in Dramatic Art by Bosworth.
66. Playmaking by W. Archer.
67. Study of the Modern Drama by Barret H. Clark.
68. The Principles of Playmaking by Brander Matthews.
69. The Dramatic Works by Euripides (translated by Prof. Gilbert Murray).
70. Seneca's Dramatic Works (translated by Harris and Bradshaw).
71. Seneca and Elizabethan Tragedy by F. L. Lucus.
72. A Short History of British Drama by B. Browley.
73. English Drama by Schelling.
74. The Mediaeval Stage by Sir E. K. Chambers.
75. Elizabethan Drama by Schelling.
76. History of London Stage by H. B. Baker.

77. Their Majesties Servants by J. Doran.
78. The English Stage by Nicoll.
79. Shakespeare and His Predecessors by F. S. Boas.
80. English Miracle Plays, Moralities and Interludes by A. W. Pollard.
81. Shakespeare's Predecessors by J. A. Symonds.
82. The Elizabethan Stage by Sir E. K. Chambers.
83. Shakespeare : His Mind and Art by Dowden.
84. Character Problems of Shakespeare by F. Schucking.
85. Shakespeare as a Dramatic Artist by Moulton.
86. Shakespeare as a Dramatic Artist by Lounsbury.
87. The Development of Shakespeare as a Dramatist by G. P. Baker.
88. The British Theatre by Mrs. Inchbald.
89. History of Early 19th Century Drama by E. B. Watson.
90. The English Sage by A. Filon.
91. Drama of Yesterday and To-day by C. Scott.
92. Planche's Extravaganzas.
93. Dramatic Opinions and Essays by G. B. Shaw.
94. Tendencies of Modern English Drama by A. E. Morgan.
95. The Old Drama and the New by W. Archer.
96. English Dramatists of To-day by W. Archer.
97. The Contemporary Drama of England by T. H. Dickenson.
98. Modern Dramatist and the Youngest Drama by Ashley Duke.
99. L'Evoluzione del teatro contemporaneo in Italia by L. Tucci.
100. The Contemporary Drama of Italy by L. Tucci.
101. The German Drama of the Nineteenth Century by G. Witkowski (translated by L. E. Horning).

102. **Naturalism in Recent German Drama by A. Stoeckin.**

103. **Revolt in German Drama by P. Loving.**

104. **The Quintessence of Ibsenism by G. B. Shaw.**

105. **Essays on Scandinavian Literature by H. H. Boysen.**

106. **Essays of G. Brandes by Archer.**

107. **Calderon's Plays by Fitzgerald.**

108. The Seventeenth Century Background by Thomas Willy.

109. Advancement of Learning by Bacon.

110. History of Rationalism by Lecky.

111. Babbit's Rousseau and Romanticism.

112. Bernard Shaw's writings about Drama in *New York Times.*, 1912.

113. Encyclopaedia Britannica.

114. Taine's History of English Literature.

115. Brajendranath Banerjee's সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম ও ২ খণ্ড)

116. Do বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস

117. Dramatic Essays of Prof Sailendra Nath Mitra. in the *Bangabani* and the *Calcutta Review.*

118. Dr. S. P. Mookerjee's article on Giris Chandra in the *Calcutta Review.*

119. Mr. P. R. Sen's Western Influence on Bengali Literature.

120. শকুন্তলার নাট্যকলা—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসু